স্বর্গীয়া আনন্দী বাঈ জোশী এম্ ডি।

KUNTALINE PRESS.

প্রথম ভাগ। মাঘ, ১৩০৭। প্রথম সংখ্যা।

সখী।

ওগো আসিয়াছি আমি শিশির প্রভাতে—
স্নেহের অঞ্চল দিয়া ঢাকিও আমায়!
আদরে বসা'য়ো কাছে— ধরি দুটি হাতে,
তপ্ত পরশ খানি মাখি নিব গায়!
চেয়ো সখি, মোর পানে স্নেহ-দৃষ্টিপাতে,
মরমের দুটো কথা বলিব তোমায়;
ক্ষতি নাই —এসেছি যা' তোমারে শুনাতে,
মঞ্জীর-গুঞ্জন-মাঝে যদি ডুবে যায়!

এসেছি দুয়ারে তব,—দিবে কি ফিরায়ে!
নব অতিথিরে কি গো ডেকে নাহি লবে?
দিবে না বসিতে স্থান অঞ্চল বিছায়ে,
হৃদয়ের দুটো কথা বলা নাহি হ'বে?
দিতে যাহা আসিয়াছি, ঠেলিবে কি পায়ে,
ব্যর্থ অভিলাষ লয়ে ফিরে যাব তবে?

সংকল্প।

শিক্ষা বিভাগের কল্যাণে ও সম্মিলনী সভাগুলির উদ্যমে বাঙ্গালির ঘরে ঘরে বর্ণজ্ঞান বিস্তার হইতে চলিয়াছে। ভদ্র পরিবারে লিখিতে পড়িতে না জানেন, এমন নবীনা সুদুর্লভ। কিন্তু বর্ণজ্ঞান ত জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় মাত্র, জ্ঞান নহে। প্রকৃত বর্ণজ্ঞানবিহীনা হইয়াও প্রাচীনারা উপকথা, কথকতা ও ব্রতকথা শুনিয়া জ্ঞান লাভ করিতেন। সীতা সাবিত্রীর সতীত্ব, দাতাকর্ণের মহত্ব শ্রবণে তাঁহাদের চরিত্র গঠিত ও হৃদয় উন্নত হইত। কাল প্রভাবে উপরিউক্ত উপায়গুলি লুপ্তপ্রায়। লোকের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কার্য্যকারিতা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। সময়োপযোগী উপায় অবলম্বিত না হইলে নবীনাদিগের জ্ঞান বর্ণজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়া সমূহ অকল্যাণের কারণ হইবে। শুধু বর্ণজ্ঞানে এমন কি আছে, যে স্ত্রীচরিত্র সংগঠনে সহায় হইতে পারে?—নারীগণের চিত্তবৃত্তির যথাযথ অনুশীলন হইতে পারে? উপায়ে উদ্দেশ্য-ভ্রান্তি সাংঘাতিক। সুখের বিষয় ভ্রম সহজেই ধরা পড়িয়াছে, বিষয়ের গুরুত্বও অনুভূত হইয়াছে। আর নানাদিক হইতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সাধ্যমত ও ধারণানুযায়ী চেষ্টাও হইতেছে।

নারীচিত্তের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুশীলন লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া 'সখী' অতি সন্তর্পণে বঙ্গগৃহে পদক্ষেপ করিল। সখী সুচিত্রা কাব্যালঙ্কৃতা হইয়া যেমন গৃহিনীগণের চিত্তবিনোদন করিতে প্রয়াস পাইবে,—তেমনই সংযত, সরল ও মধুরভাষিণী হইয়া বিবিধ তত্ব তাঁহাদের বোধগম্য করিতে সর্ব্বথা যত্ন করিবে। এ সখী শুধু রাজনন্দিনীর নহে, কুটিরবাসিণীরও। ইহাতে ললিত কলাও আলোচিত হইবে, আবার গৃহধর্ম্ম ও গৃহিণীপনাও বিবৃত হইবে। এক কথায় বাঙ্গালীর গৃহ-লক্ষ্মী, যাহাতে তাঁহার গৃহধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, গার্হস্থ্যে গৃহিণী, রোগে দুঃখে সান্ত্বনার স্থল, বিপদে মন্ত্রী, সম্পদে ও কাব্যামোদে সঙ্গিনী হইতে পারেন, তদর্থে সখী উৎসর্গিতা থাকিবে। সংক্ষেপে এই ত সংকল্প। আশা করি বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকা এ সাধু সংকল্পের সহায় হইবেন।

শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী।

বাল্যকাল।

ডাক্তার শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী এম ডি, মহোদয়া মহারাষ্ট্রীয় রমণী সমাজের একটি অমূল্য রত্ন ছিলেন। বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় মনস্বিনী মহিলা জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। তিনি মানসিক বলের যেমন একমাত্র আধার ছিলেন, তেমনই স্বদেশানুরাগে এদেশের কাহারও অপেক্ষা ন্যুন ছিলেন না। ভারত মহিলার চিকিৎসা শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য তিনি অসাধারণ দৃঢ়তার সহিত সর্ব্ব প্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি যে স্বদেশানুরাগ ও মহানুভাবতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও স্বীয় ব্যবহার গুণে প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। অত্যুন্নতি-প্রয়াসী নব্য সংস্কারকগণও তাঁহার কার্য্যে তৎপরতার অভাব দেখিতে পান নাই। তিনি খৃষ্টরাজ্য আমেরিকায় তিন বৎসর বাস করিয়াও স্বধর্ম্মের প্রতি ও স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বদেশবাসীর নিন্দা তাঁহার কর্ণে বিষবৎ অসহ্য বোধ হইত। আমেরিকায় এবং লণ্ডনে অবস্থান কালেও তিনি আচার ব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে স্বীয় মহারাষ্ট্রীয় বিশেষত্ব একদিনের জন্যও বিন্দুমাত্র বিসর্জ্জন করেন নাই! আমাদিগের দেশের অনেক মনস্বী ব্যক্তিও বিদেশে গিয়া চিত্তের এরূপ দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভারতের দুর্ভাগ্য, এই রমণীরত্ন একুশ বৎসর বয়সেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন!

শ্রীমতী আনন্দী বাঈ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ (১৮৮৭ শকাব্দের চৈত্র শুক্লা নবমী) দিবসে পুণা নগরীতে স্বীয় মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গণপৎরাও অমৃতেশ্বর জোশীর সাংসারিক অবস্থা হীন ছিল না। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী কল্যাণ নামক

প্রদেশে গণপৎরাওয়ের কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, শান্তপ্রকৃতি ও অতীব অমায়িক ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী, দামুরাও নামক একটি পুত্রের জন্মদানের পর ইহলোক পরিত্যাগ করিলে গণপৎরাও দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা জন্মে। কন্যা তিনটির মধ্যে আনন্দী বাঈ দ্বিতীয়া। পিতা মাতা বাল্যকালে তাঁহার "যমুনা বাঈ" এই নামকরণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে তাঁহার নামান্তর ঘটে। তদবধি তিনি আনন্দী বাঈ নামে পরিচিতা হন।

তৃতীয় মাসে পদার্পণ করিবার পর আনন্দী বাঈ জননীর সহিত পিত্রালয়ে আগমন করেন। বালিকার ঈষৎ গৌরকান্তি, রক্তবর্ণ গণ্ডস্থল ও কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম, সদা প্রফুল্ল ভাব ও পরিচ্ছন্নতাদি দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইত। খেলায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। পঞ্চম বর্ষ বয়সে তাঁহার বসন্ত রোগ হয়। সে যাত্রা যমুনা বহু কষ্টে রক্ষা পান। তদবধি তাঁহার কান্তি ঈষৎ শ্যামভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার শ্রবণশক্তি হ্রাস হইল।

বালিকা যমুনা খেলা করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিত। ছয় সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে সে একবার স্বীয় গৃহের সম্মুখে একটি পাদরিকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিল। তদবধি সে স্বীয় সঙ্গিনীদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের সমক্ষে প্রায়ই পাদরির অনুকরণে বক্তৃতা করিত। বলা বাহুল্য, তাহার বক্তৃতায় বক্তব্য বিষয় কিছুই থাকিত না। তথাপি তাহার বক্তৃতার হাব ভাব, আবেগ ও পাদরির অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত। জননী তাহাকে "পাদরিণী" বলিয়া বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিলে সে কিয়ৎকালের জন্য তাহা পরিত্যাগ করিত।

বাল্যকালে বালিকারা সাধারণতঃ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকরণে পুতুল খেলায় বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করে। কিন্তু যমুনা পুতুল খেলিতে ভাল বাসিত না। যে সকল খেলায় লম্ফ ঝম্প ও দৌড়াদৌড়ি বেশী, সে সকলের প্রতি তাহার বিশেষ প্রীতি প্রকাশ পাইত। তদ্ভিন্ন ঠাকুর পূজা করা, খেলাঘর তৈয়ারি করা ও বাগান করা প্রভৃতিও তাহার খেলার অন্তর্গত ছিল। বাগানে শাক শব্জী ও ফুলের গাছ রোপণ করা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রায় প্রত্যহ তাহার রোপিত গাছগুলি গরু বাছুরে চরিয়া খাইত। কিন্তু যমুনা পুনঃ পুনঃ তাহা রোপণ করিয়া স্বীয় অধ্যবসায়ের একশেষ প্রদর্শন করিত।

যমুনা স্বীয় মাতামহীর নিতান্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। তাহার জননী দৌরাত্ম্যের জন্য তাহাকে ধমকাইলে প্রায়ই তিনি নাতিনীর পক্ষাবলম্বন করিয়া কন্যার সহিত ঝগড়া করিতেন। যমুনার জননী অতীব কোপনস্বভাবা ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইলে গণপৎরাওকেও একটু ভীত হইতে হইত। বেচারী যমুনা তাঁহার হস্তে প্রায়ই বিষম দণ্ডভোগ করিত। নিকটে প্রস্তর খণ্ড, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহা পাইতেন, তাহারই প্রহারে তিনি যমুনাকে জর্জ্জরিত করিতেন। একদা পাঠশালায় যাইবার নাম করিয়া যমুনা কোনও প্রতিবেশিনীর গৃহে গিয়া খেলা করিতেছিল। যমুনার জননী সেই অপরাধে তাহাকে পদাঘাত করিতে করিতে গৃহে আনয়ন করেন। তাঁহার প্রহারে বালিকা সময়ে সময়ে হতচৈতন্য হইত। যমুনাও নিতান্ত অল্প দৌরাত্ম্য করিত না। এই কারণে প্রতিবেশীরাও তাহাকে ধমকাইতে বিরত হইত না। কিন্তু যমুনা এই সকল কঠোর শাসন অতি ধীরভাবে সহ্য করিত।

সপ্তম বর্ষ বয়সে যমুনাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তাহার স্মরণশক্তি অতীব তীব্র ছিল। কোনও কথা একবার শুনিলে সে তাহা কখনও ভুলিত না। কিন্তু লেখাপড়ায় তাহার আদৌ মনোযোগ ছিল না। তাহার পিতা তাহাকে শিক্ষকের শাসনে রাখিবার জন্যই পাঠশালায় দিয়াছিলেন। জোর জবরদস্তি না করিলে যমুনা সহজে পাঠশালায় যাইত না। বিদ্যালয়ে যাইবার সময় উপস্থিত হইলেই তাহার কোনও দিন পেট কামড়াইত, কোনও দিন বা অন্য কোন

প্রকার অসুখ করিত। বলা বাহুল্য, মাতামহী সেজন্য পাঠশালায় যাইতে নিষেধ করিলেই তাহার অসুখ সারিয়া যাইত এবং সে সমস্ত দিন ঘরে থাকিয়া দৌরাত্ম্য করিত। এই কারণে ঘরের মধ্যে তাহার পিতা ও মাতামহী ভিন্ন কেহ তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন না। গণপৎরাও বলিতেন, "আমার যমুনা অসাধারণ বুদ্ধিমতী হইবে। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার সদগুণনিচয় পরিস্ফুট হইবে।" তিনি প্রায়ই স্বীয় বন্ধুগণের সমক্ষে তাহাকে আনিয়া পরীক্ষা দিতে বলিতেন ও তাহার প্রশংসা করিতেন। তাঁহার বন্ধুগণের তাহা ভাল লাগিত না। তাঁহারা বলিতেন, বালিকাদিগকে এরূপভাবে সর্ব্বদা পুরুষমণ্ডলীর সমক্ষে আনিয়া লেখাপড়ার চর্চ্চা করাইলে তাহারা নিতান্ত প্রগল্ভ ও দুঃসাহসিক হইয়া উঠে।

যমুনা তাহার জননীর ন্যায় দৃঢ়কায় ও সবল ছিল। একদা তাহার মাতৃস্বসা স্বীয় পুত্রের সহিত তাহাকে 'কুস্তি' খেলিতে বলেন। তাঁহার পুত্র যমুনা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হইলেও সেরূপ বলিষ্ঠ ছিল না। যমুনা কুস্তিতে তাহাকে সহজেই পরাস্ত করিল। তদবধি যমুনার মাসী তাহাকে "যমুনা মল্ল" বলিয়া ডাকিতেন। যমুনা স্বভাবতঃ এইরূপ বলবতী ছিল; তাহার উপর তাহার মাতামহী তাহার স্বাস্থ্যের ও খাদ্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই কারণে সপ্তম বর্ষ বয়সেই তাহার দেহ এরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে সহসা দশম বর্ষীয়া বলিয়াই মনে হইত। কাজেই শীঘ্র যমুনার বিবাহ দিবার জন্য সকলেই তাহার পিতাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। গণপৎরাও বরের অনুসন্ধানে বিশেষ তৎপর হইলেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে সহজে সফলকাম হইতে পারিলেন না।

বহু অনুসন্ধান করিয়াও যমুনার বর জুটিল না দেখিয়া দিন দিন তাহার পিতা মাতার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দৈব উপায়ে যদি কোন ফল লাভ হয়, এই ভাবিয়া, যমুনার জননী তাহাকে নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরে গিয়া প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে দিন সে শিবমন্দিরে গিয়া প্রথমবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল, সেই দিনই অপরাহ্নে গণপৎরাওয়ের জনৈক বন্ধু আসিয়া যমুনার মাতামহীকে বরের সংবাদ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, "এখানকার ডাকঘরে বর আসিয়াছে, ইচ্ছা হয় ত আমার সঙ্গে দেখিতে চল।" এই কথা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া যমুনার মাতামহী, মাতৃস্বসা ও ভগিনী সেই ব্যক্তির সহিত বর দেখিবার জন্য কল্যাণের ডাকঘরে গিয়া পশ্চাদ্‌ভাগের দরজা দিয়া ডাকবাবুর বাসায় প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বর তাঁহাদিগের এক প্রকার মনোনীত হইল। পর দিন গণপৎরাওয়ের জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে ডাকবাবুকে আহ্বান করিয়া কন্যা দেখান হইল। বর মহাশয় তৎসম্বন্ধে কোনও প্রশ্নাদি না করিয়া কন্যাকে দেখিবামাত্র বিবাহে আপনার সম্মতি জানাইলেন। তখনই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। গণপৎরাও কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন।

যাঁহার সহিত যমুনার বিবাহের সম্বন্ধ এইরূপে স্থির হইল, তাঁহার নাম গোপাল বিনায়ক জোশী সঙ্গমনের-কর। মহারাষ্ট্রে যাঁহারা গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে জোশী বলা হয়। সদ্বংশজাত যে কোনও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। এদেশে গণক ও দৈবজ্ঞেরা যেরূপ অপেক্ষাকৃত হীন শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন, মহারাষ্ট্রে সেরূপ নহে। গোপালরাও ও তাঁহার ভাবী শ্বশুর গণপৎরাও—ইঁহারা উভয়েই পুরুষানুক্রমিক "জোশী" ছিলেন। গোপালরাও বোম্বাই নগরীর ৭০ মাইল ঈশানকোণস্থিত সঙ্গমনের নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'সঙ্গমনের-কর' বলিত। গোপালরাও অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম, পরে খৃষ্টান এবং শেষে পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেন। খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াও তিনি স্বীয় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। সে যাহা হউক, গ্রাম্য পাঠশালায় মারাঠী লেখাপড়া শেষ

করিয়া তিনি যখন ইংরাজী শিক্ষার জন্য নাশিক গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে একটি ছয় বৎসর বয়স্ক বালিকার পাণিপীড়ন করিতে হয়। বালিকা-বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া দেশীয় প্রথানুসারে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করায় গোপালরাও অতীব অসন্তুষ্ট হন। তাঁহার জননী বধূকে গৃহকর্ম্ম করিবার আদেশ করিলে তিনি জননার সহিত কলহ করিতেন। তাঁহার মতে যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বধূগণকে গৃহকর্ম্মে বাধ্য করা নিতান্ত অনুচিত। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন ও স্বীয় স্ত্রীকে সামান্য লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প বয়সেই তাঁহার প্রথমা পত্নীর লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। ইহাতে গোপালরাওয়ের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগে। তিনি আর দারপরিগ্রহ করিবেন না, প্রথমে এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অপর অনেক ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছিল।

গোপালরাও অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া ডাক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বদলি হইয়া কল্যাণের ডাকঘরে আগমন করিলে যমুনার সহিত যেরূপে তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ স্থির করিবার সময় তিনি একটি বিষয়ে গণপৎরাওকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি যমুনাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া নিজের ইচ্ছামত শিক্ষা দান করিবেন, তাহাতে তাঁহার শ্বশুর কোনও আপত্তি বা বাধা দান করিতে পারিবেন না— এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে তিনি গণপৎরাওকে বাধ্য করিলেন। গোপালরাও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী না হইলেও নূতন বর অনুসন্ধানের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভাবী জামাতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন গোপালরাও বিবাহের আয়োজন করিবার জন্য ছুটী লইয়া সঙ্গমনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আমরা গোপালরাওয়ের যে অব্যবস্থিতচিত্ততার কথা বলিয়াছি, এই সময়ে তাহার প্রথম বিকাশ হয়। দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিবার সময় গোপালরাও বিধবা বিবাহ করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। যমুনার সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্ব্বে তিনি মহারাষ্ট্র দেশের বিদ্যাসাগর, বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপরশুরাম শাস্ত্রী পণ্ডিত মহোদয়ের ও অপর সমাজ সংস্কারকদিগের সহিত এ বিষয়ে পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। গণপৎরায়ের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে প্রতিশ্রুত হইবার পরও তিনি বিবাহের জন্য বিধবা কন্যার অনুসন্ধানে বিরত হন নাই। তাঁহার পিতা পুত্রের বিধবা বিবাহে প্রবৃত্তির বিষয় অবগত হইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি এবার বাটী গিয়া এই নূতন সম্বন্ধের কথা জ্ঞাপন করিলেন। বলা বাহুল্য, পুত্রের সুমতি হইয়াছে ভাবিয়া পিতামাতা অতীব আনন্দিত হইলেন এবং এই উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গোপালরাও সে বিষয়ে নানা প্রকারে বিলম্ব ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় বিবাহের জন্য একটি বিধবা কন্যার সন্ধান করিবার নিমিত্ত সংস্কারক বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন! এদিকে গণপৎরাও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজনবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হইল। কন্যার "আইবড় ভাত" প্রভৃতি উৎসব সমাহিত হইল। কিন্তু বরের কোনও খোঁজ খবর নাই! তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্ত বিষম উদ্বেগে যাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবাহের নির্দ্ধারিত দিবস অতীত হইয়া গেল। গ্রামের লোকেরা ও প্রতিবেশিগণ কেহ বরের চরিত্র, কেহ যমুনার ভাগ্য এবং কেহ বা যিনি মধ্যস্থ হইয়াছিলেন— তাঁহার ব্যবহারের সমালোচনা করিয়া নানা প্রকার মতামত প্রকাশ ও নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। যমুনার পিতামাতা এই ঘটনায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন।

এদিকে গোপালরাওয়ের মাথায় তখন বিধবা বিবাহ করিবার সংকল্প প্রবলভাবে ঘুরিতেছিল। এই কারণে তিনি পিতামাতাকে ও গণপৎরাওকে প্রতারিত করিবার জন্য সঙ্গমনের হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কিছুদিন পরে, যমুনার বিবাহের নির্দ্ধারিত দিবস অতিক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি কল্যাণে কর্ম্মস্থানে গমন করিবার আয়োজন

করিতে লাগিলেন। এমন সময়, সহসা যে ভদ্র লোকটি মধ্যস্থ হইয়া তাঁহার সহিত যমুনার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত নাশিক ষ্টেশনে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভদ্রসন্তান লোকনিন্দা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া গোপালরাওকে ধরিবার জন্য সঙ্গমনের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

পথিমধ্যে নাশিক ষ্টেশনে গোপালরাওকে দেখিতে পাইবা মাত্র তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। তখন গোপালরাও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মধ্যস্থ মহাশয় তখন তাঁহাকে নাশিকের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলেন এবং গোপালরাওয়ের ব্যবহারের বিষয় তাঁহার গোচর করিলেন। পরিশেষে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চেষ্টায় গোপালরাও তাঁহার নাশিকস্থিত আত্মীয়গণের সহিত বিবাহের জন্য কল্যাণে প্রেরিত হইলেন।

যথাসময়ে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই সময়ে যমুনার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নামকরণ হয়। পরিণয় কালে গোপালরাও নব বধূকে "আনন্দী বাঈ" নাম প্রদান করিলেন। তদবধি যমুনা আনন্দী বাঈ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইল।

গোপালরাওয়ের আত্মীয়গণ স্বদেশে প্রস্থান করিলে শ্বশুরের অনুরোধক্রমে তিনি শ্বশুর গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহার ঠানায় বদলি হয়। ঠানা, কল্যাণ হইতে অধিক দূর নহে। এই কারণে গোপালরাও প্রত্যহ নয়টার সময় কল্যাণ হইতে ঠানায় গমন করিতেন ও অপরাহ্নে পাঁচটার সময় পুনরায় শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। বিবাহের পরই তিনি আনন্দী বাঈর পাঠের জন্য কতিপয় মারাঠী পুস্তক আনাইয়া দিয়াছিলেন। আনন্দী বাঈর পূর্ব্বাবধিই লেখাপড়ার প্রতি বিরাগ ছিল। সুতরাং পুস্তকগুলি প্রায় যেথানকার সেই খানেই পড়িয়া থাকিত। গণপৎরাও-ও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁহার বন্ধুগণের দ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় জামাতা মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু গোপালরাও সে অনুরোধ পালন করিবার লোক ছিলেন না। যিনি তাঁহাকে বুঝাইতে আসিয়াছিলেন, গোপালরাও তাঁহাকে যে উত্তর দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন, তাহা শিষ্টাচার-সম্পন্ন বিজ্ঞজনের মুখে শোভা পায় না। তাই বলিয়াছি, তিনি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ফলে, নানা কার্য্যে তাঁহার এই অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি বিবাহের সপ্তাহ দুই পরেই একদিন অতি সামান্য কারণে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা নববধূকে এরূপ প্রহার করিয়াছিলেন যে, তাহার যন্ত্রণায় কয়েক দিন আনন্দী বাঈকে কাতর থাকিতে হইয়াছিল! যিনি স্ত্রীশিক্ষার অতীব পক্ষপাতী ও বালিকা বধূর শ্বশুর গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম করিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁহার এরূপ নিষ্ঠুরতা সত্য সত্যই অতীব বিস্ময়কর।

বিবাহের পর আট মাস গোপালরাও শ্বশুর গৃহে ছিলেন। বলা বাহুল্য, আনন্দী বাঈ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন এবং লেখাপড়ায় যথাসাধ্য ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন। সেখানে থাকিলে লেখাপড়া শিক্ষা হইবে না বুঝিতে পারিয়া গোপাল কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া আলিবাগে বদলি হইয়া গেলেন। আনন্দী বাঈর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহার মাতামহীও গোপালরাওয়ের সঙ্গে আলিবাগে গমন করিলেন। সেখানে গিয়াও আনন্দী বাঈ লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিলেন না। তিনি গোপাল রাওয়ের সম্মুখেই পুস্তক ও শ্লেট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন! গোপালরাও স্ত্রীর এইরূপ অবাধ্যতা দেখিয়া অন্য নীতির অবলম্বন করিলেন। তিনি রোষ প্রকাশ না করিয়া আনন্দী বাঈকে বিবিধ প্রকার খেলার ও বিলাসের সামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, লেখাপড়া শিখিলে আরও অনেক জিনিশ আনিয়া দিবেন। এইরূপ প্রলোভন প্রদর্শন করায় বিশেষ সুফল ফলিল। আনন্দী বাঈ লেখাপড়ায় অল্পে অল্পে মনোযোগ করিতে লাগিলেন। তথাপি পড়িতে বসিলে পিঞ্জরগত নূতন শুকপক্ষীর ন্যায় তাঁহার অবস্থা হইত। অল্পকাল মাত্র এক স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে তাঁহার প্রাণ ছটফট্ করিত। পড়া শেষ হইলে তিনি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহার খেলিবার

সঙ্গিনীদিগের নিকট গমন করিতেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অতীব তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া অল্পমাত্র পাঠে তাঁহার সমস্ত বিষয় আয়ত্ত হইত।

বেশ ভূষায় চাকচিক্য ও সৌষ্ঠবের প্রতি আনন্দী বাঈর বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। গোপালরাও ঠিক ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন ছিলেন, আড়ম্বর ও বিলাসপ্রিয়তার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। আনন্দী বাঈর বেশ বিন্যাস তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না এবং সেজন্য তিনি তাঁহাকে সময়ে সময়ে অতীব গ্রাম্য ভাষায় তিরস্কার করিতেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে আনন্দী বাঈ স্বীয় পূর্ব্বাভ্যাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীর মতানুবর্ত্তিনী হইলেন। এদিকে আলিবাগে গমনের পর এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মারাঠী শিক্ষা শেষ হইল। তিনি ভূগোল, ব্যাকরণ, মারাঠী ইতিহাস ও পাটিগণিতের প্রথমাংশ শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। হাতের লেখাও ভাল হইল।

বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই আনন্দী বাঈ গর্ভবতী হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটি পুত্র লাভ হইল। কিন্তু দশ দিনের অধিক কাল সে ইহলোকে অবস্থান করিতে পারে নাই। যে মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য আনন্দী বাঈ ইহজগতে আসিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্যই ভগবান্ এই দুর্ঘটনার সংঘটন করিলেন।

এইখানে আমরা আনন্দী বাঈর বাল্য জীবনের ইতিহাস সমাপন করিলাম।

শ্মশান-সঙ্গীত।*

লো উষার শুকতারা, গরবী গোলাপ,
শোন্ শোন্ এ প্রাণের বিলাপ প্রলাপ!
আলোক-আলোক নেয়ে তোদেরি মতন মেয়ে,
ছিল আমাদের সে যে গৃহ-পঙ্কজিনী;
কাছে ছিল, ভাল ক'রে তাই ত দেখি নি।

আধ-আধ বিকশিত কমলেরি মত
মৃদুল ললিত ছন্দে আচরিত ব্রত,
ঢল ঢল রূপরাশি, নাই অশ্রু, নাই হাসি,
ভাবে ভরা ঢুলু ঢুলু নীল আঁখি দুটি
থাকিত কিসের ধ্যানে নীলিমায় ফুটি।

সহস্র হস্তের রচা সোহাগের মালা
ভেবেছিনু বাঁধিয়াছে তোরে ফুলবালা;
কে জানিত, হায় হায়, শোভা নাহি ধরা যায়,
তাই ত মোহের ডোর লুটায় এখন;
ফুল গেছে উজলিতে আরেক ভুবন।

তুই অন্তঃপুর-আলো, জীবন্ত কবিতা,
স্বভাবের সুধা-কোলে আদরে লালিতা।
কল্পনার মায়া-গেহ দেখায় নি খুলে কেহ,
কখন আপনি তুই পারিলি জানিতে,
প্রতিভা দিতেছে আভা হৃদয়খানিতে।

উচ্ছ্বসিত হৃদিজাত লহরীর খেলা
ছাপায়ে উঠিতেছিল সবে মাত্রবেলা।
ফোট'-ফোট' হ'য়ে, হায়, শুকাইলি অবেলায়,
লীলাখেলা গীতগান সব সমাপন;
আগমনী না আসিতে তোর বিসর্জ্জন!

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

---

* এই কবিতাটি লেখিকার মাতুলকন্যা পঙ্কজিনী বসুর মৃত্যু-উপলক্ষে রচিত। বিগত ১৭ই ভাদ্র, ১৭ বৎসর বয়সে, পঙ্কজিনী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি এই সুকুমার বয়সেই অনেকগুলি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহার কতকগুলি 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক 'প্রদীপে' সবিস্তারে আলোচিত ও বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল।—সখী-সম্পাদক।

ন-বসত।

১

ফাল্গুন মাস। বসন্তের মলয় হিল্লোলে হিম কাতর প্রকৃতির বিশীর্ণ দেহে নব প্রাণের সঞ্চার হইতেছে। পল্লীগ্রামের দৃশ্য কি সুন্দর; অপরাহ্ন কাল, লোহিত তপন যেন হিঙ্গুলবর্ণ কিরণ-তরঙ্গে অবগাহন করিতে করিতে পশ্চিম সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছেন; নদীর জল লাল দেখাইতেছে। তীরে তরিগুলি দুলিতেছে, সমস্ত দিন রৌদ্রে কাপড় শুকাইয়া রজকদল নবধৌত বস্ত্রভার মস্তকে বহিয়া গৃহমুখে গমন করিতেছে। নদীর পাড়ের উপর একটি প্রকাণ্ড শিমুল গাছ; লাল ফুলগুলি গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে, অগণ্য পুষ্পস্তবক, তাহারই একটা স্তবকের মধ্যে বসিয়া একটা কোকিল কুহুধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে, তাহার বিরহী-হৃদয়ের আকুলতা সুতীব্র আর্ত্তস্বরে ঝঙ্কারিত হইতেছে। নদীর পর পারে লঙ্কা ক্ষেতে কয়েক জন পল্লীরমণী অঞ্চল ভরিয়া সুপক লঙ্কা তুলিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ার দল কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া অদূরবর্ত্তী ঝাউগাছে বসিতেছে, আবার কলরব করিতে করিতে উড়িয়া লঙ্কার ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পল্লীরমণীরা নদীর ঘাটে জল লইতে আসিয়াছেন, হাসি ও গল্পে ঘাট সজীব হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের সহাস্য সুন্দর মুখ নদীবক্ষে কমল বনের সুকোমল শোভা বিকাশ করিয়াছে।

মুখুজ্জিদের বড় মেয়ে লাবণ্য বলিলেন, "মালতি, শীগ্গির চ ভাই, আজ আমাদের সরোজের বর এসেছে, ন-বসতে তাকে নিয়ে যাবে। জিনিষপত্রগুলো এখন পর্য্যন্ত গোছান হয় নি।"—মালতি লাবণ্যের সখী, চাটুর্য্যেদের ছোট মেয়ে।

মালতি আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন, "ওমা বলিস্ কি লো! সরোজ এর মধ্যেই ন-বসতে যাবে? তারা না বৈশাখ মাসে নিতে আস্‌বে বলেছিল?"

লাবণ্য মুখ মার্জ্জনা করিয়া গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া বলিলেন, "মাউইমার ছেলে হবে কিনা, তাই তারা আর দেরি কর্ত্তে পাল্লে না, তা পরের বৌ জোর করে ত আর আট্‌কে রাখা যায় না, কি বলিস্ ভাই!"

"তা সত্যিই ত, বে হলে আর ঘর চলে না" বলিয়া মালতি ঘড়া ডুবাইলেন, শূন্য কুম্ভ অতখানি জল হঠাৎ উদরস্থ করা কষ্টকর বিবেচনায় 'বগ্ বগ্' করিয়া আপত্তি জানাইল; জোরের সংসারে আপত্তি টিকিল না। উভয়ে সিক্তবস্ত্রে তীরে উঠিলেন।

বনপথ দিয়া চলিতে চলিতে লাবণ্য বলিলেন, "সরোজ শ্বশুরবাড়ী যাবে, আগে হতেই আমার মনটা কেমন কর্‌চে; দুটি বোন আমরা কখন ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকি নি, সুকুমারী আমার মাসীগত প্রাণ।"—সুকুমারী লাবণ্যের একমাত্র কন্যা, তাহার বয়স পাঁচ বৎসর।

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল, ঘাটের পথ জনহীন হইয়া পড়িল, পথের দুধারে আম বাগানের ছায়ায় ভাঁটের পাতায় জোনাকীর ক্ষীণ আলো ফুটিয়া উঠিল, নদীর কম্পিত তরঙ্গে সান্ধ্য তারকার দিপ্তীহীন প্রতিবিম্ব ভাসিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি আসিল।

২

সরোজের বয়স তের বৎসর। মা দুটি মেয়ে লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন, কিছু ভূসম্পত্তি আছে, সুতরাং বিধবাকে অকূল সাগরে ভাসিতে হয় নাই। লাবণ্য কুলীনে পড়িয়াছিলেন, সুতরাং বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে শ্বশুরঘর লেখেন নাই; একমাত্র কন্যা সুকুমারীকে লইয়া লাবণ্য পিতৃগৃহে 'দুঃখের ভাত সুখ করিয়া' খাইতেছেন। অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নাই, কিন্তু তাঁহার মনের কষ্ট কে নিবারণ করিবে? সুকুমারীর পিতা কখন কখন সেখানে শুভাগমন করেন, কিন্তু সে কেবল পার্ব্বণী আদায়ের জন্য। লাবণ্য তাঁহার স্বামীকে কোন দুর্গম জগতের দুর্লভ পদার্থ জ্ঞান করিতেন, স্বামীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। দুর্ভাগ্য স্বামীর প্রতি সেই শ্রদ্ধা করুণার সহিত মিলিয়া লাবণ্যের মহিমাসমুজ্জ্বল চরিত্র পুষ্পের ন্যায় পবিত্র করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত পত্নিগর্ব্ব মাতৃহৃদয়ের উদার স্নেহে মগ্ন হইয়াছিল।

সুকুমারী তাহার কুলীন পিতাকে কখন কখন দেখিয়া থাকিবে, কিন্তু সে তাহার পিতার পিতৃমূর্ত্তি কোন দিন

দেখিতে পায় নাই। সংসারে সুকুমারীর পরিচিত মানব সমাজ তিনটি মাত্র প্রাণীর সমষ্টি ছিল, তাহার মা, মাসী, আই মা।

মাসীর সহিত সুকুমারীর দিবারাত্রি বিবাদ চলিত। বিবাদের অনন্ত কারণ ছিল—মাসী যদি সুকুমারীর মেয়ের লাল কাপড়খানা বদলাইয়া একখান হলদে কাপড় পরাইয়া দেয় তাহাতে সুকুমারীর রাগ; আবার মাসী যদি পান চিবাইয়া তাহা তাহার মুখে না দেয় তাহাতেও রাগ। ভাত খাইতে যাইবার সময় সুকুমারীর সংসার কার্য্য কিছু বাড়িয়া উঠিত, একদিন মাসী ডাকিলেন, "সুকুমারী, ভাত হয়েছে আয় রে!"

সুকুমারী মাথা না তুলিয়াই তাহার ধূলার ব্যঞ্জন রাঁধিতে রাঁধিতে বলিল, "আমি এখন হেঁসেল ফেলে ভাত খেতে যেতে পারি নে, ছেলেপিলেকে আগে না খাইয়ে দাইয়ে গিল্‌তে বসবো নাকি?"

মাসী বলিল, "তবে থাক্, তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

সুকুমারী তাহার সুন্দর হাতখানি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, "রাক্কুসী তুই এখ্খুনই শ্বশুরবাড়ী যা, এখ্খুনি যা, এখ্খুনি যা, তুই আমাকে দু চোখে দেখ্‌তে পারিস্ নে।"

মা তখন ঘি লইতে পাকশালা হইতে ভাঁড়ারে আসিতেছিলেন, মেয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তা ও শীগ্‌গিরই শ্বশুরবাড়ী যাবে, তখন কাঁদবার পথ পাবি নে। মাসী ওকে ভালবাসে না! বাড়ীতে আরও দশটা ছেলে আছে কিনা?"

লাবণ্যলতার এই ভবিষ্যৎ বাণী এতদিনে সফল হইতে বসিয়াছে।

৩

গাড়ী বাহিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়োয়ান মন্মথকে (সরোজের স্বামী) রোয়াকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল, "ছোট্ দা ঠাউর, আরে ঝপ্ করো সোয়ারি বার হতি কও না; বেলাটা যে তামান কাবার হয়ে গেল, সুয্যি পাটে বসে বসে হয়েছে, আমি গাড়ীতে এটু তেল দিয়ে নিই, তা নৈলে আবার আধেক রাস্তা যাতি না যাতি 'নিক' ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর কর্‌তে থাক্‌বে, সে বড্ডা ঝকমারি!"

অতঃপর গাড়োয়ান ভজহরি তেলের 'চোঙা' হস্তে গৃহ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। চোঙাটি তেলে তেলে পাকিয়া লাল হইয়াছে, তাহার দুই তিন স্থানে বেতের চটা দিয়া মজবুত করিয়া বাঁধা, চোঙাটির মুখের দিকটা কলমবাড়া করিয়া কাটা, তৈলের গমনাগমনের পথ একটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ছিদ্র, তিন চারি ইঞ্চি লম্বা একটা কাটি কর্করূপে ব্যবহৃত। গাড়ীর ছৈএর গায়ে ঝুলাইবার জন্য চোঙার গলায় দড়ি।

এবম্বিধ আকারের চোঙা হস্তে ভজহরি গৃহ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেও না দি ঠাক্‌রুণ, এটু তেল দাও, গাড়ীর চাকায় দেব।"

লাবণ্য একটা বাটিতে করিয়া তেল আনিয়া তাহার কয়েক পলা গাড়োয়ানকে প্রদান করিলেন।

অবগুণ্ঠনবতী লাবণ্যলতার চক্ষু দুটি অশ্রুরাশিতে ভাসিতেছিল; প্রাণাধিকা ভগিনীকে আজ তিনি বিদায় দিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ের অর্দ্ধাংশ যেন খালি হইয়া গিয়াছে, তিনি কলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভগিনীর ন-বসতের সকল আয়োজন ঠিক করিতেছেন। সরোজের কাপড়গুলা তিনি তাহার ট্রঙ্কের মধ্যে ভাল করিয়া সাজাইয়া দিলেন, আর একটা বড় বাক্সে লাল বেটুয়ার মধ্যে নানা রকম মশলা ও সংসার পাতিবার জন্য আবশ্যকীয় সকল রকম বাসন ও নানা উপকরণ পুরিয়া দিলেন।

জিনিষ পত্র সাজান হইলে, লাবণ্য বলিলেন, "মা, সরোজ গেল কোথা? আর ত বেলা নেই, গাড়োয়ান বড্ড তাড়াতাড়ি লাগিয়েছে, চাট্টি ভাত খেয়ে নেক্ না।"

মা বলিলেন, "সরোজ বুঝি উপরে আছে, দেখ্ দেখি মা।"

লাবণ্য নীচে কোথাও সরোজকে না দেখিয়া উপরে চলিলেন, দোতালায় গিয়া দেখিলেন ছাদের উপর চিলের পাশে সরোজ সুকুমারীকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার চক্ষু দিয়া জল ঝরি-

তেছে। সুকুমারী বলিল, "মাসি, তুই শ্বশুরবাড়ী যাস্‌নে, আমার যে বড় মন কেমন করচে।"

সরোজ কোন কথা বলিল না। নত মুখে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। "আমি আর তোর কাছে থাকবো না, মেসো বড় দুষ্টু, কেন তোকে নিয়ে যাবে? আমি নীচে যাই, মেসোকে মারিগে।"

এমন সময়ে সুকুমারী মাকে দেখিয়া বলিল, "মা মাসী কত কাঁদ্‌চে, মেসো মাসীকে নিয়ে যাচ্চে কেন? আমি মাসীকে যেতে দেব না, আমার মন কেমন করচে।"

লাবণ্যের আসন্নভগিনীবিচ্ছেদাশঙ্কা-কাতর-হৃদয়ের ব্যাকুলতা তাঁহার চোখে ও মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; তথাপি মেয়ের কথা শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বর্ষার সিক্ত প্রকৃতির উপর মেঘনির্মুক্ত চন্দ্রালোক পড়িয়া সমস্ত প্রকৃতি যেমন ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠে—লাবণ্যের মুখ তেমনিই লাবণ্যময় হইয়া উঠিল। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "তোর মন কেমন করবে বলে কি ও শ্বশুরবাড়ী যাবে না? শ্বশুরবাড়ী না যায় কে?"

মায়ের মুখের দিকে বড় বড় চক্ষু দুটি মেলিয়া সুকুমারী বলিল, হাঁ সবাই আবার শ্বশুরবাড়ী যায়? কৈ তুই ত যাস্‌নে মা! মা তুই শ্বশুরবাড়ী যাবি নে?"

মেয়ের কথায় লাবণ্যের পত্নিগর্ব্বে বড় আঘাত লাগিল, তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "যাব মা, আমাকেও একদিন যেতে হবে।"

সুকুমারী ব্যাকুলভাবে বলিল, "কবে মা?"

"যবে মরবো, সে এখন দেরি আছে। আয়রে সরোজ কিছু খেয়ে নিবি, মন্মথ বড় তাড়াতাড়ি করচে। সুকুও তোর মাসির সঙ্গে খেতে বস্‌বি।"

সরোজ ও সুকুমারীকে সঙ্গে লইয়া লাবণ্য ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন।

৪

মন্মথর পাতে সরোজ সুকুমারীকে সঙ্গে লইয়া কিঞ্চিৎ আহার করিল, তাহার ক্ষুধা ছিল না, কিন্তু দিদির পীড়াপীড়ি ছাড়ান দায়! এখনই গাড়ীতে উঠিতে হইবে, পাড়ার বৌঝিয়া অনেকে সরোজের ন-বসতে যাওয়া দেখিতে আসিয়াছেন। আচার্য্য পাড়ারবামন ঠাকরুণও আসিয়াছেন, এসকল কাজে তাঁহার উপস্থিত না হইলে চলে না। তিনি ঘরের মধ্যে চৌকির উপর একখানি কম্বলাসনে বসিয়া ন-বসতের জিনিষ পত্র দেখিতেছেন, সমালোচনারও ত্রুটী নাই; তিনি বলিলেন, "ননদ পেটারীটা আর একটু বড় হলে ভাল হ'তো, আর এ কালের মত দুই এক শিশি ওডিকলোম না ল্যাভেণ্ডার কি ছাই বলে সে সব দিতে পার নি! যে কাল পড়েছে, মন্মথর ভগিনীটি আবার তাতে কালেজে পাশ করা ছেলের পরিবার, এ সব পাড়াগেঁয়ে জিনিষে তার মন উঠে তবে ত! তা তোমার সরোজকে যা দিয়েছ মন্দ হয় নি, এখন ত আর দু পাঁচ শো রোজগার করবার মানুষ নেই, ভাগ্যি দু দশ বিঘা নাখরাজ ব্রহ্মোত্তর ছিল তাই ত!"

সরোজের মা বলিলেন, "আমি আমার সাধ্যি মত দিতে ত আর কসুর করিনি! সরোজ আমার পেটের ছেলে, তাকে কি আমার দিতে অসাধ? তা একবারে ত আর দেওয়া থোয়া শেষ হয় না। নাতি নাতনি হোক, যখন যেমন জোটে দেবো।"

"কিন্তু যাই বল বড় বৌ, সরোজের শাশুড়ী যে রকম দজ্জাল মেয়ে শুনেছি, তাতে আমার ত বড় ভয়—পাছে সরোজ তার মন যুগিয়ে চল্‌তে না পারে। ও যেন সেখানে গিয়ে বেশ নরম সরম হয়ে থাকে, শাশুড়ীর কথা মত চলে। পান হতে চূণ টুকু খস্‌লে সে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বস্‌বে।"

সরোজ নিকটেই উপস্থিত ছিল, শুনিয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বিবাহের সময় দুদিনের জন্য সরোজ শশুরবাড়ী গিয়াছিল, তখন সে শাশুড়ীর বিশেষ কোন পরিচয় পায় নাই বটে, কিন্তু সেই দুদিনের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল 'সে বড় কঠিন ঠাঁই।' সরোজ তাহার মায়ের মত স্নেহ-প্রবণ এবং দিদির মত ক্ষমাশীল করুণ হৃদয়, গৃহের বাহিরে আর কোথাও পাইবার আশা করে নাই।

মন্মথ বাহির বাটী হইতে ভিতরে আসিয়া ঘড়ি খুলিয়া

বলিল, "আর দেরী করা হবে না, পাঁচটা বেজেগেছে।"

সরোজের মা বলিলেন, "বাবা মন্মথ, ইনি আমাদের বামন ঠাকরুণ, মস্ত মানী ঘর ওঁদের, আমাদের উপর ওঁর বড় টান, সরোজকে যে কতই ভাল বাসেন তা আর বলবার নয়, ওঁরে প্রণাম কর।"

মন্মথ নতমস্তকে শাশুড়ীর অনুমতি পালন করিলেন।

বামন ঠাকরুণ বলিলেন, "বাবা শুনেছি তুমি বড় সুছেলে, তা আমার সরোজের মত মেয়েও এ কলিতে বড় বেশী মেলে না। দেখো বাবা যেন সরোজের কোন কষ্ট না হয়, নূতন শ্বশুড় বাড়ী যাচ্ছে, মা দিদিকে ছেড়ে কখন থাকে নি, কোন দোষ ঘাট কল্লে কটু কথা বলো না, ছেলে মানুষ!"

অতঃপর একখানি ধোয়া কাপড় পরিয়া সকলকে প্রণাম করিয়া অবগুণ্ঠনবতী সরোজ গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অবগুণ্ঠনের ভিতর তাহার চক্ষু দুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। নেত্য ঝি একটা হাঁড়িতে কতকগুলা জলখাবার আনিয়া তাহা গাড়ীতে তুলিয়া দিল; সে দেখিল সরোজের অশ্রু আর কোন মতে থামিতেছে না, নেত্য সরোজের মুখ খানি ধরিয়া তাহার বুকের কাছে আনিয়া স্নেহগর্ভস্বরে বলিল, "ছিঃ দিদিমণি কেঁদনা, এই চোত মাসটা গেলেই বসেখ মাস পড়তে না পড়তেই আমি তোমাকে নিয়ে আসবো, দিদি আমার, সোনা আমার কেঁদোনা।" নেত্য সরোজের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। নেত্য সরোজকে মানুষ করিয়াছিল, সরোজের শত অত্যাচার প্রতিদিন সে নত মুখে সহ্য করিয়াছে, গাড়ী হইতে নামিয়া আসিবার সময় উচ্ছ্বসিত অশ্রুভারে নেত্য চারিদিক ঝাপ্‌শা দেখিল।

সুকুমারী চোখের জল মুছিয়া সিক্তনেত্রে বাহিরের দিকে চলিল, কাহাকেও দেখিবার প্রত্যাশা করিতেছিল, তাহার চক্ষু নিরাশ হইল না, সুকুমারী গাড়ীর অদূরে নিতান্ত নিঃসহায় ভাবে একটি ছবির মত দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীর ভিতর হইতে সরোজ দুই হাত বিস্তার করিয়া সুকুমারীকে গাড়ীতে উঠিবার জন্য কত ইঙ্গিত করিল।

সুকুমারী নড়িল না, একটা কথাও বলিল না।

গাড়োয়ান গাড়ী জুড়িয়াছিল। যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল সকলে সেই দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুকুমারী এতক্ষণ পরে 'মাসীকে কেন যেতে দিলি' বলিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, মাসীকে ছাড়িয়া সে কখন থাকে নাই।

লাবণ্য কন্যাকে কোলে তুলিয়া কত সোহাগ করিলেন, কত কথা বলিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সুকুমারী ফুলিয়া ফুলিয়া কেবল বলে, 'ওরে মাসীরে, আমাকে ফেলে কেন গেলিরে!'—কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি সুকুমারী তাহার মাসীকে স্বপ্নে দেখিল। তাহার পর কত দিন পর্য্যন্ত তাহার মুখে হাসি দেখা যায় নাই, প্রতি দিন সকাল বেলা উঠিয়া সে ছাদের উপর বসিয়া যেদিকে তাহার মাসীকে তাহার মেসো মশায় গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া থাকিত, যদি গাড়ীখানা ফিরিয়া আসে, এবার মাসী আসিলে সে আর তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিবে না; কিন্তু গাড়ী ফিরিল না। সুকুমারীর খেলার বাক্সে পুতুল গুলি অভুক্ত রহিল, তাহার রান্নাঘরে কাদার তরকারী অযত্নে শুকাইতে লাগিল, তাহার ছবির বই এক কোণে অনাদরে পড়িয়া থাকিল, সন্ধ্যাকালে ছাদের উপর মায়ের কাছে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া মাসীর কথায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, এবং হঠাৎ ছল ছল চক্ষে সে মাকে জিজ্ঞাসা করিত, "মা মাসী কবে আস্‌বে?" বসন্তের চন্দ্রালোক পরিব্যাপ্ত ছাদে বসিয়া লাবণ্যের মনেও ভগিনীর সেই বিদায় কাতর অভিমানভরা মুখখানি জাগিয়া উঠিত। লাবণ্য নিজের হৃদয়ে কন্যার হৃদয়-বেদনা অনুভব করিতেন, তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিতেন, "আস্‌বে সুকু, তোর মাসী এই বৈশাখ মাসেই আস্‌বে, অত ভাবিস্‌নে।" এক দিন লাবণ্য বলিলেন, "তোর মাসী এতক্ষণ খেয়ে দেয়ে শুয়েছে, হয়ত আমাদের কথা ভাব্‌ছে।"

৫

বিবাহের সময় বেয়ান বৌকে অনন্ত দিতে পারেন নাই বলিয়া মন্মথর মা তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছিল। ন-বসতেও অনন্ত দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, এবার বেয়ানের ক্রোধ অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। বৈশাখ মাস আসিলে সরোজের মা সরোজকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিল, বেয়ান বলিয়া পাঠাইলেন, "অনন্ত পাঠিয়ে বেয়ান যেন বৌমাকে নিয়ে যান, তাঁর মেয়ে জলে পড়ে নি।"

সরোজের বিধবা মাতার বিদীর্ণপ্রায় মাতৃহৃদয় কোলের মেয়েটির অদর্শনে দিবারাত্রি হাহাকার করিত। দিনান্তে আহারে বসিয়া তাঁহার মনে হইত, সরোজকে কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তাহার পেট ভরে না, তাই তিনি ভাতের পাথর সম্মুখে লইয়া বলিতেন, "আহা সরোজ আমার বড় অভিমানিনী, সে অভিমান করিয়া থাকিলে কে তাহার দুঃখ বুঝিবে? মা আমার হয় ত কতদিন পেট ভরিয়া ভাত খায় না।"—প্রতিদিন প্রভাতে তিনি রাধা-গোবিন্দ জীর মন্দিরদ্বারে মাথা খুঁড়িয়া আসিতেন, মনে মনে বলিতেন, "হে ঠাকুর, সরোজকে ভাল রেখো।"

পদ্মাতীরে সরোজের শ্বশুরবাড়ী। সেখানে সরোজের কোন সমবয়স্কা সঙ্গিনী নাই। তাহার প্রতি শাশুড়ীর অযত্ন ছিল না, বৌমাকে তিনি কোন দিন কটু কথা বলেন নাই, স্নেহও দেখাইতেন, কিন্তু তাঁহার সে ব্যবহারে মাতৃভাবের অপেক্ষা কর্ত্তৃত্বের ভাব বেশী ছিল; সরোজ শাশুড়ীকে একটি নূতন জগতের নূতন মানুষ মনে করিত, পাছে কোন দোষ করিয়া বসে এবং সে দোষের জন্য যদি দু কথা শুনিতে হয়, এজন্য সরোজ বড় ভয়ে ভয়ে বাস করিত।

সরোজের বড় জা তাহার দিদির স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যামিনী সত্যই সরোজকে আপনার মায়ের পেটের বোনের মত ভাল বাসিতেন। যামিনী না থাকিলে সরোজের জীবন কি দুঃসহ হইত! সরোজ দুবেলা তাহার 'দিদির' কাছে বসিয়া গল্প শুনে, পদ্মায় স্নান করিতে ও জল আনিতে যায়। পদ্মার গিয়া তাহার মনে কত আনন্দ হয়! কতদূরে নদীর জলরাশি তটরেখার বালুকারাশির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, বহুদূর পর্য্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, তাহার পর নদীর পরপার, বন ঝাউর গাছে তীরভূমি কালো করিয়া রাখিয়াছে, রাখালেরা গরু চরাইতেছে, জেলেরা নদীর মধ্যে ডিঙ্গী চড়িয়া মাছ ধরিতেছে, পালভরে নৌকা আসিতেছে, চলন্ত মেঘের সাদা ছায়া নদীর বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কত রকম পাখী পাখা মেলিয়া কেমন সারি বাঁধিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, কে জানে তাহারা কোথায় যাইতেছে, সরোজের মনে হইত এই সব পাখী হয় ত তাহাদের ছাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে, সে যদি ঐ পাখীর মত উড়িতে পারিত! এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সরোজ কলসী কাঁখে লইয়া নদী হইতে উঠে। উপরেই ধানের ক্ষেত, কৃষক জমী চাষ করিতেছে, ক্ষেত পার হইয়াই তাহাদের বাড়ী যাইবার গরুর গাড়ীর রাস্তা, এই রাস্তা দিয়া সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে; রাস্তার কাছে আসিয়াই সরোজের প্রাণের মধ্যে আন্‌চান্ করিয়া উঠে, তাহার আকুল প্রাণের মধ্যে ব্যাকুল আগ্রহ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে—"মাগো, কবে বাড়ী যাব!"—তাহার সেই তৃষিত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাভরা আগ্রহবাণী কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না, কেবল নিখিল জগতের অদৃশ্য থাকিয়া অন্তর্যামী তাহা শুনিতে পান।

যামিনীর একটি মেয়ে ছিল নাম হিমি। হিমি হেমপ্রভা অথবা হেমন্তকুমারী কোন্ নামের অপভ্রংশ বলা কঠিন, সে প্রশ্ন কাহারও মনে আসিত না। সরোজ তাহাকে হিমি বলিয়াই ডাকিত, হিমিকে সরোজ নিতান্ত আপনার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার প্রত্যেক স্পর্শ সরোজের হৃদয়ে সুকুমারীর তিন বৎসর বয়সের স্মৃতি জাগাইয়া দিত।

* * * * *

আষাঢ় মাস আসিয়াছে। মেদুর অম্বরে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন, অবিরল ধারাপাতে ধরাতল সিক্ত, গ্রাম্য-পথ কর্দ্দমাক্ত। নদীর জল কল কল উচ্ছ্বাসে উভয়কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিতেছে, কত দেশ হইতে নূতন নূতন

নৌকা পণ্যরাজী বক্ষে লইয়া কত অজানা দেশে পাল তুলিয়া তুলিতে তুলিতে চলিয়াছে; নদীর পাড় ধুপ্ ধাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, শুভ্রাকাশ-কুসুম নদীতীরের বহুদূর পর্য্যন্ত রজত-শ্রী বিকাশ করিতেছে।

ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বায়ুর বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। সরোজ বাতায়ন পথে চাহিয়া দেখিল বৃষ্টি ধারায় কিছু দেখা যায় না, অদূরে তরঙ্গসঙ্কুলা পদ্মা ঝড়ের সঙ্গে মিলিয়া একটা গভীর শব্দকল্লোল কর্ণে ঢালিয়া দিতেছে, এবং বৃষ্টির শব্দ তাহাতে ঢাকিয়া যাইতেছে। সরোজ শূন্য দৃষ্টিতে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশে মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। চারি দিক হইতে মেঘ আসিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

যামিনী তখন একখানি মাদুরের উপর দেহ বিস্তার পূর্ব্বক অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে সুর করিয়া ছড়া বলিয়া হিমিকে ঘুম পাড়াইতেছিলেন; তাঁহার কোমল কর-পল্লবের মৃদু আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র ধ্বনির ন্যায় তাঁহার মধুর কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল:—

"আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে বৃষ্টি ধারা ঝরে
ব্যথার ব্যথী ভাইটি আমার প্রাণ কেমন করে।"
"আর দুদিন থাকো দিদি কেঁদে কোকিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্‌কী সাজিয়ে।"
"হাড় হোল ভাজা ভাজা মাস হ'লো দড়ি
আয় রে ভাই নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

সরোজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া বসিয়া এই সুমধুর ছড়া শুনিতে লাগিল। সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে স্তব্ধ ভাবে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারই অন্তর্নিহিত অপূর্ণ বাসনা এই ছড়ার মধ্যে জীবন্ত হইয়া তাহার হৃদয়ের বেদনা কিরূপে অশ্রু ধারায় পরিণত করিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যদি তাহার ব্যথার ব্যথী একটি ভাই থাকিত তাহা হইলে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সরোজ আজ এই নদী ধারে, বৃষ্টিপ্লাবিত বর্ষার নিরানন্দময় অলস মধ্যাহ্নে তাহার বিরহকাতর প্রাণের সকল আগ্রহ ঢালিয়া বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বলিত,

"আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে বৃষ্টি ধারা ঝরে
ব্যথার ব্যথী ভাইটি আমার প্রাণ কেমন করে।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রাজাকুমারী মাইচাম্পা।

১

ভারতে কোনকালে কোন বিষয়েরই প্রকৃত ইতি-বৃত্ত রাখিবার প্রথা না থাকায়, পুরাতত্ত্বসন্ধিৎসু ব্যক্তি-গণকে অনেক সময় কিম্বদন্তী ও প্রচলিত গাথার উপর নির্ভর করিতে হয়। অবশ্য কাল সহকারে সেগুলিতে বক্তা ও কবির অলঙ্কারচ্ছটা কিছু কিছু সংযুক্ত হইতে হইতে মূলবিষয় হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়ে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কাল, দেশ, পাত্রাদি সম্যক্ বিচার করিয়া সে গুলির সারভাগ গ্রহণ করিতে পারিলে, শ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হয় বলিয়া বোধ হয় না। আমরা অদ্য এইরূপে সংগৃহীত একটী উপাখ্যান বিবৃত করিব।

এতদ্দেশে বহুদিন হইতে মুকুটরাজার গল্প প্রচলিত আছে, শুধু গল্প নহে, অনেক কীর্ত্তিও আছে। কীর্ত্তি-গুলির অন্য ন্যায় সঙ্গত কোন অধিকারী না থাকায়, আমরা সেই প্রবাদ বাক্যের ন্যায় মুকুট-রাজকেই, সেগুলির প্রকৃত অভিনেতা মনে করি এবং সেই বিশ্বাস-বশতই তদ্বিবরণ যথাসম্ভব পাঠক গণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝিঁকরগাছা রেলষ্টেশনের দুই ক্রোশ দূরে, ছোট মেঘলা নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। নিশ্চিত জানিবার উপায় না থাকিলেও, ঘটনা পরম্পরা সাহায্যে যতদূর অনুমিত হয়, তাহাতে এই গ্রামে কিঞ্চিদধিক দ্বি-শত বৎসর পূর্ব্বে, মুকুটরাজা বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি না হইলেও, প্রাচীন কালের সুলভের দিনে তাহার যে আয় ছিল, তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিঘ্ন হইত না। রাজার "মাইচাম্পা" নামে একটী পরম সুন্দরী কুমারী ছিল। পদ্মিনী জাতীয়া রমণী বলিয়া তাহার

অশেষ খ্যাতি ছিল। বয়োপ্রাপ্তা হইলে, মাইচাম্পার বিবাহের জন্য মুকুটরায় চতুর্দ্দিকে ঘটক প্রেরণ করিলেন। ব্যবসায়ের অনুরোধে, রূপ, গুণ বর্ণনার সময়, ঘটকগণ একটু "চটক" লাগাইলেও পূর্ব্বকালে যেন ইহার মাত্রা অধিকই ছিল, বোধ হয়। যাহা হউক, তাঁহাদিগের কৃপায় মাইচাম্পার পদ্মিনী নাম অল্পকালের মধ্যেই দেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

অনেকানেক স্থান হইতে রাজকন্যার বিবাহ-প্রস্তাব আসিতে লাগিল, কিন্তু রাজার মনোমত না হওয়ায়, বিবাহে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। এদিকে মাইচাম্পাও ক্রমে পঞ্চদশে পদার্পণ করিলেন; সত্বর তাঁহাকে পাত্রস্থা করা আবশ্যক। সম্বন্ধ স্থির হইল, সম্প্রদানের দিন ধার্য্য হইল। প্রকৃতিপুঞ্জ বিবাহোৎসব-দর্শন-মানসে দিন গণিতে লাগিল। রাজাই হউন, প্রজাই হউন, বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। গ্রীক পণ্ডিত সোলন সেই জন্যই বলিয়াছিলেন যে, পরিবর্ত্তনশীল কাল-চক্র-বিঘূর্ণনে যখন কিছুই স্থির নহে, তখন বর্ত্তমান সম্পৎ দেখিয়া কাহাকেও সুখী মনে করা বিড়ম্বনা।

নানা স্থান হইতে বিবাহের "সওগাদ" আসিতে লাগিল; রাজবাড়ীতে আত্মীয়, বন্ধু মিলিত হইতে আরম্ভ হইল। আনন্দ কোলাহলে পুরী পূর্ণ হইল। এমন সময়ে এক ফকীর শিষ্য একটী মৃৎপাত্র হস্তে লইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত। ফকীরের উপহার দেখিতে সকলেই ব্যগ্র হইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কেহই সে পাত্রটীর আবরণ উন্মোচন করিতে সমর্থ হইল না! তাহাতে দর্শকমণ্ডলীর কুতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। রাজকুমারী পর্য্যন্ত দেখিতে উপস্থিত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যেই তিনি তাহাতে হস্তার্পণ করিলেন, অমনি আবরণ উন্মুক্ত হইল। তন্মধ্যে এক জোড়া চুড়ী ও কিছু মিষ্ট দ্রব্য ছিল। মাইচাম্পা চুড়ী জোড়া তৎক্ষণাৎ হস্তে ধারণ করিলেন, কিন্তু কে জানে, কোন্ সামান্য ঘটনার মধ্যে বিধাতা কি প্রকার মহাকাণ্ডের বীজ নিহিত রাখেন! রাজনন্দিনীর এই চুড়ী পরিধানই মুকুট রায়ের সর্ব্বনাশের মূল হইল।

২

যশোহরের পাঁচ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম কোণে বারবাজার নামক স্থানে একজন প্রসিদ্ধ ফকীর ছিলেন। তৎকালে "বুজ্‌রুকির" জন্য তিনি বিলক্ষণ খ্যাতি লাভও করিয়াছিলেন। অনেক গুলি শিষ্য তাহার সঙ্গে থাকিত। কিছুকাল পরে, মুকুটরাজের রাজধানীর দুইক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে আর একটী "ডেরা" স্থাপন করিলেন। এই স্থানে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। কখন বারবাজার, কখন এই নূতন স্থানে ফকীর সাহেব বাস করিতেন। এই দুইটী স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে মধ্যে মুক্তেশ্বরী নামক একটী নদী পার হইতে হইত। ফকীর দেওয়ান দুইটী মেষ সঙ্গে করিয়া পতিঙ্গালী নামক গ্রামের নীচে পার হইতেন। অদ্যাপি লোকে সে ঘাটটীকে গাজীর ঘাট বলিয়া থাকে।

যে পাটনী বরাবর তাহাকে পার করিত, সে কখন তাঁহার নিকট হইতে পারিশ্রমিক লয় নাই। এক দিন তাহার বাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে, ফকীর সাহেবের নিকট তাঁহার মেষ দুইটীর একটীকে হাসিতে হাসিতে চাহিয়া বসিল। তিনি প্রথমতঃ তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন ও তৎপরিবর্ত্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া ছাগাদি ক্রয় করিতে পরামর্শ দিলেন। নির্ব্বোধ পাটনী স্বর্ণ মুদ্রার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া মেষই বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল। মনে করিল, ফকীর যখন এই মেষ দুইটীকে এত যত্ন করেন ও তাহার একটীর জন্য সুবর্ণ মুদ্রা দানেও প্রস্তুত, তখন উহা অবশ্যই কোন অলৌকিক গুণ-শালী হইবে; ফকীর বারংবার প্রার্থনা প্রত্যাহার করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা দেওয়ানজী তাহাকে একটী মেষ দিয়া গেলেন। পাটনী হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বাটী আনিয়া গোশালায় বাঁধিয়া রাখিল। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া যেমন গোশালার দ্বারোদ্ঘাটন করিল, অমনি প্রকাণ্ডকায় একটী ব্যাঘ্র ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিল! পাটনী-নন্দন সহসা তাদৃশ কৃতান্তের সমক্ষে পতিত হইয়া যে মূর্চ্ছিত হইয়া-

ফকীর ব্যাঘ্র সহ রাজদ্বারে উপস্থিত।
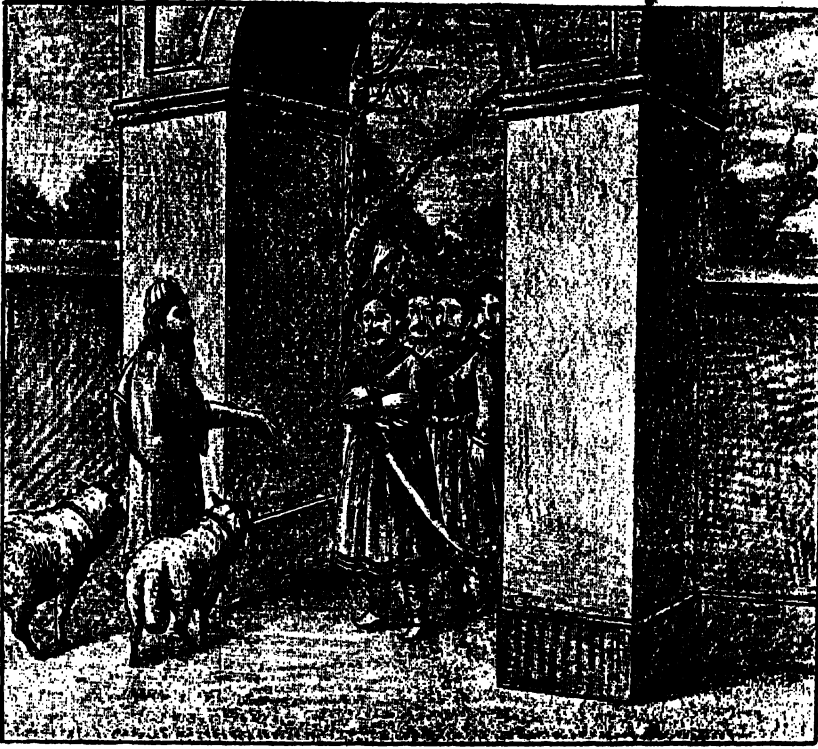
ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তদনন্তর সংজ্ঞা পাইয়া দেখে তাহার তিনটা গাভীকেই অতিথি মেষ মহাশয় (?) হত্যা করিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়াছেন! তখন তাহার চৈতন্য জন্মিল। বুঝিল যে, এই জন্যই ফকীর সাহেব মেষটাকে দিতে এত কাতর হইতেছিলেন। তাহার অসীম তপোপ্রভাবে বন্য বৃক দিবাভাগে মেষরূপে তাহার অনুগমন করিত, আবার নিশিযোগে স্বমূর্ত্তি ধারণ করিত। তাহারা তাঁহার দেহ রক্ষী।

ক্ষুন্নমনে পাটনী তখন ফকীর দেওয়ানের "আস্তানায়" যাইয়া দেখে, দুইটী মেষই পূর্ব্ববৎ তাঁহার পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট, কিন্তু অদ্য তাহার মেষের নিকটস্থ হইতে সাহস হইতেছেনা। যাহা হউক, তাহার অবস্থা দর্শনে ফকীর সাহেবের কিছু বুঝিতে বাকি থাকিল না। তিনি তাহাকে পূর্ব্বদিনের স্বর্ণ-মুদ্রাটী দিয়া গাভী ক্রয় করিতে উপদেশ দিলেন। পাটনী ক্ষতি-পূরণ হইল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং বাড়ী আসিয়া এই আমানুষিক কাহিনী প্রচার করিল। খেয়া ঘাট ও স্বর্ণকারের দোকান চিরকালই কোন বিজ্ঞাপন প্রচারের সংবাদ-পত্র স্বরূপ। ফকীর দেওয়ানের পূর্ব্ব "বুজ্‌রুকির" সহিত বর্ত্তমান ঘটনা মিলিত হইয়া অনতিকাল মধ্যে তাঁহাকে দেব-কল্প করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রবল প্রতাপ ও ঐশী মহিমা বিঘোষিত হইয়া পড়িল। হাটে, মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র ফকীরের কথা। কচিৎ কাহার উপর ক্রোধ হইলে আর নিস্তার নাই। একটী মেষ ছাড়িলেই সংসার টলিয়া যায়! সুতরাং তাঁহাকে ভয় না করিয়া কে পারে? আমরা শতশত বৎসর পরেও দুর্ব্বাসার নামে শিহরিয়া উঠি।

৩

মাইচাম্পার বিবাহোপলক্ষে মুকুট রাজের বাটীতে চারিদিক হইতে "সওগাদ" আসার যে তালিকা দিয়াছি, তন্মধ্যে আমরা একজন ফকীর-যুবককে আবৃত মৃণ্ময়-পাত্র হস্তে যাইতে দেখিয়াছি। সে এই ফকিরেরই শিষ্য ও

ইঁহারই প্রদত্ত উপহার লইয়া রাজবাটী উপস্থিত। যখন তিনি এই শিষ্যমুখে শুনিতে পাইলেন যে, রাজকুমারী ভিন্ন কেহ সেই পাত্র উন্মুক্ত করিতে পারে নাই ও সেই চূড়ী মাইচাম্পা তৎক্ষণাৎ আহ্লাদিত হইয়া হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তখন তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, এই চূড়ী পরিধান করিয়া রাজকন্যা তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী হইয়াছেন, সুতরাং অন্যত্র তাঁহার বিবাহ দিতে গেলে রাজার মঙ্গল হইবে না, পরন্তু বিবাহার্থীকেও বিপন্ন হইতে হইবে!

কি সর্ব্বনাশ! একজন বিধর্ম্মী ফকীরের এরূপ উক্তি কাহার সহ্য হয়? কিন্তু লোকে প্রমাদ গণিল! ফকীরের কোপে রাজার সর্ব্বনাশ হইবে! বাস্তবিক, তাঁহার কঠোর বাক্যে ভীত হইয়া বরপক্ষ অসম্মতি জানাইল। মুকুটরাজ তচ্ছ্রবণে জ্বলিয়া উঠিলেন, শীঘ্রই ফকির সাহেবকে স্থানান্তর যাইতে আদেশ দিলেন, নতুবা অবিলম্বে এই ধৃষ্টতার যথোচিত প্রতিশোধ পাইবেন। এই কথা শুনিয়া ফকীর সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—'কন্যা-সম্প্রদান জন্য যেন মুকুট রায় বিবাহের দিনে প্রস্তুত থাকেন।' সত্য সত্যই উদ্বাহ দিনে রাজবাটী অন্ধকারময়! বর আসিল না! নিশীথকালে ফকীর দেওয়ান ব্যাঘ্র দুইটীকে লইয়া দ্বারদেশে সমুপস্থিত। ভীষণ আর্ত্তনাদ ও কোলাহলে বহির্ব্বাটী কম্পিত হইল! কাহার সাধ্য, তাহা নিবারণ করে বা তদ্দিকে দৃষ্টি করে?

অচিরাৎ বৃকদ্বয় রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পৌরজনবর্গকে নিহত করিল; কেবল মাইচাম্পা ও তাহার কনিষ্ঠ একটী অষ্টম বর্ষীয় বালককে স্পর্শ করে নাই। ফকীর সাহেব তাহাদিগকে লইয়া রাজবাটীর অনতিদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং সেই স্থানেই তিনি ব্রাহ্মণ রাজকুমারীর পাণিপীড়ন করিলেন! শিষ্যগণ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই স্থানে একটী "দরগা" স্থাপন করিলেন। একটী শিমূল ও একটী জীবলী বৃক্ষ তথায় মিলিত হইয়া, এই অদ্ভুত অসবর্ণ বিবাহের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তথায় পৌষ মাসে মেলা হয়; একদিন অন্নসত্রও হয়; কুটীর বাঁধিয়া তাঁহার চেলাগণ অদ্যাপি তন্নিম্নে বাস করিয়া থাকে, স্থানীয় লোকেও কত "মানস" করে। ইহাকে "গাজীরতলা" বলে।

ফকীর রাজকুমারীকে লইয়া যাইতেছে।

এখানে ফকীর অধিক কাল থাকিলেন না। অত্যল্প কাল পরে নব পরিণীতা ভার্য্যাকে ও তাহার ভ্রাতাকে একটী বাঘ পৃষ্ঠে আরূঢ় করিয়া, নিজেও অপরটীতে আরোহণ করিয়া দ্বিরাগমন করিলেন। ঝিকরগাছা হইতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে বেত্রবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া একটী স্থানে "ডেরা" মনোনীত করিলেন। ভালরূপ "জাহির" হওয়াই তখন তাঁহার লক্ষ।

এই নূতন স্থানে দেওয়ানজী আসিয়া গার্হস্থ্য সুখভোগ করিতে পান নাই। মনোক্ষোভে মাইচাম্পা আপন-গলদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া ঘৃণিত জীবনের অবসান করিল! ফকীর সাহেবের সংসার-বিতৃষ্ণা নবীভূত হইল। তিনি স্থানীয় ভূ-স্বামী প্রদত্ত পীরোত্তর দ্বাত্রিংশৎ বিঘা ভূমির উপর স্থাপিত এই "দরগায়" রাজকুমারকে

রাখিয়া অরণ্যগামী হইলেন। যাইবার সময় বালকটীকে এক গাছ "আশা" দিয়া যান। কোন স্থানে পর্য্যটন করিতে বাসনা হইলে এই দণ্ড যেন হস্তে থাকে, ও তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইলে তিন বার ডাকা হয়। যাহা হউক, রাজকুমার আত্মীয় স্বজনকে হারাইয়া, ফকীরের উপদেশ মত এই স্থানেই জীবনাতিবাহিত করিলেন। অদ্যাপি এই "মাইচাম্পার দরগা" বিদ্যমান আছে।

প্রবাদ আছে ফকীর দেওয়ান বন-গমন কালে গোকুল নগরে কানাই ঘোষ নামক গোপের বাটীতে মধ্যাহ্ন কালে একদিন অতিথি হন। কানুর বৃদ্ধা মাতার অযত্নে বিরক্ত হইয়া, তিনি অভিসম্পাৎ করেন। তাহাতে উক্ত গোপের গাভীগণ অল্প সময়ের মধ্যেই মরিয়া গেল। কানাই বাটী আসিয়া সমুদয় বিপদের কথা শুনিল। সন্ধান করিয়া দেওয়ানজীকেও ধরিয়া বসিল। তিনি তাহার কাতরতায় দয়ার্দ্র হইয়া তাহার গাভীগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে তিনি "গাজী" বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। অদ্যাপি এতদঞ্চলে ফকীর দিগের মুখে গাজী সাহেবের এই গোকুল নগরের কীর্ত্তি কাহিনীর ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়। এ দেশে "বেহুলা লখিন্দরের ভাসান" হিন্দু সমাজে যেরূপ স্থান পাইয়া থাকে, "গাজীর গান' মুসলমান সমাজে সেইরূপ সমাদর পায়।

এই সময়ের পর, গাজী সাহেবের আর কোন কথা জানা যায় না। বারবাজারে তাঁহার প্রথম "আস্তানার" অনেক নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। অনেক গুলি পঙ্কিল পুষ্করিণী তাঁহারই কীর্ত্তি বলিয়া অদ্যাপি কথিত হয়।

মুকুটরাজার বাস্ত নিস্প্রদীপ হইলেও, তাঁহার এক ভ্রাতা বাঁচিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব বসতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তাহার এক ক্রোশ উত্তরে গিয়া বাস করিলেন; ও নিজ নামানুসারে তাহার "শ্রীরামপুর' নাম রাখিলেন। এই স্থানের পূর্ব্ব নাম কালী নগর, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গ্লানির জন্য এখানেও থাকিতে পারিলেন না। ঝিনাইদহের অন্তর্গত জয়দিয়া গ্রামে উঠিয়া গেলেন। শ্রীরামপুরে শ্রীরামরায়ের কৃত বাঁধা ঘাট প্রভৃতির চিহ্ন তথাকার বাঁওড়ের ধারে দেখা যায়। এখন সে বংশের অনেক কৃত বিদ্য হইয়া বংশোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

মুকুটরায়ের রাজধানীর অন্য নিদর্শন না থাকিলেও, তাঁহার খনিত শতাধিক জলাশয় শুষ্ক বক্ষে তাঁহার রাজশ্রীর সাক্ষ্য দিতেছে। স্থানে স্থানে পুরাতন ইষ্টক খণ্ড দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ উহার নিকটস্থ কপোতাক্ষি নদীতীরে একটী প্রাচীন ভগ্ন মন্দির, এক হস্ত উচ্চ একটী কৃষ্ণ বর্ণের শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা মুকুটরাজের স্থাপিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এক্ষণে তাহার সেবার কোন বন্দোবস্ত নাই, তাহার নিকটেও কেহ যায় না; প্রবাদ আছে, এই শিবলিঙ্গ সেবায় অকল্যাণ হয়। মুকুটরাজের পরিণাম দেখিয়াই বোধ হয়, এইরূপ প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে। ঝিকরগাছার বাজারের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে, অশ্বত্থবৃক্ষবিমণ্ডিত হইয়া 'মহাকাল' এখনও কাল মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

— —

বালুকেশ্বর মন্দির।

বোম্বাই হইতে গিরগাঁও পর্য্যন্ত অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বালুকেশ্বর মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী, নাগদেবী ও শ্রীবেঙ্কটেশ্বর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই সকল মন্দির দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। বালুকেশ্বর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মালাবার শৈলের পশ্চিমে এই মন্দির অবস্থিত। ইহার কারুকার্য্য অতীব বিচিত্র না হইলেও, সূর্য্যাস্ত সময়ে মালাবার শৈল হইতে দেখিলে ইহাকে পরম সুন্দর বলিয়া মনে হয়। বালুকেশ্বরের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে। রামচন্দ্র যখন সীতার অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নানা দেশে ঘুরিতেছিলেন, তখন এই স্থানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। তাঁহার শিবপূজার
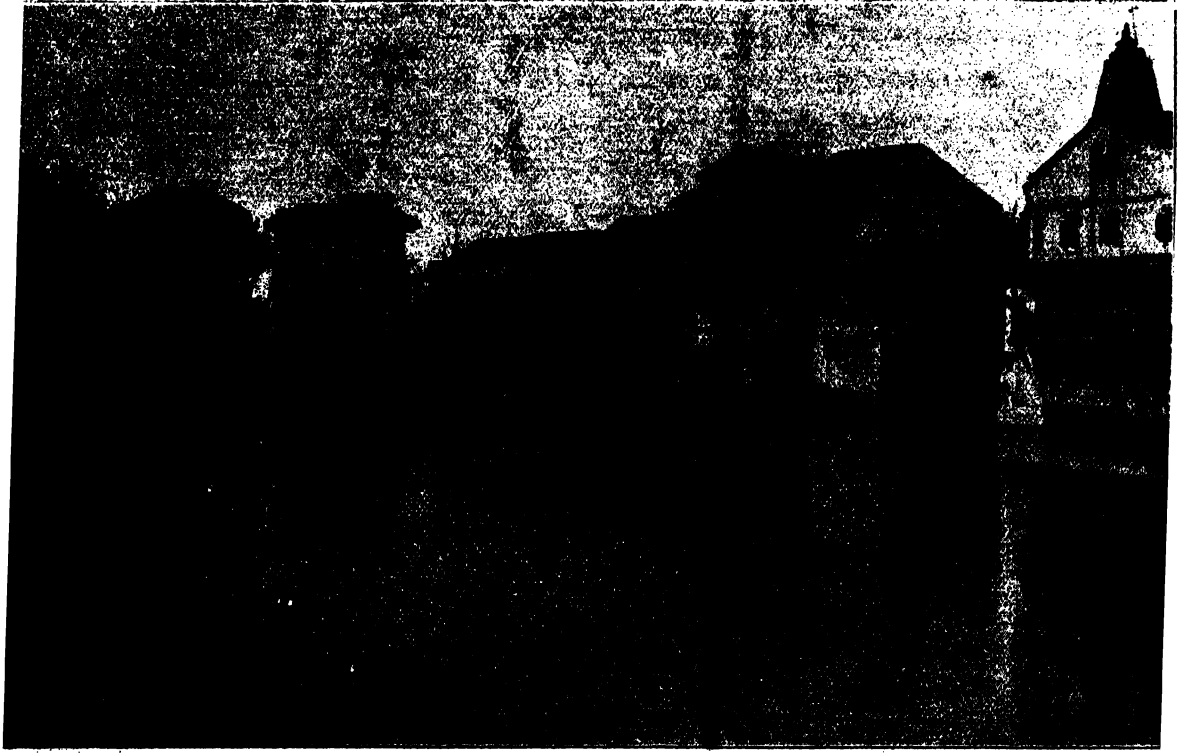
জন্য লক্ষ্মণ প্রতিদিন একটী করিয়া শিব কাশী হইতে আনিয়া দিতেন। দৈবাৎ একদিন লক্ষ্মণের শিব লইয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় রামচন্দ্র বালুকার শিব প্রস্তুত করিয়া পূজা সমাপন করেন। উহা হইতেই বালুকেশ্বর নাম হইয়াছে। কথিত আছে যে, পোর্ত্তুগিজদিগের আগমনে স্থান অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া বালুকা-নির্ম্মিত শিব সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত হন। এখন যে শিব অবস্থিত আছেন, তাহা লক্ষ্মণের আনীত।

এই স্থানে বাণতীর্থ নামে একটি জলাশয় আছে। তৎ-সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, রামচন্দ্র তৃষ্ণাতুর হইয়া বাণনিক্ষেপে ভূগর্ভ হইতে জলোত্তন করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই উহার নাম বাণতীর্থ হয়। উহার একটি বাঁধা ঘাট আছে। বাণতীর্থের চারিধারে অনেক তীর্থযাত্রী ও ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন।

কমলালেবু।

শীতকাল আসিয়াছে। শ্রীহট্টের কমলালেবুতে বেলিয়াঘাটা গুলজার। যশুরে ফিরিওয়ালার ডাকে হাঁকে রাস্তা ঘাট প্রতিধ্বনিত। এমন দুরন্ত শীতেও বালক বালিকাদের কোমল গণ্ড কমলালেবুর রসে সিক্ত। এই সময়ে কমলালেবু সম্বন্ধে যদি আমরা দুই একটি কথা বলি—আশা করি তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শ্রীহট্ট ছাড়া নাগপুর, দার্জ্জিলিঙ্গ প্রভৃতি স্থানেও কমলালেবু জন্মিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীহট্টের লেবুই সর্ব্বা-পেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উৎকৃষ্ট লেবু প্রায়ই এদেশে আসে না। এদেশের পাঠিকারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, শ্রীহট্টের লোকেরা কমলালেবুর রস নিঙ্গড়াইয়া দুগ্ধের সহিত খাইয়া থাকেন। সে লেবু এত মিষ্ট যে দুগ্ধ নষ্ট হয় না!

শ্রীহট্টে কমলা মধুও পাওয়া যায়। তাহা বড়ই সুমিষ্ট। দশ বৎসরের পূর্ব্বে আমি একবার কোন বন্ধুর কৃপায় একটুকু কমলামধু খাইয়াছিলাম—আমার জিহ্বায় এখনও যেন তাহার স্বাদ লাগিয়া রহিয়াছে। কমলামধু ও কমলালেবু সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আজ সকল কথা না বলিয়া, উহা হইতে কি কি খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

কমলালেবুর পোলাও।

কমলালেবুর পোলাও রাঁধিতে গেলে নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি একান্ত আবশ্যক।

(১) কমলালেবুর কোওয়া এক সের,
(২) কমলালেবুর রস তিন পোওয়া,
(৩) উৎকৃষ্ট চিনি তিন ছটাক,
(৪) সরু চাউল অর্দ্ধ সের,
(৫) ঘৃত এক পোওয়া,
(৬) ছোট এলাচের দানা দুই আনা,
(৭) দারুচিনি দুই আনা,
(৮) লবঙ্গ এক আনা,
(৯) কিস্‌মিস তিন ছটাক,
(১০) বাদাম অর্দ্ধ পোওয়া,
(১১) পেস্তা অর্দ্ধ পোওয়া,
(১২) জাফরান তিন আনা,
(১৩) ক্ষীর অর্দ্ধ পোওয়া,
(১৪) লবণ দেড় তোলা,
(১৫) জল /১। পাঁচ পোওয়া,

প্রথমে কিঞ্চিৎ ঘৃতে বাদাম ও পেস্তাগুলি ভাজিয়া লইতে হইবে। তার পর একটা স্বতন্ত্র পাত্রে কিস্‌মিস-গুলি ভাজিয়া বাদাম ও পেস্তার সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দেও।

তারপর খানিকটা ঘৃত আর একটা পাত্রে চড়াও। ঘৃতটা বেশ গরম হইয়া গেলে উহাতে গরম মশলাগুলি ফেলিয়া দেও। ভাজা হইবার কিঞ্চিৎ বাকী থাকিতে তাহাতে চাউলগুলি মিশ্রিত করিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। তারপর আস্তে আস্তে উহাতে লেবুর রস খাওয়াইতে হইবে। সমস্ত রস নিঃশেষিত হইলে লবণ ও গরমজল উহাতে ঢালিয়া দেও। চাউলগুলি সিদ্ধ হইয়া আসিলে বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি উহাতে ঢালিয়া দিতে হইবে। তারপর ঘন হইয়া আসিলেই হাঁড়ি নামাইয়া লও, কমলালেবুর পোলাও প্রস্তুত হইল। কাঠের উনুনে মৃদু জ্বালে রন্ধন করা আবশ্যক।

কমলামৃত।

একটা কাচের পাত্রে খানিকটা কমলালেবুর রস, দুইটা ডিমের চট্‌চটের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখ। তারপর, অপর একটা পাত্রে খানিকটা পরিষ্কার মিশ্রির সহিত কতকগুলি কমলালেবুর খোসা চট্‌কাইতে থাক। যখন বুঝিবে, খোসার গন্ধ মিশ্রির সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তখন ঐ খোসাগুলি ফেলিয়া দেও। মিশ্রিগুলি পূর্ব্ব-কথিত কমলালেবুর রসের সহিত মিশাইয়া একটা কাচ বা পাথর বাটীতে ঢাকিয়া রাখ। তারপর এক সের পরিমাণ দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিয়া লও। ক্ষীরের সহিত ঐ মিশ্রিত সামগ্রী একত্র করিলেই কমলামৃত প্রস্তুত হইল। উহাতে দুই এক ফোঁটা আতর ফেলিয়া দিলে আরও ভাল হয়।

কমলালেবুর সরবত।

একটা লেবুর খোসা এক পোওয়া জলে বেশ করে চট্‌কাইতে থাক। কাচ বা পাথর বাটীতে হইলেই ভাল হয়। তারপর খোসাগুলি ফেলিয়া দিয়া এক ছটাক মিশ্রি উহাতে আধ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখ। তারপর উহাতে খানিকটা কাগজি বা পাতিলেবুর রস ছাড়িয়া দিলেই সরবত প্রস্তুত হইল।

সহজ গৃহ-চিকিৎসা।

শিশুর বর্ণ, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি।

কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রাহ্মীশাক ও স্বর্ণভস্ম; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ ঘৃত ও মধু সহ খাওয়াইলে শিশুর বর্ণ, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি হয়।

শিশুর নাভি শোথ।

মৃত্তিকাপিণ্ড গরম করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করতঃ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে নাভিতে স্বেদ দিলে শিশুর নাভিদেশের শোথ আরোগ্য হয়।

জ্বর ও কাস।

মৌরী, পিপুল, রসাঞ্জন, খৈ চূর্ণ, কাঁকড়া শৃঙ্গী ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধু দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করাইলে শিশুর বমি, কাস, ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

স্তনদুগ্ধ পানে বমি।

স্তন দুগ্ধ পানে শিশুর বমি হইলে, বৃহতী ও কণ্টিকারী ফলের রস একত্রে ঘৃত ও মধুসহ পান করাইবে। তাহাতেই বমি নিবারণ হইবে।

শিশুর বমি।

আমের আঁটির শাঁস, খৈ ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করাইলে বমি দূর হয়।

হিক্কা ও বমি।

পিপুলচূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, মধু ও চিনি একত্রে ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে শিশুর হিক্কা ও বমি বিনষ্ট হয়।

বমি ও অতিসার।

কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল; ইহাদের পত্র একত্রে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিশুর বমি ও অতিসার বিনষ্ট হয়।

অতিসার।

আমড়াছাল, আমছাল ও জামছাল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ শিশুকে সেবন করাইলে অতিসার বিনষ্ট হয়।

রক্ত-আমাশয়।

তিল তৈল, চিনি, মধু, তিল ও যষ্টী মধু; একত্র বাটিয়া শিশুকে সেবন করাইলে রক্তস্রাব ও আমাশয় নিবারিত হয়।

গ্রহণী।

ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশুকে পান করাইলে গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

চক্ষুরোগ।

দারু হরিদ্রা, মুথা, ও গেরি মাটী সমভাগ ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষের বাহিরে লেপন করিলে শিশুর চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

শয্যায় মূত্র ত্যাগ।

কিঞ্চিৎ চিনির সহিত দুই তোলা পরিমাণ তেলাকুচের রস সেবন করাইলে শিশুর শয্যায় মূত্রত্যাগ নিবারিত হয়। কৃমি জন্মিলেও এই রোগ হইয়া থাকে। সুতরাং কৃমি যাহাতে বিদূরিত হয় তাহার চেষ্টা করাও আবশ্যক।

কর্ণ শূল।

সজিনার রস তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণ শূল আরোগ্য হয়।

স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরীয়া

KUNTALINE PRESS.

প্রথম ভাগ। ফাল্গুন, ১৩০৭। দ্বিতীয় সংখ্যা।
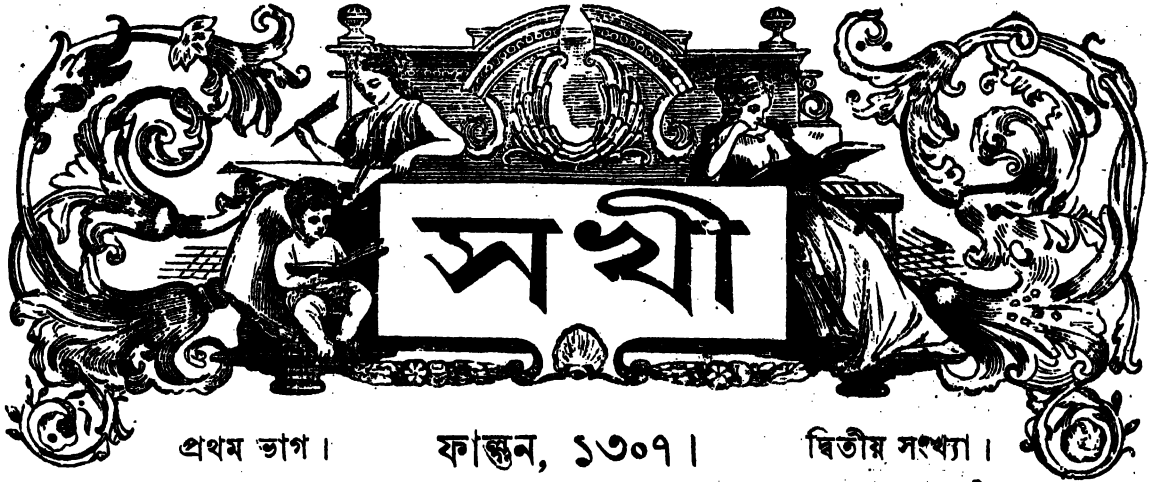
মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

১০ই মাঘ প্রাতে কলিকাতায় সংবাদ আসিল, ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া মানবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। অমনি গভীর শোকের ছায়াতে সহর ছাইয়া পড়িল। যাহাকে দেখি, তাহারই মুখ গম্ভীর, উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই যেন এক অব্যক্ত বিষাদের তরঙ্গ প্রবাহিত। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে চারিদিক যেমন একটা শূন্যভাব ধারণ করে, আকাশে যেমন একটা নীরব হাহাকার জাগিয়া উঠে, এমন কি সুবিমল সূর্য্যালোকেও যেমন এক অদৃশ্য অন্ধকার আসিয়া মিশিয়া যায়, লোককোলাহলময়ী কলিকাতা মহানগরীর উপরেও আজ সেইরূপ এক অনির্ব্বচনীয় শোকচ্ছায়া আসিয়া পড়িল। সেই দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত, সমুদায় দেশ সেই শোকে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

ইহার দশ দিন পরে, মহারাণীর সমাধি উপলক্ষে ভারতের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত যে শোকের ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছিল, বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার কাহিনী লোকের স্মৃতিতে অঙ্কিত থাকিবে। সেই দিন, কলিকাতার গড়ের মাঠে, যে দৃশ্য দেখিলাম, এমন কখনও দেখি নাই, আর কখনও দেখিব কিনা সন্দেহ। চারিলক্ষ লোকে সেই সুদূর-প্রসারিত ময়দান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হরিনামের ধ্বনিতে, খোল করতালের বাদ্যে, আকাশতল কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, ছোট বড় সকলে মিলিয়া এক প্রাণ হইয়া, এদেশে আর কদাপি এমন ভাবে কোনও সৎকার্য্য করিয়াছে বলিয়া জানা নাই। তাহার পরদিন কলিকাতা সহরের অনেক ভদ্র-সন্তানেরা মিলিয়া, নগরের নিরন্ন ভিক্ষুদিগকে মহাভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ছয় হাজারের অধিক স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, সারি দিয়া বসিয়াছিল। কলিকাতার অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা কোমর বাঁধিয়া, স্বহস্তে খেচরান্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দে বহু বিস্তৃত রাজপথ লোকারণ্যে পরিণত হইল। এদৃশ্যও কখনও ভুলিব না। হিন্দুর সন্তান, খৃষ্টিয়ান মহারাণীর শ্রাদ্ধ এমন ভাবে, এরূপ সরল শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিল, দেখিয়া কাহার না চক্ষু তৃপ্ত হইয়াছে?

এই শোকের অর্থ কি? হাটে বাজারে, গ্রামে সহরে, আপামর সাধারণে এরূপ শোক প্রকাশ করিল কেন? একি খাঁটি শোক, না ইহা কেবল সাহেবভুলানো লোক দেখান একটা কৃত্রিম ক্রন্দন মাত্র? অন্যক্ষেত্রে কৃত্রিম বলিয়া সহজেই সন্দেহ হইতে পারিত, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, কোথাও কোথাও একটু আধটু লোকদেখান ভাব থাকিলেও, মূলে যে এ শোক অতি অকৃত্রিম, তাহাতে

কোনও সন্দেহ নাই। অথচ যাহাকে আমরা কখনও চক্ষে দেখি নাই, যিনি আমাদের স্বদেশীয়া, স্বজাতীয়া বা স্বধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন না, তাঁহার জন্য এমন দেশব্যাপী শোকের হাহাকার উঠিল কেন? এ প্রশ্ন সহজেই মনে উদিত হয়।

ভিক্টোরিয়া আমাদের রাণী ছিলেন; আমরা তাঁহার প্রজা ছিলাম। দেশব্যাপী শোকের এ একটা অতি প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। দুঃখে বিপদে, অবিচারে অত্যাচারে, গত পঞ্চাশদধিক বৎসর কাল, আমরা পুরুষানুক্রমে "দোহাই মহারাণী" বলিয়া কাঁদিয়াছি, ডাকিয়াছি। চক্ষে তাঁহাকে না দেখিলেও বারংবার তাঁহার কথা শুনিয়া টাকা পয়সায় তাঁহার মুখাকৃতি দেখিয়া, তাঁহার নাম লইয়া, তাঁর বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া, তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের প্রাণের কেমন একটা যোগ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এই জন্য তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সুপ্ন বিস্তর ক্লেশ হওয়া স্বাভাবিক। এই দেশ-ব্যাপী শোকের ইহা একটা প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অন্য কারণও আছে।

ভিক্টোরিয়া আমাদের মহারাণী ছিলেন, এজন্য তাঁহার মৃত্যুতে ত আমরা ক্লেশ পাইবই; কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমাদের মহারাণী না হইয়া, জার্ম্মানের বা ইতালীর বা অন্য কোনও দেশের রাণী হইতেন, এমন কি তিনি যদি রাজরাণী নাও হইতেন, তথাপি আমরা তাঁহার পরলোকগমনে শোকার্ত্ত হইতাম। সমুদয় সভ্যজগৎ ত আর তাঁহার প্রজা নহে; অথচ আজ কেন এই শোকের তরঙ্গে, ইংলণ্ড ও ভারতের সঙ্গে সঙ্গে, জার্ম্মাণি, ইতালী রুশ, ও মার্কিন সকলে আন্দোলিত ও আকুল হইয়াছে? পৃথিবীব্যাপী এই গভীর শোকোচ্ছ্বাস রাজভক্তি হইতে উৎপন্ন হয় নাই। যাহারা রাজারাণী মানে না, রাজপদের যাহারা ঘোরতর বিদ্বেষী, তাহারাও আজ ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোকাকুল। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, ভিক্টোরিয়া আকারে মানবী হইয়াও প্রকৃতিতে দেবী ছিলেন। তাঁহার সাধুচরিত্রে জগতের লোক মুগ্ধ ছিল। তাঁহার সাধুতা ও সদাশয়তা গুণে সভ্য জগতের আপামর সাধারণে তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া ভাবিত। তাই তাঁহার মৃত্যুতে আজ সকলে অতি সরল ভাবে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

শৈশবাবধিই ভিক্টোরিয়ার সাধুতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই অতি সাধুব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম এড্ওয়ার্ড; মাতার নাম লুইসা। রাজার সন্তান বলিয়া রাজকুমার এড্ওয়ার্ডের আচার ব্যবহারে কখনও অহঙ্কার বা অসৌজন্য প্রকাশ পায় নাই। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, উদারমতি এবং ধর্ম্মভীরু বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই প্রজামণ্ডলীর অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ভিক্টোরিয়ার পিতৃব্যগণ সকলেই অতিশয় দুশ্চরিত্র লোক ছিলেন, এবং ইঁহারা তাঁহার সাধু চরিত্রের জন্য রাজকুমার এড্ওয়ার্ডকে যথাবিধি নির্য্যাতন করিতেন। রাজকুমারের অমায়িকতার জন্য তাঁহার পিতা, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ পর্য্যন্ত কখনও তাঁহাকে স্নেহচক্ষে দেখেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ভিক্টোরিয়া সাতমাস বয়সেই পিতৃহীনা হন। সুতরাং পিতার স্নেহ-সম্ভোগ ও উপদেশ লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

ভিক্টোরিয়ার মাতাও অতিশয় সাধ্বী ছিলেন। জর্ম্মান দেশে তাঁহার পিত্রালয় ছিল। ইংলণ্ডে আসিয়া দুই বৎসর কাল মাত্র তিনি স্বামীর ঘর করিতে পান। এই দুই বৎসর মধ্যে তিনি ভাল করিয়া ইংরাজি পর্য্যন্ত শিখিতে পারেন নাই। এমন সময় পতি পরলোকে গমন করায় তাঁহার সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। রাজপরিবারের কেহই তাঁহার স্বামীকে বিশেষ ভাল বাসিতেন না। সুতরাং সাতবৎসরের বালিকা ভিক্টোরিয়াকে লইয়া, তিনি বন্ধুহীন, সহায়হীন, সম্পত্তিহীন হইয়া, অকুল পাথারে ভাসিলেন। এ অবস্থায় সহজেই পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু লুইসা স্বর্গগত স্বামীর মুখ চাহিয়া এবং আপনার একমাত্র কন্যার কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, পিত্রালয়ে যাইয়া সুখস্বচ্ছন্দে থাকা অপেক্ষা, স্বামীর দেশে, স্বামীর পরিবার পরিজনের মধ্যে দীন দশায় কালাতিপাত করাও শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। ভিক্টোরিয়া যেমন চল্লিশ বৎসর কাল স্বর্গগত স্বামীর মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত

ছিলেন, ভিক্টোরিয়ার সিংহাসোনারোহণ কাল পর্য্যন্ত, তাঁহার মাতা সেইরূপ অষ্টাদশ বৎসর কাল নানা অসুবিধা ও ক্লেশ সহ্য করিয়া ছিলেন। মাতা এবং কন্যা উভয়েই পাশ্চাত্য সমাজে সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়ার চরিত্রের যে সকল সদ্‌গুণে আজ সভ্যজগৎ বিমোহিত হইয়া আছে, শৈশবাবধিই তাঁহাতে সে সকলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আশ্চর্য্য সত্যানুরাগ দেখা গিয়াছে। ফলতঃ মিথ্যা কথা বলা তাঁহার এমনই প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহার জ্ঞাতসারে অপর কাহারও মিথ্যা কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। একদিন বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ ভিক্টোরিয়া কিছুতেই পাঠে মনোনিবেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। লেজেন নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তখন তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ভিক্টোরিয়া তাঁহার বড়ই অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। কথাটা রাণী লুইসার কাণে গেল। লুইসা অমনি কন্যার পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারীর পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করাতে লেজেন বলিলেন যে, একবার মাত্র ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া এই কথা শুনিবামাত্র, শিক্ষয়িত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"না লেজেন্ দুইবার; তোমার কি মনে নাই?"

সাধুশীলা জননীর সুশিক্ষাগুণে ভিক্টোরিয়ার হৃদয়ের সদ্ভাবসকল কালক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিল। রাজকুমারী হইয়াও শৈশব হইতেই ভিক্টোরিয়াকে মাতার অর্থাভাব বশতঃ সর্ব্বদা সংযম সাধন করিতে হইত। একদিন তিনি এক দোকানে কতকগুলি জিনিষ কিনিতে গিয়াছিলেন। জিনিষগুলি কিনিয়া বন্ধু বান্ধবদিগকে উপহার দিবেন, এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার মাতা স্বেচ্ছামত ব্যয় করিবার জন্য ভিক্টোরিয়াকে মাসে মাসে যৎসামান্য টাকা দিতেন। এই টাকা জমাইয়াই তিনি এই সকল দ্রব্যজাত কিনিতে গেলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, যে টাকা আছে, জিনিষের দাম তাহা অপেক্ষা বেশী হয়। দোকানদার ধারে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু ভিক্টোরিয়া তাহা কিনিলেন না। যদি দোকানদার ঐ জিনিষটী তুলিয়া রাখে, তবে আগামী মাসের বৃত্তি পাইলে তিনি সেটী কিনিয়া লইতে পারেন, তিনি কেবল এই কথা তাহাকে বলিলেন। দোকানী তাহাই করিল। ভিক্টোরিয়া পর মাসের বৃত্তি পাইয়া, জিনিষটী কিনিয়া লইলেন।

ভিক্টোরিয়ার বাল্যকালে ইংরাজদিগের রাজ দরবারের অতিশয় দুরবস্থা ছিল। রাজদরবার সংসৃষ্ট স্ত্রী পুরুষদিগের অনেকেরই চরিত্র অতিশয় কলুষিত ছিল। এইজন্য রাজকুমারী লুইসা প্রায়ই আপনার শিশু কন্যাকে লইয়া রাজদরবার হইতে দূরে থাকিতেন। সে সময়ে ইংরাজ সমাজের বড় লোকেরাও কেবলই আমোদ প্রমোদে, নাচগানে, ভোজে দিন কাটাইতেন। ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁদের তেমন একটা সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই চলে। এরূপ ভাবে দিবানিশি আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিলে মানুষের চরিত্র নিতান্তই লঘু হইয়া যায়। যে কখনও কোনও ভাল কাজ করে না, সে কদাপি সাধু চরিত্র লাভ করিতে পারে না। ভিক্টোরিয়ার মাতা ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি আপনার কন্যাকে সর্ব্বদা সৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহার গৃহে কখনও আমোদ কোলাহল শুনা যাইত না। এইরূপ শৈশবশিক্ষাগুণে, যৌবনে পাদক্ষেপ করিতে না করিতেই ভিক্টোরিয়ার চরিত্র অশেষ সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া উঠে।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ভিক্টোরিয়া পিতৃব্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মে রাত্রি দুই ঘটিকার সময় রাজা চতুর্থ উইলিয়াম মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ভিক্টোরিয়া তখন অন্য এক রাজবাটীতে বাস করিতেছিলেন। রাজপুরোহিত, রাজবাটীর কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারীকে লইয়া, ভিক্টোরিয়াকে পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাদ দিতে গেলেন। ভিক্টোরিয়া তখনও ঘুমাইতেছিলেন। প্রথমে তাঁহার পরিচারিকাগণ কেহই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইতে সম্মত হয় নাই। পরে রাজপুরোহিতের বিশেষ অনুরোধে একজন গিয়া তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা ভিক্টোরিয়াকে জানাইল। অনতিবিলম্বে শয়ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই, কেবল একখানি শাল গায়ে দিয়া,

আলুলায়িত কেশে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, ভিক্টোরিয়া অভ্যাগত রাজ-কর্ম্মচারিগণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি রাজপুরোহিত ও তাহার সহচর রাজকর্ম্মচারী জানু পাতিয়া, অবনত মস্তকে নূতন মহারাণীকে অভিবাদন করিয়া, মহারাজের মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন। ভিক্টোরিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, রাজপুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমার জন্য আপনি কৃপা করিয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করুন।" অমনি রাজা প্রজা সকলে নতজানু হইয়া রাজার রাজা পরমপ্রভু পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নূতন রাজত্বের সূচনা করিলেন।

এত অল্প বয়সে, যৌবনের প্রারম্ভে, বহুমানাস্পদ পদ লাভে অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। অনেকে আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া রাজসিংহাসন লাভে ধর্ম্ম ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। এ পদের যোগ্য চরিত্র ও শক্তি তাঁহার লাভ হইবে কিনা, তাই ভাবিয়া আকুল হইলেন। রাজমুকুট মাথায় পরিতে যে রমণী অশ্রুপাত করেন, তাঁহার রাজত্বে যে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রজার সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

ভিক্টোরিয়ার পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্তই অসচ্ছল ছিল। যে সামান্য বৃত্তি তিনি পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। এইজন্য মৃত্যুকালে তিনি অনেক টাকার ঋণ রাখিয়া যান। পিতার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল বলিয়া শৈশবে ভিক্টোরিয়াকেও কখনও কখনও অর্থকৃচ্ছ্র সহ্য করিতে হইত; এমন কি, সামান্য দুই চারি টাকার জন্য পর্য্যন্ত তাঁহাকে সঙ্কুচিত থাকিতে হইত। এখন পার্লেমেণ্ট সভা তাঁহার সাড়ে আটত্রিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ঠিক করিয়া দিলেন। ভিক্টোরিয়া এই বৃত্তি হইতে সর্ব্বাগ্রে পিতাকে ঋণমুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লর্ড মেল্‌বোরণ সে সময়ে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মহারাণী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার পিতার যে সকল ঋণ আজিও শোধ হয় নাই, তাহা আমি সর্ব্বাগ্রে শোধ করিতে চাই। আমাকে এটি করিতেই হইবে, আপনি ইহার ব্যবস্থা করুন।" ভিক্টোরিয়া যেরূপ ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ মন্ত্রী মেল্‌বোরণের চক্ষে জল আসিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই রাজকুমার এডওয়ার্ডের ঋণ শোধ হইয়া গেল। কিন্তু পিতৃভক্তিপরায়ণা ভিক্টোরিয়া কেবল পিতার ঋণ শোধ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। যেসকল লোক এই ঋণের জন্য তাঁহার পিতাকে কখনও উত্যক্ত করে নাই, তাহাদিগের সেই সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ, তিনি তাহাদিগকে একটি একটি বহুমূল্য উপহারও প্রেরণ করিলেন।

আপনার জননীর প্রতিও ভিক্টোরিয়া সর্ব্বদাই ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। রাজকার্য্যে জননীর কোনও হাত ছিল না সত্য; হাত না থাকা সকলেরই পক্ষে মঙ্গল ছিল, ইহাও ঠিক; কিন্তু অপরাপর সকল বিষয়ে ভিক্টোরিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াও, মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতেন। পিতামাতার প্রতি ব্যবহারে ভিক্টোরিয়া পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজরাজড়ার পরিণয়ে প্রেমের সম্পর্ক সর্ব্বদা থাকে না। কিন্তু ভিক্টোরিয়া আপনার ঈপ্সিত পাত্র লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবাবধিই মাতুল-পুত্র অ্যালবার্টের প্রতি তাঁহার প্রাণের গভীর টান ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই শৈশব প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠে। অবশেষে ভিক্টোরিয়া ইঁহাকেই পতিত্বে বরণ করেন।

রাজকুমার অ্যালবার্ট অতি সুপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে যে, য়ুরোপীয় ভদ্র সমাজে সে সময়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুরুষ আর কেহ ছিল না। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি গুণ। তিনি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; এবং সাধুতাও তাঁহার দেহশ্রীর ও বিদ্যাবুদ্ধির অনুরূপ ছিল। এমন অসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন পুরুষ-রত্ন সহজেই যে গুণগ্রাহিণী ভিক্টোরিয়ার চিত্ত আকর্ষণ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? সচরাচর বরকেই কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিতে হয়। কিন্তু ভিক্টোরিয়া রাণী, তাঁহার পক্ষে এ নিয়ম খাটিল না। অতএব তাঁহাকেই অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, প্রিয়তমের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়। অন্যথা রাজধর্ম্ম রক্ষা পাইত না। সেই

দিন ভিক্টোরিয়া আপনার অন্যতম মাতুল রাজা লিও-পোল্ডকে লিখিলেন:—"আমি সব ঠিক করিয়াছি, এবং সে কথা আজ অ্যালবার্টকেও বলিয়াছি। এই কথা শুনিয়া তিনি যে গভীর ভালবাসা জানাইলেন, তাহাতে আমার প্রাণে অতুল আনন্দ হইয়াছে। রূপে গুণে তাঁহার তুল্য পুরুষ এ জগতে দ্বিতীয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমার মনে হয়, আজ হইতে আমার সম্মুখে অশেষ সুখের ভাণ্ডার খুলিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে যে কত ভালবাসি, তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। আমি জানি, আমাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়া তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করিলেন। যাহাতে তাঁহাকে সুখী করিতে পারি, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।"

ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী ছিলেন। সুতরাং ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিলে অ্যালবার্টকে তাঁহারই প্রজা হইতে হইবে সত্য, কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধে যাহাতে তিনি অপর স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বামীর অনুগতা হন, প্রথমাবধিই ভিক্টোরিয়ার অন্তরে এইরূপ গভীর আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। এইজন্য তিনি বিবাহের প্রতিজ্ঞায়, সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, আজীবন স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা করেন। এইজন্যই গার্হস্থ্য জীবনে তিনি সর্ব্বদা স্বামীর অনুগামিনী হইয়া চলিতেন। রাজসিংহাসন ত দূরের কথা, সামান্য গৃহস্থদিগের মধ্যেও এমন পতি-আনুগত্য অল্পই দেখা গিয়া থাকে।

বৈধব্যেও ভিক্টোরিয়া আদর্শ জীবনের ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন। চল্লিশ বৎসর কাল তিনি এই বৈধব্য যাতনা ভোগ করেন। সময়ে শোকের তীব্রতা হ্রাস হইল বটে; কিন্তু তাঁহার পতির প্রতি অনুরাগ, পতির স্মৃতির প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা, বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। প্রতি বৎসর স্বামীর মৃত্যু দিনে তিনি একান্তে, স্বামীর সমাধি পার্শ্বে বহুক্ষণ কাটাইতেন। মরণান্তে, সেই সমাধিগর্ভেই আপনার মৃত দেহ রক্ষণ করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন।

যেমন আদর্শ কন্যা, যেমন আদর্শ পত্নী, ভিক্টোরিয়া তেমনি আদর্শ জননী ছিলেন। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাঁহার অনেক পুত্র কন্যা জন্মিয়াছিল। ইঁহাদের প্রত্যেকের শিক্ষা বিধানে তিনি অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি তাঁহার সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

কেবল রাণী বলিয়া যে আমরা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়াছি, তাহা নহে। রাণী বলিয়া আমরা তাঁহার আদেশ মান্য করিতাম। কিন্তু রমণীর মণি বলিয়া, আদর্শ দুহিতা, আদর্শ পত্নী, আদর্শ বিধবা, আদর্শ মাতা বলিয়া, আমরা তাঁহাকে পূজা করিয়াছি। রমণী চরিতের মাধুরী তাঁহাতে আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়াছিল বলিয়াই আজ সমুদয় সভ্য জগৎ তাঁহার পবিত্র স্মৃতিকে ভক্তিভরে হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। বিধাতার মাতৃভাব তাঁহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমরা সকলে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিতেছি।

মা-পা-দা।

ব্রহ্মদেশে নিম্নলিখিত গল্পটি একটি গানের আকারে প্রচলিত আছে।

বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় থাবস্তী (শ্রাবস্তী) নগরে একজন ধনী বণিক বাস করিতেন। তাঁহার অনেক (ক্রীত) দাস দাসী ছিল। দাসদাসী হইলেও তাহারা তাৎকালিক প্রথা অনুসারে পরিবারের অঙ্গীভূত বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে তাহাদের প্রভু বিক্রয় করিতে পারিতেন না। তাহাদের জন্যও আইন ছিল।

বণিক একদিন বাজারে একজন নূতন দাস ক্রয় করিলেন। দাস যুবা পুরুষ; সুন্দর ও শিষ্টাচারী। বণিক তাহাকে বাড়ী লইয়া গিয়া অন্য দাস দাসীদের সহিত রাখিলেন। দাস যত্ন পূর্ব্বক নিজ কার্য্য করিত। সুতরাং সে শীঘ্রই বণিক এবং অপর দাস দাসীগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বণিকের কন্যা "মা-পা-দা" যুবকের প্রেমে পড়িল। যুবক বড়ই বিপন্ন হইল। সে মা-পা-দার নিকট যাইত না, বরং তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা

করিত। কিন্তু সে দাস; বণিক-কন্যার আদেশও অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। মা-পা-দা তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে বলিত, "আমরা পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ। এস আমরা এখান হইতে পলাইয়া গিয়া বিবাহ করি।" প্রথম প্রথম প্রভু-ভক্তি বশতঃ যুবক তাহার কথায় কাণ দিত না। কিন্তু শেষে প্রেম জয়লাভ করিল। তাহারা একদিন রাত্রে পলায়ন করিল, বণিককন্যা সঙ্গে নিজের অলঙ্কার ও কিছু টাকা লইল। তাহারা ভয়ে ভয়ে অতি দ্রুত বহুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এক সহরে আসিয়া পৌছিল। উহা থাধন্তী হইতে এত দূরে যে, তাহারা মনে করিল--বণিক কখনই সেখানে তাহাদিগের খোঁজ করিবেন না।

এখানে প্রেমিক দম্পতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। মা-পা-দা সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিল, তাহা ব্যবসায়ে খাটাইয়া তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে তাহাদের একটি সন্তান হইল। সন্তান জন্মিবার দুই তিন বৎসর পরে স্বামীর দূর দেশে যাইবার প্রয়োজন হইল। সে পত্নী ও সন্তানকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহাদের গন্তব্য স্থান অতি দূরে অবস্থিত ছিল। তথায় যাইতে হইলে এক অরণ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। সেই অরণ্যের মধ্যে মা-পা-দা পীড়িত হইয়া পড়িল। সুতরাং তাহার স্বামী বনের মাঝে গাছের ডাল ও পাতা দিয়া একটি কুঁড়ে ঘর তৈয়ার করিল। সেই নির্জ্জন অরণ্যে বাস কালে তাহাদের আর একটি পুত্র জন্মিল।

মা-পা-দা শীঘ্রই বল পাইয়া সারিয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যার সময় স্থির হইল যে, প্রভাতে তাহারা অরণ্য হইতে যাত্রা করিবে। রাত্রে বড় শীত, মা-পা-দার স্বামী যেমন প্রত্যহ কাঠ কাটিয়া আনিতে যাইত, আজও সন্ধ্যার সময় তেমনি গেল। মা-পা-দা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া সারা হইল, কিন্তু যুবক ফিরিল না। অরণ্যের অন্ধকার গভীরতর হইয়া আসিল। অরণ্য নানা প্রকার অব্যক্ত, লোকালয়ে অশ্রুত ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। কিন্তু যুবক আসিল না। মা-পা-দা সারা রাত্রি জাগিয়া ছেলে দুটিকে আগুলিয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে কুটীরে একাকী রাখিয়া স্বামীর অন্বেষণে যাইতে তাহার সাহস হইল না। রাত্রি যেন যায় না। কিন্তু শেষে উষার আলোক প্রথমে আকাশে, পরে বৃক্ষ চূড়ে, পরে বৃক্ষ শাখায় এবং তথা হইতে ভূমিতে আসিয়া দেখা দিল। মা-পা-দা তখন শিশু পুত্রটিকে কোলে লইয়া বড়টির হাত

ধরিয়া স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইল। শীঘ্রই স্বামীর সাক্ষাৎকার লাভ করিল; কিন্তু, হায়, তথায় কেবল পতির দেহ মাত্র তৎসংগৃহীত কাষ্ঠখণ্ডগুলির পার্শ্বে পড়িয়াছিল। সর্পাঘাতে তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল!

মা-পা-দা মহারণ্যে এখন একাকিনী। একে অল্প বয়স, তাহাতে আবার দুটি শিশুর প্রাণ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এই ঘোর বিপদেও সে বুদ্ধিহারা হইল না। সাহসে ভর করিয়া সে কোন গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে সঙ্কল্প করিল; এবং পূর্ব্ববৎ শিশুটিকে কোলে লইয়া বড় ছেলেটির হাত ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। যাইতে যাইতে একটি নদীর তীরে আসিয়া পৌছিল। নদীটি গভীর ছিল না। কিন্তু যে জল ছিল, তাহাতে বড় ছেলেটি হাঁটিয়া পার হইতে পারিত না। দুটি শিশুকে এক সঙ্গে কাঁধে বা কোলে লইয়া তাহার নদী পার হইবার মত সামর্থ্যও ছিল না। সুতরাং কতক্ষণ চিন্তা করিয়া সে বড় ছেলেটিকে বলিল, "বাবা, তুমি এখানে বস; আমি খোকাকে ওপারে রেখে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। দেখ' বাবা, আমি যে পর্য্যন্ত না ফিরে আসি লক্ষীটি হ'য়ে ব'সে থেকো"। বালক রাজি হইল।

মা-পা-দা নদীটিকে যেরূপ অগভীর ও মন্দগতি ভাবিয়াছিল, বাস্তবিক উহা তদ্রূপ ছিল না। যাহাই হউক, খুব সাবধানে সে পরপারে উত্তীর্ণ হইল, এবং নদীর তট হইতে কিয়দ্দূরে একটি গাছের ছায়ায় শিশুটিকে শুয়াইল। তাহার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার নদী পার হইতে আরম্ভ করিল।

মাঝ নদীতে আসিয়াছে, এবং তাহার বড় ছেলেটিও কিনারায় আসিয়াছে, এমন সময়, যে পারে শিশুটিকে রাখিয়া আসিয়াছিল, তথা হইতে একটা ঝট্‌পট্ শব্দ ও ক্রন্দন ধ্বনি মার কাণে পৌছিল। মা দেখিল, একটা প্রকাণ্ড বাজ পক্ষী ছোঁ মারিয়া শিশুটি তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। মা তাহার দিকে ফিরিয়া হাত নাড়িয়া, চীৎকার করিয়া পাখীটাকে ভয় দেখাইতে ও তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পাখীটা গ্রাহ্য না করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতে উঠিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মা তখন বড় ছেলেটি যেপারে ছিল, সেই দিকে যাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু, হায়, তাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে মায়ের হাতনাড়া দেখিয়া ও চীৎকার শুনিয়া মনে করিয়াছিল, মা বুঝি তাহাকে ডাকিতেছেন। তাই সে নির্ভয়ে জলে নামিয়াছিল; কিন্তু নির্ম্মম নদী স্রোত খল খল শব্দে ক্রূর
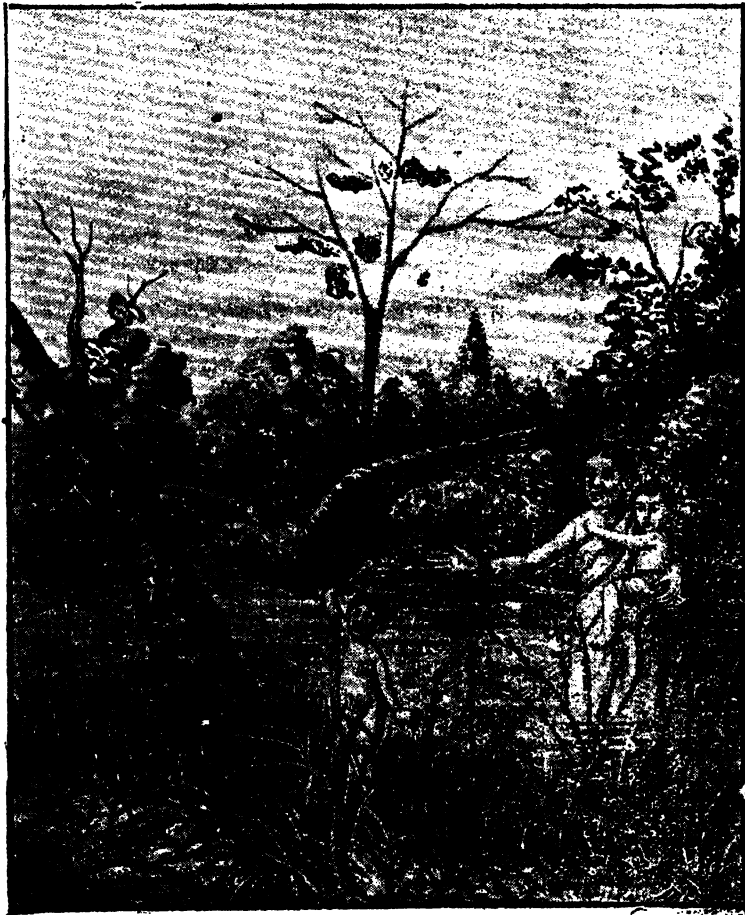
হাসি হাসিয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া ডুবাইয়া দিয়াছিল! এখন তাহার কোমল দেহ সাগরের দিকে বাহিত হইয়া চলিতেছে।

মায়ের গভীর নৈরাশ্যের বর্ণনা কে করিতে পারে?

কিন্তু কাল যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি আবার তাহার কর-স্পর্শে শোক যাতনাও মন্দীভূত হইয়া আসে।

মা-পা-দা আপন মনে বলিল, "এখন আমি থাবন্তীতে বাবার কাছে ফিরে যাব। এখন তিনি ভিন্ন আর আমার আপনার বল্‌তে কেহই নাই। আমি তাঁহাকে এই এতদিন ছেড়ে এসেছি বটে; কিন্তু এখন আমি পতিপুত্র সব হারিয়েছি; এখন তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ঘরে যায়গা দিবেন। এখন নিশ্চয়ই তিনি আমার উপর কৃপা কোর্‌বেন; কারণ আমি বড়ই কৃপার পাত্রী।"

বণিক্-কন্যা আবার চলিতে আরম্ভ করিল, এবং বহুদিন পরে থাবন্তীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল।

সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়াই সে একদল লোকের সম্মুখে পড়িল। তাহারা সকলে শ্মশানভূমি হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; সকলের মুখে বিষাদের চিহ্ন। মা-পা-দা জিজ্ঞাসা করিল:—"হ্যাঁ গা, কে মরেছে যে, তোমরা এত লোক এত আড়ম্বর কোরে শ্মশানে গিয়েছিলে?"

উত্তর শুনিয়া বণিকের কন্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কারণ তাহারই মা বাপ মারা গিয়াছেন। আজ সে প্রকৃতই জগতে একাকিনী; জনক জননী, পতি পুত্র, সকলেই পরলোকগত।

এত শোক তাহার কোমল প্রাণে সহিল না। তাহার বুদ্ধির লোপ হইল। সে পাগলিনীর বেশে বিবসনা হইয়া আলুলায়িত সুদীর্ঘ কেশপাশে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আপন মনে বকিতে বকিতে নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সে, যেখানে বুদ্ধদেব এক বটবৃক্ষতলে সমবেত জনগণকে উপদেশ দিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল। তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে নিজের মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিল; এবং বলিল, "প্রভু, তুমি আমার পিতামাতা পতি ও পুত্রদ্বয়কে বাঁচাইয়া দাও"।

বুদ্ধদেবের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন:—

"বাছা, মরে না কে? মৃত্যু কাহাকেও ভুলে না। রাজা, প্রজা, মনুষ্য, ইতর প্রাণী, সকলেরই নিকট মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক বার জন্মিয়া অনেকবার মরিয়া তবে আমরা পরা শান্তি লাভ করিতে পারি। বাছা, শান্ত হও, গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া মঠে আসিয়া ভিক্ষুণী হও! সকলেই তোমার মত শোকে তপ্ত হয়। আমাদের পার্থিব জীবনের সহিত শোক অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।"

কিন্তু মা-পা-দা সান্ত্বনা মানিল না। পুনঃপুনঃ বুদ্ধদেবের নিকট স্বজনগণের জীবনভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন তিনি দেখিলেন যে, তাহাকে প্রবোধ দেওয়া নিষ্ফল; সে শোকে বধির হইয়াছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোক থাকিয়াও নাই। কাজেই তিনি বলিলেন:—

"বাছা তুমি যদি এক মুঠা সরিষা আনিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার স্বজনগণকে বাঁচাইয়া দিতে পারি। কিন্তু একটি কাজ করিও; যাহার বাড়ীর কাছে মৃত্যু কখনও আসে নাই, এরূপ লোকের ক্ষেতে হইতে এই সরিষা আনিয়ো।"

বণিককন্যার হৃদয়ভার কিছু লঘু হইল, সে ভাবিল এত খুব সোজা;—এক মুঠা সরিষা বই ত নয়, আর সরিষা কার ক্ষেতে না হয়? সে আবার কাপড় পরিল; আবার চুল বাঁধিল। প্রথম বাড়ীতে গিয়া বলিল, "আমায় একমুঠা সরিষা দাও।" গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ সরিষা দিল।

সাতরাজার ধন মাণিকের মত যত্ন করিয়া সরিষা গুলি লইয়া মা-পা-দা প্রফুল্লচিত্তে বুদ্ধদেবের নিকট যাইবে, এমন সময় তাঁহার শেষ কথা গুলি মনে পড়িল। তাই আবার ফিরিয়া উদ্বিগ্ন নেত্রে গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিল:—"তোমাদের বাড়ীতে কেও কখন মরেছে কি?" গৃহস্থ কহিল, "আজি অল্পদিন হইল, আমাদের বাড়ীতে মৃত্যুর করাল, ছায়া পড়িয়াছে।" গৃহস্থ ভাবিল, "এমন প্রশ্ন করে, কে এ মেয়ে?" নারী চলিয়া গেল। সরিষা অলক্ষিতে

তাহার শিথিলমুষ্টি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। এইরূপে মা-পা-দা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল; সর্ব্বত্র একই প্রশ্ন এবং একই উত্তর! মৃত্যু সকল পরিবার হইতে নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়াছে। পিতা বা মাতা, পুত্র বা ভ্রাতা দুহিতা বা জায়া, সর্ব্বত্রই কাহারও না কাহারও স্থান শূন্য হইয়াছে। এইরূপে নগরের সর্ব্বত্র গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে আশার যে নূতন আলো জ্বলিয়াছিল, তাহা নিবিয়া গেল; এবং মা-পা-দা বুদ্ধদেবের কথায় যাহা বিশ্বাস করে নাই, সংসারের নিকট তাহাই শিক্ষা করিল; মৃত্যু ও জীবন অভিন্ন!

মা-পা-দা ভিক্ষুণীর পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিল * !

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

শূন্য গৃহ।

জন-শূন্য অরণ্যের মাঝে,
কেন, হায়, এত কাল ধ'রে,
একা ওই গৃহ পড়ে আছে!
কেহ নাই উহার ভিতরে।

রহিয়াছে আজো ওই দ্বারে,
যতনের আবদ্ধ শৃঙ্খল!
জীর্ণ তনু মরিচায় ঘেরে,
যা'র গৃহ সে নাহি কেবল!

মুক্ত নাহি কোন বাতায়ন,
গৃহে আলো নারে প্রবেশিতে,
বায়ু খালি মানে না বারণ,
যায় কোন সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে।

নাহি কিছু উহার ভিতরে,
আছে শুধু অনন্ত আঁধার!
কেহ নাহি যতনে, আদরে
হুহু করে বায়ু চারিধারে।

সিত পক্ষে আসিয়ে জোছনা,
পড়ে থাকে দ্বারে প্রতীক্ষায়;
নাহি দেখে তারে কোন জনা;
নিরাশে আপনি ফিরে যায়।

ঘোরতর অমার আঁধারে
ছেয়ে ফেলে দিগন্ত যখন;
সে গৃহের কি করিবে আর—
সে যে চির আঁধারে মগন!

শুধু ঝাউ তরু দ্বার পাশে,
পূর্ব্ব স্মৃতি যত্নে ধ'রে বুকে,
বায়ু সনে ফেলি দীর্ঘশ্বাসে,
অঙ্গ-গ্রন্থি চূর্ণ করে দুখে।

কভু সেই পথ দিয়ে যেতে,
শ্রান্ত হয়ে বিহঙ্গম কোন,
বসি সেথা করুণ সঙ্গীতে,
বিষাদিত করে সেই বন।

আহা, ওই গৃহের প্রাঙ্গনে
কত শিশু, খেলি ফুল্ল মনে,
হাসি মুখে, অমিয় বচনে,
কত সুধা ঢালি দিত প্রাণে!

বুঝি কবে, ওই বাতায়নে,
শূন্য প্রাণে, কোন অভাগিনী,
নীরবে বসিয়া অশ্রু সনে,
কাটায়েছে সুদীর্ঘ যামিনী!

ওই সৌধ চূড়ে, বুঝি আগে,
হেরিবারে শোভা প্রকৃতির,

---

* এই গল্পটী The Soul of a People নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।—লেখক।

তরুণ দম্পতি, অনুরাগে,
ভ্রমিয়াছে আনন্দে অধীর।

রোপেছিল কত আশা-লতা,
তারা ওই ক্ষুদ্র গৃহ প'রে,
সমূলে করিয়া উৎপাটিতা,
ঝটিকায় ফেলিয়াছে দূরে!

ছিল আগে কত স্নেহ মায়া,
ওই গৃহ সনে বিজড়িত,
আজ শুধু বিষাদের ছায়া,
নৈরাশ্যের আঁধারে বেষ্টিত!

কোথা আজ সেই আশা, সুখ,
কোথা গেল সেই খেলা, হাসি।
কোথা সব স্নেহ মাখা মুখ,
কাল স্রোতে সব গেছে ভাসি।

শ্রীমতী মরকত দেবী।

পাহাড়ী মেয়ে।

গত মে মাসে দার্জিলিংএ বাসকালে হিমালয়ের গম্ভীর ও মহিমাময় সৌন্দর্য্য দর্শনে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সেখানকার সবল ও সতেজ পাহাড়ী রমণীদিগকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে ইউরোপে সুইস ও ওয়েল্‌স দেশীয় স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যে দেশে সমতল ও পার্ব্বত্য প্রদেশ সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতির অবাধ স্বাধীনতা আছে, সেখানে উহাদের মধ্যে কিছু অধিক বিশেষত্ব দেখা যায় না, কেবল নিম্ন ভূমির অপেক্ষা উচ্চ ভূমির স্ত্রীলোকেরা অধিক কষ্টসহ ও কর্ম্মক্ষম হয়। কিন্তু আমাদের এই বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পাহাড়ী মেয়েদের তুলনা করিলে যেন 'আকাশ পাতাল' প্রভেদ দেখিতে পাই। চোখের পুরাণ আবরণ খুলিয়া গিয়া সব যেন এক নূতন ধরণে গঠিত বোধ হয়। মনে ভাবি, আমাদের কি বিড়ম্বনা, যখন নিজের দেশেই, (কলিকাতা হইতে কেবল চব্বিশ ঘণ্টা রেল পথের মধ্যে) স্ত্রীস্বাধীনতার এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তখন কি না স্বদেশীয় ভ্রাতাদের সম্মুখে আদর্শ ধরিয়া তাদের ভ্রম ঘুচাইবার জন্য আমরা ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরিয়া বেড়াই!

অনেকেই জানেন, দার্জিলিংএ তিনরকম লোকের বাস—নেপালী, ভুটিয়া ও লেপ্‌চা। নেপালীরা দেখিতে অধিকতর সুশ্রী ও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত; ইহারা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। সেজন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের সঙ্গে ইহাদের আচারব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য আছে। ভুটিয়া ও লেপ্‌চারাই যথার্থ পাহাড়ী—এই উভয় জাতিই দেখিতে প্রায় একরকম। রং ফর্শা, মাথায় খাট, লম্বায় ৪॥ কি ৫ ফুটের বেশী নয়, মুখ গোল, নাক চেপ্টা, চোক ছোট, নারাঙ্গা উঁচু; কেবল লেপ্‌চাদের রং কিছু বেশী সুন্দর। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই প্রায় তুল্য সবল ও দৃঢ়কায়। পুরুষেরা কামিজ, জামা, কোট পাজামা, টুপি, গলাবন্ধ কোমরবন্ধ ও কখন কখন খুব মোটা বুট পরে। স্ত্রীলোকদের পোষাকও অতি ভদ্র ও সভ্য। তাহারা খুব মোটা সাড়ী বা সাড়ীর সঙ্গে বডি ও জামা পরে। তাহার উপর এক গরম শাল বা র‍্যাপার গায়ে দেয়। পাহাড়ী মেয়েরা মাথায় টুপি বা ঘোমটা দেয় না, চুলের বিণনী করিয়া পিঠে ঝুলাইয়া রাখে।

একদিন আমার একটী বন্ধুকন্যা জিজ্ঞাসা করে—পাহাড়ী মেয়েদের আপনার কি রকম বোধ হয়? ইহারা খুব jolly না? বাস্তবিক এরূপ সরল, প্রফুল্ল ও আনন্দময় মুখ আমরা সমতল ভূমিতে অতি অল্পই দেখিতে পাই। সর্ব্বদা খোলা বাতাসে কঠিন পরিশ্রম করায় ইহাদের শরীর যেমন সবল ও শক্ত হইয়াছে, নিজেরা জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হওয়ায় মনও সেইরূপ সতেজ ও স্বতন্ত্র হইয়াছে। অর্থের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলেও ইহাদিগকে সর্ব্বদাই সুখী ও আনন্দিত দেখা যায়। কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই ইহারা রাস্তায় বসিয়াই তাস ও ঘুঁটি খেলে, গান গায় ও সিগারেট খায়। পাহাড়ী মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করে—এক এক জন প্রায় আধমণ পাথর পিঠে বাঁধিয়া প্রত্যহ

উচু পাহাড়ের উপর বহিয়া লইয়া যায়। প্রাতঃকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐরূপ পাথর বহা, পাথর ভাঙ্গা ও রাস্তা মেরামতের কাজ করে। অনেকে শিশুসন্তানকে পিঠে বাঁধিয়াই খাটিতে থাকে।

যে কোন কাজেই হো'ক না, সমভাবে অভ্যস্থ হ'লে স্ত্রীলোক ও পুরুষ ঠিক এক প্রকার কাজ করিতে পারে। এই পাহাড়ী স্ত্রীলোকদেরকে দেখিয়া আমাদের সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। ঈশ্বর নারীজাতিকে কঠিন কর্ম্মে অক্ষম করিয়া সৃজন করিয়াছেন। এই ধারণায় নির্ভর করিয়া যাঁহারা স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা ও কার্যক্ষেত্রে সমান অধিকার দিতে অস্বীকৃত, আশা করি এ দৃশ্যের দ্বারাও তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইবে।

স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা সর্ব্বত্রই এক সঙ্গে প্রায় এক কাজ করে, সুতরাং পুরুষেরা নারীদিগকে মান্য করিয়া চলে। একদিকে যেমন আপনাদিগকে দুর্ব্বল ভাবিয়া মনে ভয় ও সঙ্কোচ নাই, অন্যদিকে সেইরূপ স্ত্রীজাতিকে অক্ষম বলিয়া হেয় জ্ঞান নাই। উভয়েই একত্র খাটিবে; এক সঙ্গে উপার্জ্জন করিবে ও জীবিকানির্ব্বাহে পরস্পরের সাহায্য করিবে—এই ভাব তাহাঁদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীপুরুষদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারও অতি ভদ্র ও নির্দোষ। দেখিতাম, অনেক যুবকযুবতী ও বালক বালিকারা বিশ্রাম কালে পাহাড়ের উপর বা রাস্তার ধারে বসিয়া প্রত্যহই গানবাজনা ও ক্রীড়া আমোদ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনরূপ দূষ্যভাব বা অশ্লীল আচরণ দেখা যায় না।

পাহাড়ী নারীরা এত পরিশ্রমী যে, তাহাদিগকে আমি কখন অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। অনেকে বলিবেন, শীতের জন্য তাহারা নড়িতে বাধ্য, কিন্তু শুধু তাহা নয়। কাজ তাহাদের জীবনের সঙ্গী—না খাটিলে আহার পাইবে না। এই জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা তাহাদিগকে এতদূর কর্ম্মিষ্ঠ করিয়াছে যে, উহা তাহাদের জাতীয় স্বভাব-স্বরূপ হইয়াছে। পাঠকেরা নজর করিয়া থাকিবেন, যেখানকার লোকেরা স্বাভাবিক অলস, সেখানে শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই মানুষেরা সমান ভাবে আলস্যের আশ্রয় লয়। এই শীতকালের সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের বাঙ্গালী গ্রামবাসীদের ঘরে বা উঠানে এক একটি প্রকাণ্ড অগ্নি-কুণ্ড, আর তার চারি ধারে বসিয়া সকলের আগুণ পোহানর দৃশ্যটি কোন পাঠকেরই অগোচর নাই। পাহাড়ীরা সেরূপ নিশ্চল ভাবে আগুণ বা রৌদ্রের সাহায্যে শীত তাড়ানর পরিবর্ত্তে খাটিয়া উহাকে পরাজয় করে। পাহাড়ের পথে উপর নীচে, চড়াই উৎরাই করাই ত এক মহা পরিশ্রম; তার উপর পিঠে পাথরের বোঝা বা কাঠের মোট লইয়া উঠা নামা করা যে কত দূর কষ্টকর ও আয়াসসাধ্য, তাহা যিনি একবার পর্ব্বত দর্শন করিয়াছেন, তিনিই উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন।

ভুটিয়া ও লেপচাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই।

যুবতীরা ১৫।১৬, আর যুবকেরা ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে প্রায় বিবাহ করে না। শুনিয়াছিলাম, উহাদের বিবাহ বন্ধন কিছু শিথিল। এ বিষয়ে আমি ঠিক কথা জানিবার জন্য একটি কুলিমেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিল—না, তা নয়; যাহাদের স্ত্রীপুরুষে মিল না হয়, তারাই পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া দু'জনের স্বেচ্ছামত আবার বিবাহ করে। কিন্তু যেখানে দু'জনে যথার্থ ভালবাসা থাকে,

ও ছেলেপিলে হয়, সে স্থলে স্ত্রীপুরুষে কখন পৃথক হয় না। এ নিয়ম অন্যান্য সভ্য জাতিদের আইন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। যে দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, সেই খানেই স্ত্রীত্যাগের ন্যায় স্বামিত্যাগের প্রথাও আছে। অবশ্য আমাদের হিন্দুর চোখে ঐরূপ আইন বড় উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সব দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই নিয়ম সমাজের উভয় জাতির পক্ষেই সমান হিতকারী। বিবাহের উদ্দেশ্যেই মিলন। দুটি ভিন্ন জীব মিলিয়া মনে প্রাণে, কাজে কর্ম্মে, সুখে দুঃখে ঠিক একটি প্রাণীর ন্যায় চলিবে। যেখানে এরূপ মিলন হয় না, যে দম্পতী পরস্পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নয়, সেখানে সমস্ত জীবন বিবাদ কলহ, অসুখ অশান্তির মধ্যে কাটানর অপেক্ষা স্ত্রীপুরুষে আলাদা হওয়াই শ্রেয়। সকলেই জানেন, 'ধরে বেঁধে প্রেম, আর মেজে ঘসে রূপ' মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

অন্যান্য জাতিদের ন্যায় পাহাড়ীদের মধ্যেও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক ধর্ম্মপ্রবণ। তাহাদের প্রতি পর্ব্বের দিনই দেখিতাম, সারি সারি স্ত্রীলোকদের দল নানা রকম পূজোপকরণ লইয়া 'অবজারভেটরি' (Observatory Hill) হিলের উপর পূজা দিতে যাইতেছে। ঐ উঁচু পর্ব্বতের উপর তাহাদের দেবতার একটি ছোট গম্বুজ আকারের মন্দির আছে। সেইখানে তাহারা ঘি, ধূপ্ ও চায়ের পাতা পোড়াইয়া পূজা করে। আর, নানা রঙ্গের নূতন কাপড়ের বা কাগজের টুক্‌রাতে মন্ত্র লিখিয়া খুব লম্বা লম্বা পাহাড়ী তল্‌তা বাঁশের উপর ঝুলাইয়া দেয়। তাহাদের বাসস্থানের চারিদিকেও ঐরূপ কাপড়ের টুক্‌রা বাঁশের উপর বা গাছের গায়ে ঝুলিতে দেখা যায়। উহাদের বিশ্বাস, ঐ সব মন্ত্রের ভয়ে ভূত প্রেত উপ-দেবতারা পলাইয়া যায়। তাহাদের ঠাকুরের পূজার জন্য একজন লামা বা পুরোহিত আছেন; তিনি বিশেষ পর্ব্বের দিনে আসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা ও আরতি করেন। অন্যান্য সময়ে স্ত্রীলোকেরা নিজেই মন্ত্র পড়িয়া ঠাকুরের পূজা দেয় ও দেবতার কাছে মানস জানায়। পাহাড়ীরা নামে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু সকল অজ্ঞ লোকদের ন্যায় তাহারাও সাকারবাদী, আর তাহাদের অশিক্ষিত অন্তর নানারূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। উহাদের বিশ্বাস, প্রতি পাহাড়ের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। একদিন অর্চ্চনাকালে একটি বৃদ্ধাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা কাহার পূজা করিতেছ? সে উত্তর করিল—খোদার, আমরা আগে নিজের মুলুকের খোদাকে পূজা দি, তারপর এই পাহাড়ের দেবতার পূজা করি, নহিলে আমাদের নিজ দেশের ঠাকুর রাগ করেন। এই বাক্য হইতেই পাঠকেরা তাহাদের ঈশ্বর-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

দুঃখের বিষয়, পাহাড়ী ভাষা না জানাতে উহাদের সঙ্গে গার্হস্থ্য আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আলাপ করিতে পারি নাই। অনেকে বিদেশীদের অধীনে কাজ করাতে কিছু হিন্দুস্থানী শিখিয়াছে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা এখনও উত্তমরূপে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা কহে, তাহা পালী, হিন্দী ও দেশজ পাহাড়ী শব্দ লইয়া গঠিত। এই কারণে তাহা আমাদের কাণে বড় জটিল বলিয়া বোধ হয়।

দার্জিলিংএ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা স্থাপিত একটি বড় ভুটিয়া স্কুল আছে। সেখানে অপেক্ষাকৃত ভদ্র বালকেরা পাহাড়ী ও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ের জন্য মিসনরিদের দুই তিনটি শিক্ষালয় আছে। সেখানে তাহারা লেখাপড়ার সঙ্গে সেলাই ও পশমের শিল্পকার্য্য শিখে। মিসনরি রমণীদের অনুগ্রহেই পাহাড়ী মেয়েরা অনেকে নানা রকম আবশ্যক পশমের দ্রব্য বুনিতে শিখিয়াছে। প্রত্যহই দেখিতাম, মেয়েরা অবকাশ পাইলেই রাস্তায় বসিয়াই গলাবন্ধ বুনিতেছে বা জামা সেলাই করিতেছে। দার্জিলিং ইংরাজের নির্ম্মিত, আর এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই ইংরাজ। সেজন্য পাহাড়ীদের মধ্যেও দুচারিটি ভালমন্দ ইউরোপীয় প্রথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রতি রবিবারে শ্রমজীবীরা পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম লয়, আর ধোয়া ও সুন্দর পোষাক পরিয়া আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। আবার বিলাতের ন্যায় শনি রবিবারেও এখানকার মজুরদের মধ্যে অধিক মদ্যপান ও জুয়াখেলা প্রভৃতি কুরীতিও প্রবেশ করিয়াছে, দেখা যায়।

যে দেশে স্ত্রীলোকেরা নিজে খাটিয়া সংসার চালাইতে সমর্থ, সেখানে তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পুরুষের বশ্যতাস্বীকার অসম্ভব। সুতরাং পাহাড়ী মেয়েরাও অতিশয় স্বতন্ত্রা ও স্বাবলম্বনপ্রিয়া। স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতা-বশতঃ উহাদের চেহারায় ও চালচলনে যে তেজ প্রকাশ পায়, তাহাতে পুরুষেরা কখন স্ত্রীলোকদের প্রতি প্রভুর ন্যায় আচরণ করিতে সাহস করে না। তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম থাকে, ততদিন সমানভাবে পুরুষদের সঙ্গে বাহিরের কাজ করে। পাহাড় ভাঙ্গা, পাথর তোলা, মোট বহা, রাস্তা খুঁড়া, জল টানা প্রভৃতি সব রকম কঠিন কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা নিযুক্ত থাকে। যখন তাহারা ভারী কাজে অপারগ হয়, তখন গৃহের কাজকর্ম্ম করে, আর যে সব সমর্থ স্ত্রীরা কাজে যায়, তাহাদের সন্তান রক্ষণ করে।

শুনিয়াছি, দার্জিলিং যখন সিকিম রাজ্যের অধীন ছিল, তখন পাহাড়ীরা বেশি সরল, সত্যবাদী ও মিতব্যয়ী ছিল। এখন নানা জাতির সংস্রবে আসাতে ও মজুরী করিয়া অনেক অর্থলাভ হওয়াতে উহারা অধিকতর কপটাচার, লোভী ও অমিতব্যয়ী হইয়াছে। পয়সার জন্য ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা বলে। উহাদের আয় যথেষ্ট, কাজ অনুসারে রোজ ।৵০ ছয় আনা হইতে ১৲ এক টাকা পর্য্যন্ত। ৯।১০ বৎসরের বালকবালিকারাও ।০ আনা করিয়া মজুরী পায়। তথাপি উহারা ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। প্রত্যহ বার্ডসাই ও পান চুরটেই কত পয়সা নষ্ট করে। দশ বার বৎসরের ছেলে মেয়েরাও এই কুঅভ্যাস শিখিয়া থাকে। তাহার উপর, মাহিনা হাতে পাইলেই শরীর শোভনের জন্য পুতি ও কাঁচের মালা, চুড়ি, শাঁখা ও ইয়ারিং প্রভৃতিতে মেয়েরা যে কত অর্থব্যয় করে, তাহা উহাদের গহনা দেখিলেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ, ঐ সামান্য সাজগুলিও সেখানে অতি মহার্ঘ। যে পুতির দাম এদেশে চারি পয়সা কি ছয় পয়সা, তাহা আমি পাহাড়ী মেয়েদিগকে ।৵০ ছয় আনায় কিনিতে দেখিয়াছি।

অন্যান্য শীতপ্রধান দেশের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও পানদোষ আছে। পুরুষেরা আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক দেশীয় মদ বা ব্রাণ্ডিতে অপব্যয় করে; রমণীরাও এ দোষে বাদ

যায় না। তবে মাতাল নারীর মত জঘন্য দৃশ্য এক দিনও আমার চক্ষে পড়ে নাই। খাদ্যে পাহাড়ীদের কোন বাছবিচার নাই। গো-মাংস, শূকর মাংস, মুর্গী প্রভৃতি সবই উহারা সমান আগ্রহের সহিত উদরসাৎ করে। যাহারা অধিক দিন হিন্দুদের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারা কিছু মিত-ভোজী।

দার্জ্জিলিংএ পাহাড়ী মেয়েদের স্বাধীনতার প্রভাব এতদূর যে, আমাদের দেশীয় ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত সেখানে স্ত্রীকন্যাদিগকে বাহিরে বেড়াইতে দেন। অনেক অবরুদ্ধা হিন্দু ও ব্রাহ্মণ মহিলাদিগকে আমি তথায় রাস্তায় বিচরণ করিতে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলাম। সাধারণ স্থানে বেড়াইবার সময় একটি বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিলে আরো ভাল হয়। ভদ্র স্ত্রীকন্যাদের বাহিরে যাইবার কালে কিছু গম্ভীরভাবে সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। লাল, গোলাপী, হল্‌দে প্রভৃতি অতি উজ্জ্বল বর্ণের পোষাকের পরিবর্ত্তে কাল, ধূসর, নীল প্রভৃতি ঘোরাল রংএর কাপড় পরা উচিত। ভরসা করি, আমার এ বাক্যটি পাঠিকারা বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

কাপড়ের চিহ্ন।

বিনোদ বিহারী বসু সওদাগরি আপিষে কর্ম্ম করেন. কাজ বেশী, অনেক খাটিতে হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ৫টার পর বাড়ী আসিয়াছেন। বহির্ব্বাটীতে পা দিয়াই শুনিলেন, গৃহিণীর গলা সপ্তমে চড়িয়াছে। কাহারও উপর রাগ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন এবং তাঁহার ঝঙ্কারে বাড়ীটি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বিনোদ বাবু ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "বলি, বিধি আজ কাহার উপর বাম হইলেন। আমি জানিতাম, তোমার গালাগালি শুধু আমিই খাই। দেখিতেছি, আমারও ভাগীদার আছে।" গৃহিণী সপ্তমে চড়িয়াছিলেন। স্বামীর ঠাট্টা শুনিয়া তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। স্বামীর দিকে সুবর্ণবলয়শোভিত হাতখানি আন্দোলন করিয়া বলিলেন—"তা তুমি বুঝ্‌বে কি? যার যায়, সে বুঝে। তুমি ত বম্ ভোলানাথ। নিজে কিছু দেখ্‌বে না, তার উপর ঠাট্টা, মরণ আর কি!" বিনোদ বাবু পূর্ব্ববৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "চেঁচিয়ে যে বাড়ী মাত্ করে তুল্লে! পাড়ার লোক ছুটে না আসে। বলি হয়েছে কি?" গৃহিণী পূর্ব্ববৎ হাত নাড়িয়া, নাকের নথটী দোলাইয়া বলিলেন, "হবে আবার কি, মাথা মুণ্ডু! ধোপানী মাগী আমার ঢাকাই সাড়ী খানি বদলিয়ে দিয়েছে। আমার সাড়ী খানি কত ভাল, তার কাছে কি এ লাগে? একটা ছাই কাপড় দিয়ে আমার ভাল সাড়ী খানি রেখে দিয়েছে। ছোট লোককে বিশ্বাস কত্তে নাই। আমার সখের কাপড় খানি চুরী করে রেখে দিয়েছে। মাগীকে ঝাঁটা পেটা কল্লেও মনের দুঃখু যায় না।"

বিনোদ। বলি, ওগো থামো, থামো। দোহাই তোমার, আর চেঁচিও না। ব্যাপার ত এই? আমি মনে করে ছিলুম, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে।

গৃহিণী। হাঁ তুমিত বলবেই, সাত জন্মে এক খানি কাপড় দেবার নাম নাই, তার উপর অত কথা! অত অত ঠাট্টা!! ভাগ্যিস্ আমার বাপের বাড়ী থেকে ঢাকাই সাড়ী খানি এনেছিলুম! না দিয়েই অত কথা; দিলে না জানি আরও কত হ'ত!

গর্জ্জনের পর বর্ষণ স্বাভাবিক। গৃহিণী অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিনোদ বাবু গৃহিণীর স্বভাব জানিতেন। তিনি একটু নরম হইয়া বলিলেন, "সত্যাই আমি তোমায় ঠাট্টা করি নাই। অমন করে চেঁচাচ্ছিলে, তাই সাবধান করে দিতেছিলাম। না হয় আর বল্‌ব না।

গৃহিণী। (অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে) তা বল্‌বে না কেন? বল, আরও বল। আমার পোড়া কপাল, তাই ধোপানীর সাক্ষাতে আমায় এত ঠাট্টা, এত অপমান। দামী সাড়ী খানা যে গেল, তার নাম নাই।

বিনোদ। সাড়ী খানা ত তোমার দোষেই গেল।

গৃহিণী। আমার দোষ কিসে! সবটাতেই আমার দোষ! তুমিত দিন রাত আমার দোষই দেখ।

বিনোদ। সাড়ী খানায় যদি চিহ্ন দিয়া দিতে, তবেত ধোপানী কাপড় বদলাইতে পারিত না।

গৃহিণী। না জেনে বক্তিতে করো না। আমি চিহ্ন দিই কি না দিই, তা তুমি জান? আমি প্রতি কাপড়ে স্থতোর চিহ্ন দিই। ও দুষ্টমি করে তুলে দিলে আমি কি কর্‌ব?

বিনোদ। যাতে না তুল্‌তে পারে, তা কল্লেই হয়।

গৃহিণী। তা কি করে হবে?

বিনোদ। কেন বাজারে 'মার্কিং ইঙ্ক' পাওয়া যায়, তার এক কৌটা কিনে এনে দাগ দিলে, ধোপার বাবারও সাধ্যি নাই যে, কাপড় বদ্‌লায়।

গৃহিণী। তার দাম কত?

বিনোদ। প্রতি শিশির দাম ॥০ আট আনা।

গৃহিণী। আট আনা? তবেই হয়েছে! এখন কাপড়ে দাগ দেবার জন্য আবার এক পদ খরচ বাড়্‌ল। তুমি ত গণ্ডা কয়েক টাকা ফেলে দিয়েই খালাস। বাড়ী ভাড়া, ছেলেদের স্কুলের বেতন, ঝির মাহিনা, জলখাবার, মুদির পাওনা, বাজার খরচ সবই ত আমাকে ওরি মধ্যে চালাতে হয়। ওর মধ্যে আবার নূতন খরচ! তুমি ত আর একটা টাকা দেবে না? ওসব হবে না।

বিনোদ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) আমি মাইনে যা পাই, সবই ত তোমার হাতে এনে দিই। তা 'মার্কিং ইঙ্ক' নিজে তোয়ের করে নিতে পাল্লে, অতি অল্প পয়সাতেই হয়। কি করে তোয়ের কত্তে হয়, তা তোমায় বলে দিচ্ছি। কাষ্টিক আধ তোলা, চুয়ান জল বা বৃষ্টির জল অর্দ্ধ ছটাক, গঁদের মণ্ড এক কাঁচ্চা, লাইকর এমোনিয়া সিকি কাঁচ্চা—একটা পরিষ্কার শিশির মধ্যে মিশ্রিত করিয়া একটা অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দিয়ো। তারপর লিখিবার

সময় বেশ করে ঘেঁকে, কলম দিয়ে কাপড়ের উপর ইচ্ছামত চিহ্ন দিয়া আগুনের উপর শুকাইয়া লইও। শতবার ধোয়াইলেও সে চিহ্ন মুছিবে না।

গৃহিণী। তুমি দিন রাত আপিষের কাজেই লেগে আছ। ছেলেরা পরীক্ষার পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। আমি ও ইংরেজী ওষুদ ফষুদ আন্‌তেও পারব না, তোয়ের কত্তেও পারব না। সোজাসুজি কিছু থাকেত বলে দেও।

বিনোদ। ধোপারা যা দিয়ে কাপড়ে চিহ্ন দেয়, তাকে ভেলার কষ বলে। ভেলার কষ বেণে দোকানে পাওয়া যায়। দাম অতি অল্প। দু' আনা কি তিন আনা সের হবে। ভেলা এক প্রকার ফল। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে জন্মে। উহাকে সিদ্ধ করে আল্‌গা হাতে টিপিয়া ধরিলে ভিতর হইতে কষ বাহির হয়। সেই কষ ছুঁচ দিয়া কাপড়ে দাগ দিলে উঠিবে না। কিন্তু সাবধান—ভেলার কষ ভয়ানক বিষ। যেন কোন প্রকারে হাতে না লাগে।

গৃহিণী কর্ত্তার আদেশ মত এবার থেকে কাপড়ে চিহ্ন দিতে লাগিলেন। ধোপানীর সঙ্গে তাঁহার আর ঝগড়া হয় নাই। অন্ততঃ আমরা ত তাঁহার কণ্ঠধ্বনি আর শুনিতে পাই নাই।

শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী।

(২)

আনন্দী বাঈর শিক্ষার সুবিধার জন্য তাঁহার স্বামী গোপালরাও কল্যাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আলিবাগে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান কালে এক বৎসরের মধ্যে আনন্দী বাঈর মারাঠী শিক্ষা শেষ হয়। ইহার পর প্রসূতি অবস্থায় তাঁহার কয়েক মাস পিত্রালয়ে গত হয়। পুত্রশোকে আনন্দী বাঈ এক মাস কাল বিমর্ষভাবে যাপন করিয়া পুনরায় লেখাপড়া শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে গোপালরাও তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। আনন্দী বাঈরও বিদ্যা শিক্ষায় প্রতি অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। তাঁহার ধীশক্তি অতীব প্রখরা ছিল বলিয়া তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিয়মিত পাঠাভ্যাস শেষ করিয়া বহু সংখ্যক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদি পাঠে সময়ক্ষেপ করিতেন। গৃহসংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ভারও গোপালরাও তাঁহারই প্রতি অর্পণ করায় তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ও রচনায় নৈপুণ্য লাভ হইল। কিন্তু তাঁহাকে স্বেচ্ছামত শিক্ষিতা করিতে গিয়া গোপাল রাও এরূপ বিপন্ন হইলেন যে, তাঁহাকে অল্প দিনের মধ্যেই বাধ্য হইয়া আলিবাগ ত্যাগ করিতে হয়।

ইংরাজী শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে গোপালরাও স্বীয় পত্নীকে লইয়া প্রায়ই সমুদ্র-তীরে বায়ু-সেবনার্থ গমন করিতেন। ইহাতে অনেকেরই দৃষ্টি তাঁহার ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র-সমাজে অবগুণ্ঠন ও অবরোধের প্রথা না থাকিলেও এরূপভাবে যুবতী পত্নী লইয়া সমুদ্র-তীরে ভ্রমণ সাধারণের চক্ষে দূষণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই কারণে নগরবাসী দুষ্ট জনেরা গোপালরাওকে লইয়া নানা প্রকার রহস্য বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা তাঁহাকে এরূপ উত্যক্ত করিয়া তুলিল যে, তিনি কোহ্লাপুরে আপনার বদলি করিয়া লইলেন। এই সময়ে আনন্দী বাঈর বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ছিল।

কোহ্লাপুর দেশীয় করদ রাজ্য। তত্রত্য রাজপুরুষেরা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ প্রকাশ করিতেন। সেখানকার রাজার ব্যয়ে তথায় একটি স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কুমারী মাইসী নাম্নী এক শ্বেতাঙ্গ-মহিলা সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া গোপালরাও কোহ্লাপুরে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যপ্রণালীক্রমে স্ত্রীকে শিক্ষিত করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল বলিয়া কোহ্লাপুরেও তিনি অনেকের উপহাসের পাত্র হইলেন। তিনি সেখানকার মিশনরিদিগের গৃহে প্রায়ই সস্ত্রীক গমনাগমন করিতেন ও আনন্দী বাঈকে মিস মাইসীর সহিত এক গাড়ীতে বসাইয়া প্রত্যহ রাজকীয় স্ত্রীবিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন। এই কারণে তত্রত্য স্বদেশীয় রীতি নীতির পক্ষপাতী রাজপুরুষেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ

হইলেন। তাঁহার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার রাজবিদ্যালয়ে আনন্দী বাঈকে প্রেরণের সুবিধা তাঁহার বহু পরিমাণে কমিয়া গেল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গোপালরাও ইহাতেও সংকল্পচ্যুত হইলেন না।

মিশনরিদিগের সহিত কথপোকথনের প্রসঙ্গে গোপালরাও অবগত হইলেন যে, আমেরিকায় গমন করিতে পারিলে আনন্দী বাঈকে তাঁহার স্বেচ্ছামত শিক্ষাদানের সুবিধা হইবে। মিশনরিরা তাঁহাকে একার্য্যে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাদিগের মার্কিনস্থিত কর্তৃপক্ষের সহিত গোপালরাওকে পরিচিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল পত্র লেখালেখি হয়, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গোপালরাও মিশনরিদিগকে তাঁহার জন্য আমেরিকায় একটি চাকরি যোগাড় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মিশনরি মহোদয়েরা সে বিষয়ে তাঁহাকে কোনও সাহায্য না করিয়া কৌশলে তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজেই বিরক্ত হইয়া গোপাল রাওকে তাঁহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার পূর্ব্বে আনন্দীবাঈর সহিত কথোপকথন কালে মিশরিরা তাঁহাকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশে বহুবার তাঁহার নিকট খৃষ্ট-মহাত্মা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশবর্ষীয়া আনন্দী বাঈর স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা এরূপ দৃঢ় ছিল যে, কিছুতেই তাঁহার মতান্তর ঘটে নাই।

কোহ্লাপুরে আনন্দী বাঈর শিক্ষার সুবিধা বিলুপ্ত হওয়ায় গোপালরাও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বোম্বাইয়ে গমন করিলেন। তথায় এক মিশনরি স্কুলে আনন্দী বাঈর শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। আনন্দী বাঈ প্রত্যহ একাকিনী পদব্রজেই বিদ্যালয়ে গমন করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার বেশও কতকটা বিলাতি ধরণের ছিল। এই কারণে বোম্বায়ের ইতর লোকেরা, প্রধাণতঃ বেণে, তাম্বুলী ও সামান্য শস্য-ব্যবসায়ীরা প্রায়ই পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া পরিহাস-বিদ্রূপ করিত।

এই সময়ে গোপাল রাওয়ের পিতা বিনায়ক রাও পুত্রের সহিত দেখা করিবার জন্য বোম্বায়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের ও পুত্রবধূর কার্য্য দর্শনে অতীব ব্যথিত হন। কারণ, মহারাষ্ট্র দেশে বহুদিন হইতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার থাকিলেও উহা বর্ত্তমান কালের ন্যায় ছিল না। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে পেশওয়েগণের আমলে অবস্থাপন্ন লোকেরা গৃহে বয়স্ক শিক্ষক রাখিয়া কুলবালাগণকে যথোচিত বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। সে কালের সরদারদিগের ললনাগণ রাজনীতি বিষয়েও উপদেশ লাভ করিতেন এবং সময়ে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজদরবারে সমস্ত কার্য্যাদির বিবরণী (despatches) লিখিয়া পাঠাইতেন। সেইরূপ গৃহপতিগণের অনুমতি লইয়া বিশ্বস্ত অনুচর ও আত্মীয়ের সহিত প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া গমনাগমনও সাধারণতঃ মহিলাদিগের পক্ষে কখনও নিষিদ্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে মহারাষ্ট্র দেশের যুবকগণ সাধারণ বিদ্যালয়ে রমণীদিগকে পদব্রজে একাকিনী পাঠাইবার পক্ষপাতী হওয়ায় প্রাচীন সমাজের বিশেষ নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। গোপাল রাওয়ের প্রতি তাঁহার পিতার অসন্তোষেরও ইহাই প্রধান কারণ হইয়াছিল। তিনি বিদেশীয় উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে পুত্রকে বহু উপদেশ দিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন ক্রোধভরে, আর পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না, বলিয়া বোম্বাই পরিত্যাগ করিলেন!

বোম্বাই মিশনরি বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে আনন্দী বাঈ সর্ব্বদা শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকারের চেষ্টা করিতেন। তত্রত্য শিক্ষয়িত্রী ও বিদ্যার্থিনীগণের সহিত তাঁহাকে ইংরাজীতেই কথা কহিতে হইত বলিয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় অল্প দিনের মধ্যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সহিত ইংরাজ মহিলাদিগের ন্যায় তিনি যাহাতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে শিক্ষা করেন, সে বিষয়েও গোপালরাও চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। তিনি আলিবাগ হইতে কোহ্লাপুর গমনকালে পথিমধ্যে একদিন আনন্দী বাঈকে বাসায় একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট প্রহরের অধিক কাল কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন! ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা বিদেশে অপরিচিত স্থানে এইরূপ সংকটে পড়িয়া কিরূপ ভয়বিকল হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই

বুঝিতে পারা যায়। বোম্বাইয়ে অবস্থান কালেও গোপাল রাও স্ত্রীর সাহসিকতা-বর্দ্ধনের জন্য বিবিধ উপায়ের অবলম্বন করিয়াছিলেন। আনন্দী বাঈকে একাকিনী মিশনরী স্কুলে পড়িতে পাঠাইবারও তাঁহার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। তথা হইতে কল্যাণ অতি নিকটেই ছিল বলিয়া আনন্দী বাঈর পিত্রালয় গমনের সুযোগ ঘন ঘন উপস্থিত হইত। গোপালরাও তাঁহাকে প্রায়ই একাকিনী পিত্রালয়ে গমন করিতে অনুমতি করিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহার নিদেশক্রমে তাঁহার ভৃত্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত আনন্দী বাঈর সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে টিকিট কিনিয়া দিত, কিন্তু পরে গোপালরাও তাহাও নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন হইতে আনন্দী বাঈকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ একাকিনী কল্যাণে গমনাগমন করিতে হইত।

ইহার পর গোপালরাও আনন্দী বাঈর মাতামহীকে কল্যাণে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং তিন মাসের অবকাশ গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তর ভারত পরিভ্রমণে চলিয়া গেলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া আনন্দী বাঈকে একাকিনী বোম্বাইয়ে থাকিতে হইল। এই সময়ে তিনি স্কুলবোর্ডিংএ-ই বাস করিতেন এবং প্রত্যহ দুই বেলা গোপালরাওয়ের প্রথমা পত্নীর ভ্রাতার বাসায় গিয়া ভোজন করিয়া আসিতেন। এইরূপ গমনাগমন কালে ইতর লোকে তাঁহাকে পথিমধ্যে নিতান্ত বিরক্ত করিত। পরিশেষে দুষ্টজনের বাক্যবাণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি দেড়মাস পরে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিলেন।

উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গোপালরাও দেখিলেন যে, পুনঃ পুনঃ পিত্রালয়ে গমন করিতে হয় বলিয়া আনন্দীবাঈর শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিতেছে। কাজেই তিনি দূরদেশে বদলি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কচ্ছভুজ অঞ্চলের ভুজ ডাকঘরে পোষ্টমাষ্টারের পদ শূন্য হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ গোপালরাওকে সেই স্থানে বদলি করিলেন। কিন্তু ভুজে গিয়া আনন্দী বাঈকে স্কুলে পাঠাইবার কোনই সুবিধা হইল না। সুতরাং গোপাল রাও ঘরেই অবকাশকালে তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

ভুজে গমন করিয়া গোপালরাও একটি নূতন অসুবিধায় পড়িলেন। আনন্দী বাঈ এতদিন বিদ্যা শিক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া রন্ধনাদি কার্য্য শিক্ষা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। মাতামহীর অনুগ্রহে গৃহস্থালী শিক্ষা করিবার তাঁহার কখনও আবশ্যকতাও হয় নাই। এক্ষণে সে সুবিধায় বঞ্চিত হওয়ায় গৃহকর্ম্মের ভার তাঁহার উপর পতিত হইল। আনন্দী বাঈ রন্ধন-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন না, উহা তাঁহার নিকট বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইত। ভুজে অন্য প্রকার সুখাদ্য দুর্লভ ছিল। এই কারণে প্রথম প্রথম কিছু দিন এই দম্পতিকে ছোলাভাজা খাইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে হইয়াছিল।

দেড় বৎসর ভুজে অবস্থান করিয়া আনন্দী বাই ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। দুই এক খানি সংস্কৃত পুস্তকও তিনি পাঠ করিয়া ছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি গোপালরাওকে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে অতিক্রম করিলেন। জনৈক শ্বেতাঙ্গ মহিলার সাহায্যে তিনি সেলাই ও পশমের কারুকার্য্যাদিও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এদিকে গোপালরাওয়ের সহিত ইতঃপূর্ব্বে মিশনরিগণের যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা এই সময়ে "ক্রিশ্চান রিভিউ" নামক আমেরিকার এক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্র দৈবক্রমে মিসেস কার্পেণ্টার নাম্নী এক সদয়হৃদয়া রমণীর হস্তগত হওয়ায় আনন্দী বাঈর জীবন-স্রোত অন্য মুখে ধাবিত হইল। এই রমণী রোশেল নগরে বাস করিতেন। তিনি একদিন জনৈক দন্ত-চিকিৎসকের গৃহে ঐ মাসিক পত্র খানি ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে দেখিতে পান। কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে তিনি উহা পাঠ করিতে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হইল। ঐ সকল পত্র হইতে গোপালরাওয়ের অবস্থার বিষয় অবগত ও মিশনরিদিগের ব্যবহার দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি আনন্দী বাঈকে সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ বিষয়ে উৎসাহিত করিবেন, সংকল্প করিলেন। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে আর একটি দৈবঘটনা অনুকূল হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের "আমী" নাম্নী নবম বর্ষীয়া কন্যা ঘুম হইতে উঠিয়াই তাঁহাকে বলিল—"মা! আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তুমি হিন্দুস্থানে কাহাকে পত্র লিখিতেছ।" এই বালিকা আশিয়া খণ্ডের মানচিত্র কথনও দেখে নাই এবং শ্রীমতী কার্পেণ্টারও স্বীয় সংকল্পের বিষয় ইহার পূর্ব্বে কাহারও নিকট কিছুমাত্র ব্যক্ত করেন নাই। সুতরাং বালিকার এই স্বপ্ন দৈবসঙ্কেত বলিয়া তাঁহার মনে হইল এবং তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কোহ্লাপুরের ঠিকানায় আনন্দী বাঈকে সহানুভূতি ও উৎসাহপূর্ণ এক পত্র লিখিলেন। আমেরিকার সম্বন্ধে আনন্দী বাঈর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য তিনি নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত একখানি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র তাঁহার পাঠের নিমিত্ত নিয়মিতরূপে পাঠাইয়া দিবেন, একথাও এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন। এ বিষয়ের উল্লেখ কালে তিনি স্বয়ং এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "আমার কন্যা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তাহা আমার নিকট বিবৃত না করিলে, হয় ত নানা কার্য্যে আনন্দী বাঈকে পত্র লিখিবার কথা আমি ভুলিয়া যাইতাম!"

ভুজ নগরে অবস্থানকালে এই পত্র আনন্দী বাঈর হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য, আমেরিকার ন্যায় স্থানে এইরূপ একজন অকারণ-বন্ধু পাইয়া তাঁহার অতীব আনন্দ এবং ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস প্রগাঢ় হইল। আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। এই সময় হইতে তাঁহারা পরস্পরকে প্রতি মাসে যথা নিয়মে একটি করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সকল পত্রে উভয়েই স্ব স্ব দেশের সামাজিক আচার ব্যবহারাদির বিষয় পরস্পরকে জ্ঞাপন করিতেন। একটি পত্রে আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে লিখিয়াছেন—"হিন্দুগণ যেরূপ শান্তপ্রকৃতি ও সাত্বিকভাবাপন্ন—ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ সেরূপ নহেন। আমাদিগের (মহারাষ্ট্রীয়দিগের) মধ্যে পাশ্চাত্য দেশবাসীদিগের তুলনায় রোগের সংখ্যা ও কামক্রোধাদি মনোবিকারের প্রভাব অল্প।" আর একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস,—হিন্দুশাস্ত্রে সভ্যজাতিগণের শিক্ষা যোগ্য বিষয় কিছুই নাই। তাঁহাদিগের এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা দেখাইবার জন্যই আমি সংস্কৃত শিখিতেছি। আমি নিরামিষ ভোজন ও দেশীয় বেশভূষা করি; বিবি সাজিবার আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। অতএব স্বদেশীয় রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আমেরিকায় বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা, আমায় জানাইবেন।" কোন কোন পত্রে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের নিকট তিনি আমাদিগের ব্রতাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাঁহার একটি পত্রে মিশনরিগণ একগুঁয়ে, পরধর্ম্মবিদ্বেষী ও সংকীর্ণ চিত্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

এই সকল পত্র হইতে, স্বজাতির ও স্বদেশীয় রীতিনীতির সম্বন্ধে আনন্দী বাঈর কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, এবং তিনি কিরূপ নির্ভীকতার সহিত তাহা বৈদেশিকদিগের নিকট স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তাহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। সে যাহা হউক, শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সহিত পত্রযোগে ক্রমশঃ তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয়েই উপহারস্বরূপ স্বদেশের শিল্পসামগ্রী ও অলঙ্কারাদি উভয়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সহিত পরিচয় ঘটিবার পর হইতে আনন্দীবাঈর ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

আনন্দীবাঈ ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি পত্রে শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে লিখিয়াছেন,—"ভূতপ্রেত-পিশাচাদির প্রতি দিন দিন আমার বিশ্বাস প্রগাঢ়তর হইতেছে। নিদ্রাবস্থায় আমি জটিল প্রশ্নসমূহের উত্তর নির্ণয় করিতে পারি। দেশীয় স্ত্রী-পুরুষগণের উপযোগী কাপড় ছাঁটিতে আমি জানিতাম না, তাঁহা স্বপ্নে শিক্ষা করিয়াছি। পাঠ্যপুস্তকের যে সকল অংশ মুখস্থ করিতে হইবে, তাহা আমি দিবসে একবার পড়িয়া রাখি। তাহার পর রাত্রিকালে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে সেগুলি বহুবার অভ্যাস করি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, সমস্তই মুখস্থ হইয়া গিয়াছে! কাব্যপাঠকালে যে সলক অংশ অতিশয় দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা একবার পড়িয়া

ছাড়িয়া দিই; রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় ঐ সকল অংশের প্রকৃত অর্থ আমার জ্ঞানগোচর হয়। প্রাতঃকালে উহার অবিকল ভাষান্তর করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর বোধ হয় না। রাত্রিকালে কে আমায় জটিল বিষয় সকল শিক্ষা দেয়, তাহা আমি বুঝিতেপারি না; কিন্তু আমার পড়া হইয়া যায়। আপনাকে যথার্থ বলিতেছি, ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস আমার হৃদয়ে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।"

এই সময়ে বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ডাক বিভাগে রমণীদিগের নিয়োগ সম্বন্ধে একটি আদেশ প্রচার করেন। তদ্দর্শনে ডাকবিভাগে আনন্দীবাইকে একটি কর্ম্মের সংস্থান করিয়া দিবার ইচ্ছা গোপালরাওয়ের মনে বলবতী হইল। এই কারণে তিনি কলিকাতায় আপনার বদ্‌লি করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল গোপালরাও সস্ত্রীক কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হন।

কলিকাতায় আসিয়া আনন্দী বাঈর সুখ শান্তি একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার জল বায়ুর দোষে পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হইয়া তিনি নিতান্ত রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ দেশের অবরোধপ্রথাতেও তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকের মনে অমূলক সন্দেহের উদ্ভব হইয়া তাহা আনন্দী বাঈর বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার বহুসংখ্যক পত্রেই কলিকাতার নানা প্রকার নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় চাকরী কালে একবার একখানি সরকারি পত্র গোপালরাওয়ের হস্ত হইতে হারাইয়া যাওয়ায় তিনি অস্থায়িভাবে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তখন আনন্দী বাঈ স্বামীকে রেঙ্গুন ও জাপান হইয়া আমেরিকা গমনের পরামর্শ দান করিলেন। উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র অবগুণ্ঠন ও অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকায় ঐ প্রদেশে থাকিয়া তাঁহাদিগের চাকরী করিবার ইচ্ছা ছিল না। দক্ষিণ ভারতে গমন করিলেও আনন্দী বাঈর শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতেপারে। এই সকল কারণে দেশত্যাগ করাই তাঁহাদিগের সংকল্প হইল। কিন্তু ১৮৮২ সালের ১লা এপ্রিল গোপালরাও পুনরায় চাকরী পাইয়া শ্রীরামপুরে প্রেরিত হওয়ায় আনন্দী বাঈ কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করিলেন। শ্রীরামপুর তাঁহার নিকট কলিকাতা অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সেখানকার লোকচরিত্রেরও তিনি প্রশংসা করিয়াছেন। এতএব রমণীদিগের অতিরিক্ত তাম্বুল চর্ব্বণ ও শিক্ষিতা মহিলাগণের বেশভূষার প্রতি তাঁহার একটি পত্রে বিশেষ কটাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আনন্দী বাঈকে ডাক বিভাগে চাকরী করিয়া দিবার জন্য গোপালরাও যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা এই সময়ে ফলবতী হইল। ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দী বাঈকে ৩০৲ টাকা মাহিনায় একটি চাকরী দিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে গোপালরাও অস্থায়িভাবে পদচ্যুত হইবার পর হইতে চাকরীর প্রতি আনন্দী বাঈর ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এই কারণে তিনি এক্ষণে চাকরী পাইয়াও গ্রহণ করিলেন না। সে যাহা হউক, শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে কয়েক মাসের ছুটী লইয়া গোপালরাও সস্ত্রীক জয়পুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়ার, কানপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ ও বারাণসী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এই দেশ ভ্রমণের ফলে আনন্দী বাঈর বহুদর্শিতা ও প্রবাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিল।

আনন্দী বাঈর ভারতীয় শিক্ষা শ্রীরামপুরেই শেষ হইল। এইখান হইতেই তিনি ডাক্তারী শিক্ষার জন্য আমেরিকা গমন করেন। বারান্তরে আমরা সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

কুন্তলীন প্রেস—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গীয়া আনন্দী বাঈ জোশী এম্‌ ডি।
(আমেরিকা গমনের পর)

KUTALINE PRESS.

প্রথম ভাগ। চৈত্র, ১৩০৭। তৃতীয় সংখ্যা।

সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখী।
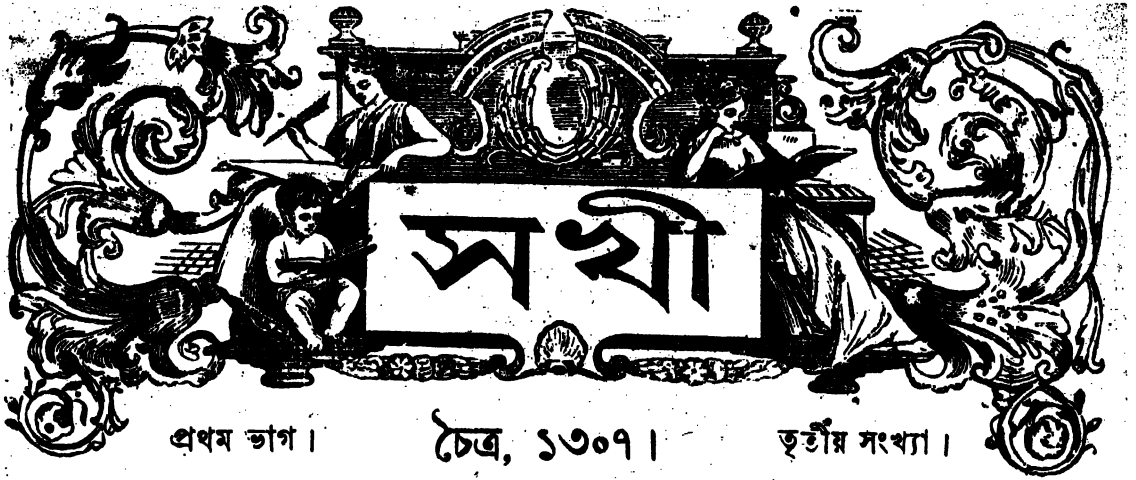
ওগো তরুণ তপন
ঢাল ও আলোকধারা কনক কিরণ,
ওই রূপ দীপ্তি লাগি, হাসিয়া উঠিবে জাগি
সুপ্ত বিশ্ববাসী আর নিখিল ভুবন।

ওই ঊষা করে তব মঙ্গল আরতি,
কর-দীপ্ত প্রকাশিত ও মধুর জ্যোতি—
বিহঙ্গ মধুর স্বরে, তোমারি বন্দনা করে
সমীরণে ভাসে তার আবাহন গীতি।

অপ্রকাশ জ্যোতি তব বিকাশ করিয়া
অচেতন জড়ে রাখ প্রাণ দান দিয়া।
ঈশ্বরের প্রীতি-ধারা কনক কিরণ সারা
মৃত ধরণীরে দিবে আনি নব হিয়া।

কত উচ্চে কত দূরে তুমি কি মহান,
ল'বে কি চরণে তব এই ক্ষুদ্র প্রাণ ?
করুণা কটাক্ষ দানে, চাবে কি আমার পানে
শুনিবে বারেক কিগো আকুল আহ্বান ?

তুমি স্বর্গবাসী, আমি থাকি মর্ত্ত্য-পুরে
তুমি আছ কোথা আর আমি কত দূরে,
আমার এ প্রেম গিয়া, পরশিবে তব হিয়া,
বাজিবে কি হৃদি ছুটি একই মধুসুরে।

আকাশ কুসুম সম আকাঙ্ক্ষা আমার,
ক্ষুদ্র ফুল শোভা হীন আমি যে ধরার।
তোমারে বাসিয়া ভালো, লভি ও মধুর আলো
বাঁচিয়া রয়েছি, মোর তুমি মাত্র সার।

আকাঙ্ক্ষা, কামনা, আর দান প্রতিদান
চাহিনা, সঁপিব শুধু এই ক্ষুদ্র প্রাণ।
তুমি নীলাকাশে থাকি, রাখ ধরা পানে আঁখি
কর ও আলোক-ধারা এ তৃষিতে দান,
তোমাতেই পরিপূর্ণ হোক মোর প্রাণ।

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

আমেরিকার কথা।

নিউইয়র্ক—প্রথম পত্র।

পরমেশ্বরের কৃপায়, নিরাপদে তুমুল তরঙ্গসঙ্কুল আট্‌লান্টিক্‌ মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় পৌঁছিয়াছি। স্থির মাটিতে আবার পা রাখিয়া, পৃথিবীর গন্ধ শুঁকিয়া, ও গাছপালার মুখ দেখিয়া, প্রাণটা জুড়াইল। এই ক'দিন ক্রমাগত সমুদ্রের সাঁ সাঁ শব্দে কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল, আর কেবলই নিরবচ্ছিন্ন নীল—নীল জলরাশি দেখিয়া চক্ষু দুটো ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার গাড়ী ঘোড়ার কোলাহল শুনিয়া ও ইট সুরকীর রং দেখিয়া, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সমুদ্র দূর হইতে দেখিতেই ভাল। শক্ত মাটিতে দাঁড়াইয়া সাগরতরঙ্গের উচ্ছ্বাস নৃত্য দেখিতেই আনন্দ। কচিৎ কখনও বা দশ পাঁচ ঘণ্টার জন্য একেবারে অসীম জলরাশির উপরে ভাসাও মন্দ নহে। এই জন্যই যারা কখনও সমুদ্রে ভাসিয়া বেশী দিন কোথাও যায় নাই, সমুদ্রের নামে তাদের প্রাণ নাচিয়া উঠে। আমিও এক দিন তোমাদেরই মত সমুদ্রের নামে নাচিয়া উঠিতাম। কিন্তু দু এক দিন সাগর বক্ষে বাস করা, কিম্বা শুভ্র সৈকতে সুখে বসিয়া তীর হইতে তাহার উদ্দাম নৃত্য দর্শন করা এক কথা, আর সপ্তাহের পর সপ্তাহে নিরবচ্ছিন্ন ঐ উত্তাল তরঙ্গায়িত নীল জলে ভাসিয়া চলা, আর কথা। বোম্বাই হইতে বিলাত আসিতে একাদিক্রমে যে পনের দিন সমুদ্র বক্ষে ভাসিতে হইয়াছিল, তাহাতেই আমার সমুদ্র যাত্রার সখ জন্মের মত মিটিয়াছিল। এবারে বিলাত হইতে আমেরিকায় আসিতে, তাহাতেই, এত বিতৃষ্ণার উদয় হইয়াছে।

প্রাচীন কাহিনীতে পাতালের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বেদের রূপকে যে দেশে সূর্য্য অস্ত যান, তাহাকেই পাতাল বলিয়া থাকে। পুরাণে সেই প্রাচীন রূপকেরই আরো বাহুল্য অভিব্যক্তি। কিন্তু পাতাল বলিতে যদি সত্যই কোনও দেশ থাকে, ভারতের পক্ষে আমেরিকা ঠিক তাহাই। গোলাকার পৃথিবীর যে পৃষ্ঠে তোমরা কলিকাতায় বসবাস করিতেছ, আমি তার ঠিক বিপরীত পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তোমাদের আকাশে সূর্য্য অস্ত যাইয়া তখনি আমাদের আকাশে আসিয়া উদিত হয়। আবার এখানকার দিনের কাজ সারিয়া অস্তাচলে ডুবিয়া, তোমাদের উদয়াচলে অমনি গিয়া দেখা দেয়। আমার যখন শনিবার সন্ধ্যা, তোমাদের তখন রবিবার প্রাতঃকাল। ঘড়ির কাঁটার হিসাবে, আমি তোমাদের হইতে প্রায় বার ঘণ্টা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি।

ভারত হইতে খুব দ্রুতগামী জাহাজে বিলাত আসিতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগে। বিলাত হইতে আমেরিকা সাত আট দিনের পথ। বিলাতের লিভারপুল সহর হইতে রওনা হইয়া, আমার জাহাজ ঠিক নবম দিন প্রাতে নিউইয়র্কের বন্দরে আসিয়া নঙ্গোর করিয়াছে।

পথের কথা বেশী আর কি লিখিব? জাহাজের বন্দোবস্ত মন্দ ছিল না। তবে আমাদের দেশ হইতে বিলাতে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, সেগুলিতে যেরূপ সৌখীন বন্দোবস্ত আছে, এ সকল জাহাজে তাহার কিছুই নাই। ইংরাজ আমাদের রাজা, তাই আমাদের দেশে যত দিন থাকেন, রাজার জাত বলিয়া যথেচ্ছা নবাবী করিয়া লয়েন। এই সকল নবাবী আমেজের যাত্রীদিগের মন যোগাইবার জন্যই আমাদের দেশে বিলাত হইতে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, তাহাতে ঐরূপ নবাবী বন্দোবস্ত থাকে। কিন্তু ইংরাজ যখন আপনার দেশে থাকেন, তখন তাঁর একপ নবাবী চাল থাকে না। এইরূপ নবাবী চাল রাখিতে হইলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, অনেকের ভাগ্যে তাহা জুটিয়া উঠে না। বিলাতী সাহেবেরাই আমেরিকার জাহাজের যাত্রী; তাঁহাদের জন্য কোনও বিশেষ সৌখীন বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হয় না। এই জন্য এই সকল জাহাজের কামরাগুলি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ,—কামরার ভিতরকার সাজ সজ্জাও অতি সামান্য; আর আহারাদির

ব্যবস্থাও অতিশয় সাদাসিধে রকমের। এই রূপ সাদাসিধে রকমের বন্দোবস্ত আমার জাহাজেও মন্দ ছিল না।

আমি যে জাহাজে আসিয়াছি, তাহাতে একজন ভারত-প্রবাসী ইংরাজ ছিলেন। তিনি বহুদিন আমাদের দেশে নবাবী করিয়া কাটাইয়া আসিয়াছেন। তাঁর এ সকল সাদাসিধে ব্যবস্থা ভাল লাগিবে কেন? তিনি আমার সঙ্গে দেখা হইলেই জাহাজের বন্দোবস্তের বিস্তর নিন্দাবাদ করিতেন, আর ভারতে যে সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁর মুখে "এমন দেশ কি আর আছে" "এমন দেশ কি আর হয়।" "এমন ভদ্রতা, ও আদব্ কায়দা কি আর কোথাও আছে?"—এসকল কথা শুনিতে পাইতাম, আর মনে মনে হাসিতাম। আমাদের দেশে বেশী দিন নবাবী আমেজে কাটাইয়া গেলে, ইংরাজের মেজাজ এমনি বিগড়িয়া যায়, যে আর সে কখনও স্বদেশে ও স্বজাতির মধ্যে যাইয়া, মনের সুখে বাস করিতে পারে না। এই জন্য অনেক ভারত-প্রবাসী ইংরাজকেই শেষ দশায় স্বদেশে যাইয়া আমরণ আপশোষ করিয়া কাটাইতে হয়।

নিউইয়র্ক ঠিক আমেরিকার রাজধানী নহে। এ দেশে প্রজারাই আপনারা আপনাদের মনোমত লোক নির্ব্বাচন করিয়া রাজকার্য্য চালাইয়া থাকে, ইহা অবশ্যই জান। যে দেশে রাজা নাই, সে দেশে আবার রাজধানী কি? যদি রাজধানীর মত আমেরিকায় কিছু থাকে, সে নিউইয়র্ক নহে, তাহা ওয়াশিংটন্। তার কথা আর এক দিন বলিব। কিন্তু নিউইয়র্ক রাজধানী না হইলেও অতি বড় সহর। ফলতঃ আকার আয়তন লোকসংখ্যা ও ব্যবসাবাণিজ্যাদি দ্বারা বিচার করিলে, নিউইয়র্ক আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান সহর ইহা বলিতেই হইবে। বিলাতের রাজধানী লণ্ডন অপেক্ষা নিউইয়র্ক এখনও কতকটা ছোট আছে বটে, কিন্তু যে দ্রুত গতিতে ইহার আয়তন ও জনসংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে আর দশ পনের বৎসর মধ্যে নিউইয়র্ক লণ্ডনকে ছাড়াইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হয়। লণ্ডন একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার জঙ্গল বলিয়া মনে হয়। বহুকাল বাস করিয়াও তার পথ ঘাট চিনিয়া লওয়া কঠিন। নিউইয়র্ক কিন্তু অন্য রকমের। এত বড় সহর, কিন্তু এখানে নিতান্ত অন্ধ না হইলে কাহারও পথ ভুলিবার আশঙ্কা নাই। কতকটা যেন ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রণালীতে এই সুবিস্তীর্ণ সহরটা পত্তন করা হইয়াছে। এই প্রণালীটা একবার একটু শিখিয়া লইলেই, সমস্ত সহরটা নখাগ্রে ধারণ করিতে পারা যায়। নিউইয়র্কের তিন দিকে জল, বিস্তীর্ণ নদী। উত্তর দিকে নদীর ধারে খানিকটা স্থানে রাস্তা ঘাটের কতকটা গোলমাল আছে। কিন্তু এই সামান্য স্থানটুকু ছাড়া, সমস্ত সহরটাকে সরল রেখার ন্যায় দুই শ্রেণীর রাজ পথের দ্বারা সতরঞ্চের ঘরের মত কাটা হইয়াছে।

একশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণে, আর অপর শ্রেণী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সমকোণ কাটিয়া রচিত হইয়াছে। উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নদী আছে বলিয়া, কেবল দক্ষিণের দিকেই সহরটা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দুই শ্রেণীর রাজ পথের মধ্যে যে গুলি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, সে গুলিকে ষ্ট্রীট (Street) বলা হয়; আর যে গুলি উত্তর দক্ষিণে চলিয়াছে, তাহার নাম এভেনিউ (Avenue)। সহরের দৈর্ঘ্য বেশী বলিয়া ষ্ট্রীট সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক, কিন্তু প্রস্থে সহরটা দুইটা নদীর দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া অতি সংকীর্ণ, এই জন্য উত্তর দক্ষিণে যে সকল রাস্তা গিয়াছে, তার সংখ্যা বেশী নয়, কেবল মাত্র পনেরটা। আমাদের বড় বড় সহরের মত, বিলাতেও কোনও প্রসিদ্ধ লোকের নামে বা কোনও পল্লীর প্রাচীন নামে, রাজ পথের নামকরণ হইয়া থাকে। কিন্তু নিউইয়র্কে কোনও ব্যক্তির নামে নহে। কেবল নম্বর দিয়া প্রথম, দ্বিতীয় এইরূপ ভাবে রাজ পথের নামকরণ করা হইয়াছে। ষ্ট্রীটগুলির নম্বর দক্ষিণ দিকে, আর এভেনিউ গুলির পশ্চিমদিকে বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব তুমি যে ষ্ট্রীটে দাঁড়াইয়া আছ, তার বেশী নম্বর ষ্ট্রীটের কোনও স্থানে যাইতে হইলেই, তুমি জান যে তোমাকে দক্ষিণ মুখে চলিতে হইবে, কম নম্বর ষ্ট্রীটে যাইতে হইলে উত্তর মুখে যাইলেই তথায় উপস্থিত হইবে। সেইরূপ তুমি যে

এভেনিউএ দাঁড়াইয়া আছ, তার অল্প নম্বর এভেনিউএ যাইতে হইলে পূর্ব্বদিকে, বেশী নম্বর এভেনিউএ যাইতে হইলে পশ্চিম দিকে যাইতে হইবে, ইহাও জানা রহিল। এভেনিউ পনেরটা বলিয়াছি। ইহার মধ্যে তিনটী এভেনিউ পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি পূর্ব্বদিকের নদী গর্ভ হইতে অনেকটা স্থান উদ্ধার করিয়া, তাহাতে এই তিনটী রাজপথ রচিত হইয়াছে; সুতরাং প্রথম এভিনিউএর অগ্রে পড়িয়া যাওয়াতে ইহাদের অন্যবিধ নামকরণ করিতে হয়, এগুলিকে এভেনিউ এ, বি, সি, কহে। বাকী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নামের এভেনিউ বারটী। দ্বাদশ এভেনিউয়ের পরেই নদী তীর। পঞ্চম এভেনিউ ঠিক মাঝখানে পড়িয়াছে। সুতরাং এই এভেনিউ দিয়া সমগ্র সহরটাকে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পঞ্চম এভিনিউএর বামে যে ষ্ট্রীটের যে ভাগ পড়িয়াছে, তাহা 'পূর্ব্ব' এই বিশেষণে অভিহিত হয়, আর তাহার দক্ষিণে যে ভাগ পড়িয়াছে, তাহাকে 'পশ্চিম' এই বিশেষণের দ্বারা নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে। পঞ্চম এভেনিউ যেখানে সপ্তম ষ্ট্রীটকে কাটিয়াছে, তার বাম দিকের নাম পূর্ব্ব-সপ্তম-ষ্ট্রীট (East seventh street), আর দক্ষিণ দিকের নাম পশ্চিম-সপ্তম-ষ্ট্রীট (West seventh street)। দুইটা ষ্ট্রীট ও দুইটা এভেনিউয়ের মধ্যে, সতরঞ্চের ঘরের মত স্থান ভাগকে আমেরিকার লোকেরা ব্লক (Block) বলেন। এই সকল ব্লক দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায়ই অনেকটা সমান, সচরাচর দুই শত গজ লম্বা হইবে। পাঁচ ব্লক দূরে, সাত ব্লক দূরে, এই রূপ করিয়া নিউইয়র্কের লোকেরা সচরাচর কথা বার্ত্তায়, সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সকল ব্লকের উপরেই সহরের সমুদায় ঘরবাড়ী নির্ম্মিত। এই জন্য প্রত্যেক বাড়ীই রাস্তার উপরে এবং প্রত্যেকেরই পশ্চাতে খানিকটা খোলা যায়গা ও বাগান আছে। এত বড় সহর, লক্ষ লক্ষ বাড়ী, গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া আছে; এবং রাস্তা হইতে দেখিলে অনেকটা চাপা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পশ্চাতের দিকে এই খোলা যায়গা থাকাতে তাহাতে বায়ু চলাচলের কোনও ব্যাঘাত হয় না। আর প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখের দিক হইতে যদিও কেবল শুষ্ক ইট সুরকী ভিন্ন আর কিছু দেখিবার উপায় নাই, একবার পশ্চাতের দিকের ঘরে বা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেই সময়োপযোগী বৃক্ষ লতাদির শোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায়।

নিউইয়র্কের মত, এইরূপ ধরণের সহর নাকি আমি আর কোথাও দেখি নাই; এত বড় সহরে, রাস্তা ঘাটের এমন সুপরিপাটি ব্যবস্থা আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না, এই জন্যই এ সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম।

নিউইয়র্কে আসিয়া আর একটা নূতন জিনিষ দেখিলাম, সেটা মাথার উপর দিয়া রেলের রাস্তা। নিউইয়র্ক বড় ব্যবসাপ্রধান স্থান। লোক জন দিন রাত্রি কাজে ব্যস্ত; আর সর্ব্বদাই চারিদিকে তাহাদিগকে নাটাইয়ের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এ অবস্থায় সহরের সর্ব্বত্র সহজে যাতায়াত করিবার অতি ভাল বন্দোবস্ত না থাকিলে চলিবে কেন? নিউইয়র্কে এই জন্য রাজপথের মাঝখান দিয়া বিদ্যুতের গাড়ী চলে, আর কোনও কোনও রাস্তার মাথার উপর দিয়া রেল গাড়ী চলিয়া থাকে। এই সকল রাস্তার উপরে যেন ছাদ আছে, এমন মনে হয়। আর তার উপরে ঘর্ঘর রবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত শত যাত্রী বুকে করিয়া, রেল গাড়ী ছুটিতেছে। মাথার উপরের এই রেলপথ সমস্ত সহরটা বেষ্টন করিয়া আসিয়াছে। বিলাতে মাথার উপর দিয়া রেল চলিবার ব্যবস্থা নাই। লণ্ডন সহরে, মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কাটিয়া, তার ভিতর দিয়া রেলগাড়ী চালান হইয়াছে। এই সকল সুড়ঙ্গের রেলে চাপিয়া কোথাও যাইতে, ধূঁয়োতে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। বড়ই অসোয়াস্তি বোধ হয়। আমি এই জন্য প্রায়ই লণ্ডনে মাটির নীচেকার রেল পথে চলাফেরা করিতাম না। আমেরিকায় দুএকটা স্থান ভিন্ন সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া কোথাও রেল চালান হয় না; এঁরা থাম পুতিয়া, রাজপথের উপরে, পথিকদিগের মাথার উপর দিয়া, মুক্ত বায়ুতে রেল চালাইতেছে। ইহাতে সহরেরও শোভা একরূপ বৃদ্ধি পায়, আর যাত্রীদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়।

তৃতীয়, নিউইয়র্কের বাড়ীগুলাও দেখিবার বস্তু সন্দেহ নাই। এমন আকাশভেদী প্রাসাদাবলী আর কোনও সহরে দেখিতে পাই নাই। দশ বার তালার বাড়ীর ত কথাই নাই; মাঝে মাঝে ২৪।২৫ তালার বাড়ী পর্য্যন্ত এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রড্ওয়ে নামে একটা বিস্তীর্ণ রাজপথ, নিউইয়র্কের মাঝখান দিয়া, কতকটা কোণাকোণীভাবে চলিয়া গিয়াছে। এই রাজপথের দুই ধারে অনেকগুলি অভ্রভেদী বিংশতি, দ্বাবিংশতি, চতুর্ব্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি তল সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া, ইহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। আমি যে স্থানে আছি, তাহার চারিদিকেও এইরূপ অভ্রভেদী চূড়াবিশিষ্ট প্রাসাদ অনেকগুলি আছে। কিছুদিন পর্য্যন্ত আমি নীচ হইতে মাথা তুলিয়া, এই সকলের উপরের তলা দেখিতে পারিতাম না, দেখিতে গেলেই চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিত, মাথা ঘুরিয়া যাইত। এখনও ঠিক নীচে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া, এ সকলের তালা গুণিতে পারি না। অনেকটা দূরে যাইয়া তবে এগুলিকে ভালরূপে দেখিতে পারা যায়। নিউইয়র্কের মত লণ্ডনে এমন বাড়ীর বাহার দেখি নাই।

এই সকল অভ্রভেদী প্রাসাদে লোকজন ওঠা নামা করে কিরূপে, জানিবার জন্য নিশ্চয়ই তোমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীতেই সিঁড়ি আছে বটে, কিন্তু এত সিঁড়ি বাহিয়া কি আর মানুষ দিন রাত ওঠা নামা করিতে পারে? কাজেই সিঁড়ি আছে বটে, কিন্তু কেহ তাহা ব্যবহার করে না, কেবল দৈব দুর্ঘটনার জন্যই তাহা রাখা হইয়াছে। এই সকল বাড়ীতে ওঠা নামার জন্য একটা একটা কল আছে। বাড়ীর একটা প্রকোষ্ঠের নীচ হইতে সর্ব্বোচ্চ তলা পর্য্যন্ত ছাদ নাই, কেবল চারিদিকে দেওয়াল আছে। এই প্রকোষ্ঠে একখানি কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মঞ্চটা লোহার রেলে ঘেরা। এই মঞ্চখানা তাড়িত শক্তিতে সর্ব্বদা ওঠা নামা করিয়া থাকে। এই মঞ্চে চড়িয়া নীচ হইতে উপরে ও উপর হইতে নীচে আসিতে হয়। এই মঞ্চের একজন করিয়া চালক থাকে, তাহারাই কল টিপিয়া ইহাকে প্রত্যেক তলার দ্বারে লইয়া যায় এবং লোকজনকে উঠাইয়া দেয় ও নামাইয়া আনে। মঞ্চের আয়তন অনুসারে পাঁচ সাত, দশ পনের, এমন কি কখনও কুড়ি পঁচিশ জনও একসঙ্গে উঠিতে নামিতে পারে। এই সকল তাড়িত মঞ্চে আরোহণ করিয়া ওঠা নামাতে যে বড় সুখ আছে, তাহা মনে করিও না। বিশেষ, যখন বিদ্যুৎবেগে মঞ্চটা এক পলকে চারি পাঁচ তলা নামিয়া আসে, তখন সেই বেগে শরীরের ভিতরটা যেন সহসা কুঞ্চিত হইয়া একটা ক্লেশকর শূন্যতা অনুভব করিতেছে এমনই মনে হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই আরোহণ মঞ্চখানি আপনার গন্তব্য স্থানে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়, নতুবা অতি অল্প লোকেই ইহা ব্যবহার করিতে পারিত।

সহরের বর্ণনা ত করিলাম; এখন লোকগুলি কেমন তাহা জানিবার জন্য তোমরা এতক্ষণে খুবই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছ। আজও তার বেশী কথা বলিবার অধিকার জন্মায় নাই। তবে যতদূর দেখিয়াছি, খুবই ভাল লাগিয়াছে। প্রথমতঃ এরা আপনার দেশ ও আপনার জাতকে বড়ই ভালবাসে, কথায় বার্ত্তায়, চাল চলনে, সকল বিষয়েই ইহাদের এই স্বদেশ-প্রীতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইংরাজের সঙ্গে প্রথম দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "এই ঠাণ্ডা দেশে আসিয়া তোমার শরীর কেমন আছে? বেশী শীত বোধ হয় কি?" ইংরাজ প্রায়ই আব্‌হাওয়ার কথা পাড়িয়া প্রথম পরিচয় আরম্ভ করেন। এখানে বিদেশীদের সঙ্গে ঠিক সেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে না। সকলেই জিজ্ঞাসা করে,—"আমাদের দেশটা তোমার কেমন লাগিতেছে?" এখানকার লোকের বিশ্বাস যে তাদের দেশের মত এমন দেশ পৃথিবীতে আর নাই। সুতরাং যখন তাদের দেশ তোমার কেমন লাগিল, এই কথা যখন ইহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তা'রা এটা আশা করে, যে তুমি তাদের দেশের ভাল যাহা দেখিয়াছ তাহাই বলিবে। না বলিলে তাহারা একটু ক্ষুন্ন হয়। তুমি গুণগ্রাহী নহ, এইরূপই মনে বা করিতে পারে। অধিকাংশ আমে-

রিকান্ আপনার মাতৃভূমির অপমান বা অগৌরব সহ্য করিতে পারেন না। আমি জাহাজ হইতে নামিয়াই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হই। এদেশের নিয়ম এই যে, বিদেশ হইতে এখানে যে যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া আইসে, তা'রই জন্য একটা মাশুল দিতে হয়। কেবল ব্যবহৃত ও পুরাতন পরিধেয়াদির কোনও মাশুল লাগে না। আমার সঙ্গে এক বাক্স বই ছিল। বইএর উপরে মাশুল আছে। জাহাজ হইতে আমার বাক্স নাবান মাত্রেই একজন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া তাহা খুলিয়া মাশুল লাগে এমন কিছু আছে কি না, দেখিতে লাগিলেন। আমার বইগুলি দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনাকে এই সকল বইএর জন্য মাশুল দিতে হইবে।" আমি একটু বিদ্রূপ করিয়া বলিলাম—"এই কি সভ্যদেশের আইন যে একজন ধর্ম্মপ্রচারক ও সাহিত্য-সেবককে আপনার ব্যবহার্য্য গ্রন্থের জন্য মাশুল দিতে হইবে? কোনও দেশে তো এমন দেখি নাই। আমি জানিতাম আমেরিকা সভ্যজগতের শিরোমণি, দেশে পা দিয়াই দেখিতেছি, আমার সে ভ্রম ঘুচিতে লাগিল।" কর্ম্মচারিটী আমার মুখের দিকে তাকাইলেন আমার মস্তকে পাগড়ী; অঙ্গে আমাদের দেশের চোগা ও কোট্; বর্ণ শ্যাম; অথচ মুখাকৃতিতে আর্য্যজাতির লক্ষণ; আমি যে হিন্দু, বুঝিতে বাকি রহিল না। তাঁর নিকটে আর একজন কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আমার কথা শুনিয়াই বলিলেন—"যাক্‌গে ছেড়ে দাও।" অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার জিনিসগুলি ছাড়িয়া দিলেন। বিদেশীর চক্ষে আপনার মাতৃভূমির গৌরব হানি হইবে, ইহা সহ্য করা অপেক্ষা, মাশুল আদায় না করাই মাতৃভক্ত আমেরিকান রাজকর্ম্মচারী শতগুণ শ্রেয়স্কর মনে করিলেন।

যেমন এদের স্বদেশ প্রীতি, তেমনি আবার অমায়িকতা। ইংরাজেরও মাতৃভূমির প্রতি গভীর অনুরাগ আছে। আপনার দেশের ও আপনার জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজও সর্ব্বদাই নিরতিশয় ব্যগ্র। কিন্তু ইংরাজের স্বজাতি বাৎসল্যের মধ্যে একটা অহমিকার ভাব সততই যেন জাগিয়া আছে; তাহা যেন সর্ব্বদাই ভিতরে ভিতরে অপর দেশ ও অপর জাতির প্রতি একটা গভীর অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেছে, এমনই মনে হয়। সে স্বদেশ প্রেমে, আমেরিকানের সরলতা, উদারতা ও অমায়িকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। বালকের আত্মগৌরবের মধ্যে যেমন একটা মিষ্টতা আছে, তেমনি আমেরিকবাসীদের এই আত্মশ্লাঘার মধ্যেও একটা মাধুর্য্য আছে। ইহাতে কাহারো বিরক্তি বা বিদ্বেষের উদয় হয় না। আমেরিকার লোকে সহজে নিজেরাও বিরক্ত হয় না। যে অবস্থায় অপর দেশের লোকের সহজেই ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, আমেরিকার লোক সে সকল অসুবিধা হাসি মুখে সহ্য করিয়া থাকে। নিউইয়র্কে পা দিয়াই আমেরিকবাসীর এই অপূর্ব্ব অমায়িকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখানকার ট্রাম্ গাড়ীগুলি আমাদের দেশের ট্রাম গাড়ীর মত ঠিক নহে। আমাদের ট্রাম গাড়ীতে বেঞ্চগুলি সারি সারি সাজান থাকে। এখানে সেরূপ থাকে না। এখানকার গাড়ীগুলিতে লম্বালম্বি দুইখানা মাত্র বেঞ্চ আছে। গাড়ীগুলি তাড়িত শক্তিতে চলে, কিন্তু যে তারের ভিতর দিয়া এই শক্তি গাড়ীর চাকায় সঞ্চারিত হয়, তাহা মাথার উপর দিয়া না চলিয়া, মাটির নীচ দিয়া; ট্রামের যে রেল আছে, তার মাঝামাঝি ধরিয়া গিয়াছে। এই জন্য গাড়ীগুলো বড়ই হেঁচকাটানে চলে। সন্ধ্যা চারিটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত গাড়ীতে এত জনতা হয় যে, বেঞ্চে বসিবার স্থানাভাবে, গণ্ডা গণ্ডা স্ত্রী পুরুষ মাঝখানে দাঁড়াইয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু এইরূপ হেঁচকাটানে যে গাড়ী চলে, তাতে দাঁড়াইয়া স্থির থাকা তো সহজ নহে। গাড়ীর মাঝখানে দুই দিকে দুইটা পিত্তলের ডাণ্ডা মাথার উপরে বাঁধা আছে। তাহাতে অনেকগুলি চামড়ার দোয়ালি সংলগ্ন রহিয়াছে। দিনের বেলায় যেমন বাঁশঝাড়ে বাদুড় ঝুলিয়া থাকে, এই সকল দোয়ালি ধরিয়া, এই ট্রাম গাড়ীর ভিতরে যখন জনতা হয়, স্ত্রীপুরুষেরা ঝুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আর এক একবার লোকজন উঠাইবার বা নামাইবার জন্য গাড়ী থামিয়া যখন আবার হেঁচকাটান দিয়া সবেগে চলিতে আরম্ভ করে, তখন কত

যে মাথা ঠুকাঠুকি হয়, কত লোক যে কত লোকের গায়ে সজোরে পড়িয়া যায় তাহা সহজেই বুঝিতে পার। কিন্তু ইহাতে কেহ কখন রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করে না; কিন্তু যে আঘাত দেয় ও যে আঘাত পায়, ও যারা ইহা দেখে, সকলেই চিরপরিচিত বন্ধুদিগের মধ্যে ঠেলা-ঠেলি যেমন হাসিমুখে গ্রহণ করে, সেইরূপ হাসিমুখে ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিয়া থাকে। অন্য দেশে এরূপ অবস্থায় কত বকাবকি, কত মারামারি হইত। কিন্তু এখানে যে কেউ এর জন্য কারো উপরে বিরক্ত হয় না, ইহা এ জাতির বাল-স্বভাব-সুলভ অমায়িকতা ও উদারতাই নিদর্শন।

আজ এখানেই শেষ করি। বারান্তরে আমেরিক সমাজের রমণী-চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিব।

অলক্ষ্মী বিদায়।

প্রিয়নাথ যখন প্রাণের প্রিয়তম পত্নী বিয়োগে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবার মানস করিল, তখন তাহার বৃদ্ধা পিসিমা কাঁদিয়া বলিলেন—"প্রিয় শেষ অবস্থায় আমার গতি কি হইবে বাবা?"

প্রিয় যখন এক মাসের দুগ্ধ পোষ্য শিশু তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। জননী দেবী পাঁচ বৎসর কাল পিতৃহীন প্রাণের পুত্তলিকে বিধবা হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহে লালন পালন করিয়া পতির পার্শ্বে চলিয়া গেলেন, সুতরাং প্রিয় অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন অনাথ হইয়া পড়িল।

তখন পিসি মা আপনার বক্ষমাঝে সেই নিরাশ্রয় জীবটীকে আশ্রয় প্রদান করিয়া স্নেহের পক্ষপুট মধ্যে বিহঙ্গী যেমন তাহার শিশু শাবককে শীত, উত্তাপ ও বাত্যা হইতে রক্ষা করে, তেমনি প্রিয়নাথকে সযত্নে রক্ষা করিলেন।

সেই প্রিয়নাথ শিশু হইতে কিশোর, কিশোর হইতে যুবক হইয়া উঠিল। যে প্রৌঢ়ার পদতলে কিছু দিন পূর্ব্বে পৃথিবী অল্পে অল্পে সরিয়া যাইতে ছিল এবং শ্মশানের চিতাভস্মের প্রতীক্ষায় যে জীবনের দিন গুলি জপমালার গুটিকার ন্যায় গুণিয়া শেষ করিতেছিল, সেই বৃদ্ধাই আবার সস্নেহ পালিত ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ যোগ্য বয়স দেখিয়া পুনরায় সংসার আলোকময় দেখিল, তাহার মানস চক্ষের সম্মুখে চিতাভস্মের পরিবর্ত্তে এক খানি কোমল সলজ্জ প্রতিমা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই প্রতিমা গৃহে আসিল; তাহার দেবজ্যোতিতে গৃহ অপূর্ব্ব প্রভান্বিত হইল—বিষাদব্যথিত শুষ্ক প্রাণে সরস সুকোমল প্রসূণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সেই দেবী প্রতিমার আবার বিসর্জ্জন হইল। পূজা সম্যক আরম্ভ হইতে না হইতেই বিজয়া দশমীর অশ্রু নয়নে নয়নে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ কাঁদিল, তাহার জীবনের সুধাময়ী সঙ্গিনী আজ তাহাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেল! বৃদ্ধা কাঁদিল—আজ তাহার নয়নের আলো নিভিয়া গেল, সংসারের বন্ধন ছিন্ন হইল!!

একটী পালিত পশু বা পক্ষী মরিলে মানুষের সহৃদয় প্রাণ তাহার শোকেই অধীর হয়। আপনার প্রিয়জনের বিরহ শোকে মানুষ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাঁদে। কিন্তু সেই প্রিয়জন যদি সুন্দর-চরিত্র, বিনয়গুণ-ভূষিত হয়, তবে তাহার শোক যে কত মর্ম্মঘাতী তাহা সহজেই অনুমেয়।

অতএব প্রিয়নাথ যদি তাহার গুণবতী পুণ্যশীলা পত্নীর বিচ্ছেদ শোকে সংসারে বীতস্পৃহ হয় তোমরা তাহাকে কেহ দোষ দিতে পার না।

বৃদ্ধা শোকাতুরকে সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না; কেবল প্রাণের অনন্ত বেদনায় কাঁদিয়া বলিল—'শেষ দশায় আমার গতি কি হবে বাবা?'

২

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস যেরূপ প্রবল হয় যদি শেষ পর্য্যন্ত সেরূপ থাকিত, তবে জগতে কত যে শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইত বলা যায় না। সময়ে যখন শোক কিছু মন্দীভূত হইল, তখন প্রিয়নাথ স্থিরচিত্তে ভাবিল—যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, ইহার উপর আমি আবার নূতন শোক ডাকিয়া আনি কেন? নিয়তির ইচ্ছা কে রোধ করিতে পারে? কিন্তু আমি এই সময়ে যদি পিসিমাকে ফেলিয়া যাই তবে তাঁহার দুঃখের সীমা

থাকিবে না। হায়! তাঁহার সকল আশা আমাকে জড়াইয়াই জীবিত; আর তাঁহার কেহ নাই।

পিসি মা যখন বুঝাইয়া বলিলেন—"বাবা প্রিয়, তোমার এই কচি বয়েস, এখন কোথায় সুখ সচ্ছন্দে পুত্র পরিবার নিয়ে ঘর সংসার করবে, তা না হ'য়ে বিরাগী হ'তে চল্লে! যা হয়েছে তা আর ফেরবার নয়; তেমন গুণের বউ মা আর হবে না—কোথায় আমি যাব, না সতী লক্ষ্মী সে এগিয়ে চলে গেল! তবুও আমি বলি বাবা, বংশ রক্ষার খাতিরে পিতৃপুরুষদের মুখে জল দেবার জন্যে আর একটী বিয়ে কর। বিনোদের মেয়েটি বেশ ডাগর আছে, সেও অনেক জেদাজেদি করছে, সেই খানেই মত করে বিয়েটী কর বাবা।" প্রিয়নাথের কাছে কথা গুলি নিতান্ত অযুক্তিকর বলিয়া মনে হইল না। সে চাকরী করিত; পত্নী বিয়োগের পর আর চাকরীতে মন লাগে না। সরকারী কাজ হঠাৎ ছাড়িবার উপায় নাই। আপিসে যায়, কিন্তু সকলি শূন্য ও মরুময় মনে হয়।

শেষে মনের এরূপ অবস্থা হইল যে, প্রিয়নাথ ভাবিল সে অচিরেই পাগল হইয়া যাইবে। সারারাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কাটিয়া যায়, যে টুকু নিদ্রা হয় তাহাও দুঃস্বপ্নময়। শরীর দিন দিন কৃশ, ও মন দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল।

নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন শেষ আশায় ভাসমান তৃণখণ্ডকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া ধরে, ক্ষিপ্তপ্রায় প্রিয়নাথ সেইরূপ নিরুপায় হইয়া শেষে বিবাহরূপ তৃণাশ্রয়ের জন্য স্থির সঙ্কল্প হইল। বিনোদ বাবুর কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিতই তাহার পরিণয় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

৩

বিরাজ বড় সেয়ানা মেয়ে। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী। স্ত্রীলোকদিগের "অশিক্ষিত পটুত্ব" এক অপূর্ব্ব জিনিস। বিরাজকে কেহই শিখায় নাই, কিন্তু সে স্বামী গৃহে আসিয়াই নিমেষে সেখানকার আবহাওয়া চিনিয়া লইল। সে অতি শান্ত, অতি ধীর, নিয়ত পিসিশাশুড়ী ঠাকুরাণীর সেবায় ব্যস্ত। তাঁহার মুখ হইতে কোন আজ্ঞা বাহির হইতে না হইতে বিরাজ তাহা সম্পন্ন করিত।

বিরাজ বুঝিতে পারিয়াছিল যে স্বামীর হৃদয় অধিকার করিতে হইলে এই পিস্‌শাশুড়ীর সেবা পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে—সে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে কোন দিকে বাতাসের গতি তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল।

স্বামী দেখিল নববধূ অতীব ধীর বুদ্ধিশালিনী। তাহার হৃদয় কোমল, গুরুজনে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। প্রিয়নাথ আশ্বস্ত হইতে লাগিল।

বিরাজ ছায়ার ন্যায় তাহার স্বামীর অনুগামিনী হইল। সে বুঝিত স্বামী এখনও পূর্ব্ব পত্নীর শোকে কাতর, অতএব যে কোন উপায়ে তাঁহার চিত্তবিনোদন তাহার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই ভাবে দুই বৎসর কাটিল। বিরাজের একটী পুত্র সন্তান জন্মিল; কত সাধের ছেলে!! বৃদ্ধা পিসি আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। ভগবান এমন দিন তাহার ভাগ্যে দিবেন এ তাহার মনে ছিল না।

দম্পতির বিক্ষিপ্ত প্রীতি সন্তান উৎপত্তির সঙ্গে একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং সেই সন্তানের মধ্য দিয়া পরস্পরের প্রতি সখ্যপ্রেমও প্রগাঢ়তর হইয়া উঠে। বিরাজ এখন নিশ্চিন্ত হইল, সে বুঝিল এতদিনে স্বামী তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়াছে।

বাতাসের গতি ফিরিল। পিসিশাশুড়ীর প্রতি যত্ন দিন দিন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পিসি ভাবিল বউমা ছেলে মানুষ, ছেলে নিয়ে ব্যস্ত, অন্য সব দেখবার সময় পায় না।

কিন্তু যখন কাজ কর্ম্মে, খুঁটি নাটিতে, বৃদ্ধার দোষ বাহির হইতে লাগিল,—যে বউমা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন—তিনিই তাহার কার্য্যের স্পষ্ট প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং একান্ত পিসিমাভক্ত প্রিয়নাথ যখন পত্নীর সে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান স্বকর্ণে শুনিয়াও কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতে বিরত থাকিল, তখন পিসিমা বুঝিলেন সংসারে তাঁহার আসন টলিয়াছে এবং সেখানে নূতন গৃহিণী ধীরে ধীরে আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইতেছেন।

পিসিমার হাতে খরচপত্রের টাকা কড়ি থাকিত, বৃদ্ধা এখন আর সে টাকার মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না।

ভাঁড়ারের চাবি কেমন করিয়া মন্ত্র বলে বিরাজের হস্তে বিরাজ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সকলি লক্ষ্য করিল কিন্তু সে দুঃখ করিল না। সে ভাবিল আমার জীবনের যাহা সার্থকতা তাহা সাধিত হইয়াছে, আমি প্রিয়র পুত্রমুখ দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা বেশী সৌভাগ্য কি প্রত্যাশা করিতে পারি? আমার এখন সংসারের আসক্তি হইতে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক।

সূর্য্যদেব দিবসের কর্ম্ম অবসানে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়া যেমন অল্পে অল্পে আপনার রশ্মিরেখাগুলিকে বিহঙ্গ কাকলীমুখরিত তরুশির, প্রস্ফুটিত কমলিনী শোভিত সরসী নীর হইতে প্রতিসংহৃত করিয়া লয়, জীবনের অস্তশিখরে দণ্ডায়মানা এই প্রাচীনা তেমি করিয়া ধীরে ধীরে প্রীতি মমতার পদার্থনিচয় হইতে আপনার আসক্তি রশ্মিগুলি গুটাইয়া লইতে লাগিল।

বিরাজের হৃদয়ে বৃদ্ধার জন্ত যতই ছুরিকা তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতরভাবে শাণিত হইতে লাগিল, বৃদ্ধার অন্তঃকরণে নিস্পৃহ ধর্ম্মের বিমল মোহন মাধুরী ততই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে এখন কেবল দেখিয়া ও ভালবাসিয়া সুখী।

৪

যে পিসিমা একদিন প্রিয়নাথের পূজনীয় দেবতা ছিলেন, যাঁহার পদে ভক্তি অঞ্জলি অর্পণ করিয়া সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত, সেই পিসিমা আজ তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িল। এখন তাঁহার অতি শুভ ইচ্ছার একান্ত সাধু সংকল্পে প্রিয়নাথ কত শঠতার লীলা দেখিতে লাগিল। অবকাশ মত স্ত্রীপুরুষে এ বিষয়ে বিলক্ষণ প্রাণপূর্ণ আলোচনা চলিত। বৃদ্ধা এ সমস্ত নারকীয় জল্পনার বিষয়ে কিছুই জানিত না, সে শুধু জানিত বউমা কেবল গৃহিণী পদ লাভের জন্যই ব্যাকুল। হায়! সরলা প্রাচীনা!!

বউমা ক্রমশঃ সকল কার্য্যেই তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। অকারণে তুচ্ছ কথা তুলিয়া তাহার মনে বেদনা দিতে লাগিলেন, তাহার উপর ঠেস পাড়িয়া কথা বলিতে লাগিলেন, এক কথায় তাহাকে ভাবে ইঙ্গিতে বুঝাইতে লাগিলেন যে তাঁহার গৃহে বৃদ্ধার আর স্থান নাই।

বৃদ্ধা তা বুঝিল। কিন্তু এখন সে কোথায় যাইবে? যাহাকে ভগ্ন জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া সে জীবন পথের প্রান্ত সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাকে এ অন্তিমকালে ছাড়িয়া সে কি প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে? মৃত্যুকালে প্রাণপুত্তলির সে মুখখানি দেখিয়া যাইতে পারিলে মৃত্যু মধুময় হইয়া যাইবে। নচেৎ ইহজন্মের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় পরজীবনের সুখ খণ্ডিত হইতে পারে।

তাই সে এইরূপ প্রকাশ্য অনাদর উপেক্ষা, বিরাগ ও লাঞ্ছনার মধ্যেও সেই শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিল। ভগবানের কাছে দিবারাত্রি প্রার্থনা করিত— "হে ঠাকুর শীঘ্র আমাকে স্থান দাও।"

একদিন প্রায় দিবা দ্বিপ্রহরে, তখনও বৃদ্ধা স্নানাহার করে নাই, হঠাৎ তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিরাজমোহিনী তাহার সঙ্গে অতি রূঢ়ভাবে বচসা সুরু করিলেন। সহিষ্ণুতা অসীম হইলে সুখের হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। বৃদ্ধা তাই বলিল—"বউমা তোমার ঘর তোমার সংসার, আমি মা নৌকায় পা দিয়া আছি, আর আমার মনে কষ্ট দিও না। আমি তোমার কি মন্দ চেষ্টা করেছি?"

প্রিয়নাথ কাছে ছিল; সে স্ত্রীর উকিল হইয়া পিসিকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিল এবং শেষ বলিল—"তোমার জন্যই সংসারে লক্ষ্মীশ্রী নাই। চাকরী করে এতদিন কত টাকা দিলাম, সব উড়িয়ে দিলে; ঘরে এত জিনিস পত্র ছিল তাহার অর্দ্ধেক নাই, আমার ইষ্ট আর তুমি কি করেছ বল? বরং—"

হা ধিক! হা ধিক! প্রিয়নাথ; তোমার এ পাপ রাখিতে স্থান নাই; তোমার উচ্ছৃঙ্খল রসনা দমন কর; চাহিয়া দেখ মাথার উপরে অন্তর্য্যামী তোমার দিকে তাকাইয়া আছেন।

বৃদ্ধা নীরব। সেই দ্বিপ্রহরে তাহার শুষ্ক চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল—"আমার জন্যই সংসারে লক্ষ্মী নাই!!" সে আর মুখে জল পর্য্যন্ত দিতে পারিল না।

সেই রাত্রেই তাহার ভয়ানক জ্বর হইল, বৃদ্ধা এ আঘাত সামলাইতে পারিল না। তিন দিন প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া চতুর্থ দিনে হঠাৎ যেন একটু জ্ঞান লাভ করিল। সে প্রিয়নাথকে ডাকিয়া বলিল —"বাবা প্রিয়, তোমার ছেলেকে একবার আমার বুকে দাও; তুমি আর বউমা আমার কাছে একবার বসো, আমি

জন্মের শোধ তোমাদের দেখে যাই।" কিন্তু দেখিবার আর সময় ছিল না—পরমুহূর্ত্তেই বৃদ্ধার জীবন-প্রদীপ অনন্তের ফুৎকারে নিভিয়া গেল। দম্পতি তদবধি মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন—অলক্ষ্মী বিদায় হইয়া গেল।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

আমাদের শিশু।

বোধ হয় অনেকে জানেন যে আজ কাল বাঙ্গালা দেশে দুই এক বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুগণের মৃত্যু সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে যে যে কারণে শিশুর মৃত্যু ঘটিত তাহার মধ্যে অস্বাস্থ্যকর সূতিকা গৃহ ব্যবহার প্রধানতম ছিল। কিন্তু ইদানীন্তন প্রসবগৃহ পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেকটা ভাল দেখা যায়; অতএব সেই কারণ প্রসূত শিশুনাশ সংখ্যায় আজকাল অনেক কম হইয়া গিয়াছে। তবে সর্ব্বশুদ্ধ মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এত অধিক হইল কেন? আমরা বলি গত ১৫ কি ২০ বৎসরের মধ্যে "শিশুযকৃৎ" Infantile Liver নামক যে নূতন পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে তাহাই এক্ষণে শিশুকুল ধ্বংস করিতেছে। এই পীড়া যে পূর্ব্বে আদৌ ছিল না তাহা নহে। বোধ হয় তৎকালে এবম্বিধ প্রাণবিনাশক যকৃৎ রোগ এত অল্পপরিমাণে দেখা যাইত যে কোন চিকিৎসক সে বিষয়ে কোন বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। আজকাল বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র এই রোগ আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু এই কলিকাতা নগরে ইহার প্রাদুর্ভাব বড় বেশী দেখা যাইতেছে।

ইহার কারণ কি? কারণ নির্দ্দেশ বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার মত থাকিতে পারে; কিন্তু আমার কয়েক জন বহুদর্শী সহব্যবসায়ী যে মত প্রকটন করিয়াছেন, তাহাই স্বকীয় মতের সহিত ঐক্য হওয়াতে এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। শরীর মধ্যে যকৃৎ একটি পরিপাক যন্ত্র বিশেষ এবং যকৃৎ রোগ প্রধানতঃ আহার্য্য দ্রব্যের অস্বাস্থ্যকারিতা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব "শিশুযকৃৎ" যে শিশুগণের আহারের কোন স্বাস্থ্যনাশক ব্যতিক্রম হইতে

উদ্ভূত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে দুগ্ধই শিশুর প্রধান আহার। অবশ্য মাতৃহীন সন্তানগণের কিম্বা যাহাদিগের প্রসূতি চিররুগ্না তাহাদিগের জন্যবিধ খাদ্যের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু তাহাদের কথা এস্থলে পরিত্যাজ্য। জন্মের পর কয়েক মাস প্রধানতঃ তাহারা মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া থাকে. কিন্তু ক্রমে ক্রমে গোদুগ্ধ অল্প অল্প করিয়া অভ্যাস করান হয়। কদাচিৎ ছাগদুগ্ধ বা গর্দ্দভদুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তৎসংখ্যা অল্প। এই মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ উভয়েই আজকাল স্বাস্থ্য বিনাশক নানা দোষ দুষ্ট হইয়া থাকে। সকলেই স্বীকার করিবেন. কলিকাতা নগরে আজকাল এই দুই প্রকার শিশু-খাদ্যই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য শিশু-যকৃৎ পীড়া যে সহরে এত অধিক দেখা যাইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

কলিকাতায় বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ আহরণ করা যে কতদূর কষ্টসাধ্য তাহা বুঝাইবার জন্য আমাকে পরিশ্রম করিতে হইবে না। গাভীরা কখন বিস্তৃত ক্ষেত্রে পদচারণ ও বায়ু সেবন করিতে পায় না এবং তাহাদিগের রক্ষকগণ নানা প্রকার অখাদ্য ও অল্প খাদ্য দিয়া কোন প্রকারে তাহাদিগকে জীবিত রাখে। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধব্যবসায়িগণ "ফুকা" দিয়া দুগ্ধকে একেবারে অপকৃষ্ট করিয়া ফেলে। শিশুকে এই দুগ্ধই খাইতে হয়, সুতরাং পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মাতৃদুগ্ধও দূষিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য মাতৃগণই দায়ী। এখন অধিকাংশ বঙ্গরমনী চিররুগ্না। কলিকাতার অন্তপুরিকাগণ কোন না কোন একটা পীড়ার জ্বালায় অনবরত জর্জ্জরিত হইয়া আছেন। অজীর্ণ, অম্ল রোগ, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি কোন একটা পীড়া কলিকাতা-বাসিনী জননীর শরীরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। কাহারও দেহে সব কয়টি একত্রে বিরাজ করিতেছে। এরূপ প্রসূতির দুগ্ধ কি কখন স্বাস্থ্যকর হইতে পারে?

বঙ্গনারীর শরীরভঙ্গের কারণ কি সেই বিষয় অনুসন্ধান করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। তবে কর্ত্তব্যানুরোধে সংক্ষেপে কতকগুলি উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন।

(১) পরিশ্রম কাতরতা বা অত্যধিক পরিশ্রম। যাঁহারা মূল্য দিয়া সন্তানের লালন পালন, বা অন্যান্য গৃহকর্ম্ম ক্রয় করিতে পারেন তাঁহাদিগের গৃহিণীরা সেই সকল পরিশ্রম সাপেক্ষ কার্য্যে একেবারে উদাসীন থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের শরীরে প্রভূত মেদ সঞ্চিত হইয়া আরও আলস্য পরায়ণ করিয়া তুলে। অসমর্থ ব্যক্তিগণের গৃহে সমস্ত সাংসারিক কার্য্য গৃহিণীগণকেই করিতে হয়, তাহাতে পরিশ্রম বাহুল্য হইয়া পড়ে। তাঁহাদের শরীর ক্রমশঃ অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া অনেক রোগের আকর হইয়া উঠে। প্রত্যহ যথাযোগ্য পরিশ্রম করিলে শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রীতিমত রক্তচালনা হইয়া থাকে; এবং তাহাতে সুপরিপাক, সুনিদ্রা প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক সাহায্য হইয়া থাকে।

(২) বিলাসিতা এবং অনিয়মিত জীবন যাপন। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই গৃহে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। থিয়েটারের অধ্যক্ষগণ বলিয়া থাকেন যে আজকাল তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দর্শকের অধিক সমাগম হইয়া থাকে। চা, সাবান, লেমনেড বরফ ইত্যাদি ঘরে ঘরে বর্ত্তমান। অনেক মহিলা হাস্য পরিহাস ও বাজে গল্পে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরিত থাকেন এবং আহারাদির কোন সাময়িক নিয়ম রাখেন না। এবম্বিধ নানা প্রকারে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অধুনা বিলাসিতা বড়ই বাড়িয়াছে।

(৩) বাঙ্গালাভাষায় রাশি রাশি জঘন্য উপন্যাস প্রচার এবং নারীগণ কর্ত্তৃক উহার অতিরিক্ত পাঠ। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা পুরুষদিগের দোষই অধিকতর বলিয়া বোধহয়। পুরুষগণ বাহির হইতে ঐ পুস্তকগুলি আনিয়া না দিলে তাঁহাদিগের পাঠ করিবার সচরাচর কোনও উপায় বা ঔৎসুক্য থাকে না। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থলে যেসকল সাধারণ পুস্তকাগার আছে তাহার কার্য্য-বিবরণী দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সকল বিষময় পুস্তক অন্যান্য সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে

পঠিত হয়; সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা "মেয়েদের জন্য" ঐ সকল উপন্যাস লইয়া থাকেন। এই গ্রন্থগুলি নারীগণের সহজ নম্য হৃদয়ে কতদূর বিকৃতভাব উপস্থিত করে এবং তদ্বারা প্রতিক্রিয়াজনিত কতদূর স্বাস্থ্যহানি হয় তাহা অনেকে বুঝেন না। মাতা ক্রোধান্বিত হইলে তাঁহার দুগ্ধের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তাহা পান করিয়া শিশুর পীড়া জন্মে ইহা বোধহয় সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইরূপ মানসিকবৃত্তিনিচয় উচ্ছৃঙ্খলভাব ধারণ করিলে জননীর স্বাস্থ্য বিকৃত হইয়া অপকারী দুগ্ধের সঞ্চার হয় একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। মানসিক স্বাস্থ্যের সহিত শারীরিক স্বাস্থ্যের সবিশেষ সম্বন্ধ। কেবল উপন্যাস পড়িবার জন্য একটু আধটু পড়িতে শিখা অপেক্ষা না শিখাই শ্রেয়স্কর।

(৪) কলিকাতার বর্দ্ধনশীল অস্বাস্থ্যকারিতা। নগরটী ক্রমে জনাকীর্ণ হওয়াতে অনেকের গৃহ এত সঙ্কীর্ণ যে, পুরবাসিগণের একটু হাঁফ ছাড়িবার স্থান নাই। চতুর্দ্দিকে লোকালয় বেষ্টিত হওয়াতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা তাঁহাদের অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। এতদ্ব্যতীত অনেকে জানালা কবাট থাকা সত্বেও তাহার উপরে স্তরে স্তরে নানাবিধ গৃহসামগ্রী সাজাইয়া চিরকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া থাকেন। আমরা ব্যবসায় বশতঃ অনেক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া থাকি বলিয়া এইরূপ ঘটনা অনেক বাটীতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং উপদেশ দিয়া ঐ সকল বায়ুপথ উন্মুক্ত করাইয়াছি।

(৫) অল্পরোগে অবহেলা। ইহা আমাদিগের স্ত্রীজাতির সাধারণ দোষ। পীড়ার প্রথম সূচনা হইলে অধিকাংশ স্থলে অনায়াসেই তাহা সারিয়া যায়; কিন্তু ইহারা তাহা অবহেলা করিয়া পুরুষ গণের নিকট গোপনে রাখেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় যথারীতি স্নানাহার করিয়া থাকেন। উহার ফলস্বরূপ পরিশেষে অর্থনাশ, কষ্ট ও লাঞ্ছনা সবই যথেষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা একটা চিরন্তন পীড়া দেহের মধ্যে গুপ্তভাবে শোণিত শোষণ করিতে থাকে।

উপরে যে কয়েকটি কারণ মোটামুটি রূপে লিপিবদ্ধ হইল তাহার দ্বারাই আমাদের মহিলাগণের ক্রমশঃ স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। তন্নিবন্ধন তাহাদের দুগ্ধ অস্বাভাবিক ও দূষিত হইয়া শিশুগণের যকৃৎ রোগ আনয়ন করিতেছে। কোন কোন চিকিৎসক এতদ্দেশীয় নারীগণের অল্প বয়সে মাতৃত্ব গ্রহণকে এই রোগের একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু যাঁহারা উপযুক্ত বয়সে সন্তান প্রসব করিয়াছেন তাঁহাদিগের শিশুগণের মধ্যেও আমি এই পীড়া অনেক দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং বাল্য মাতৃত্বই ইহার অন্যতম হেতু স্বরূপ গ্রহণ করিতে আমার ভরসা হয় না। এতৎসম্বন্ধে আর একটী সত্য উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। নিম্ন শ্রেণীর লোকের সন্তানদিগের মধ্যে এই যকৃৎ রোগ প্রায় দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে তাহাদের স্ত্রীদের মধ্যে এখনও বাবুয়ানা প্রবেশ লাভ করে নাই। সভ্যতার নিম্নতর সোপানে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয় তাহারা এখনও অকৃত্রিম স্বাস্থ্যের অধিকারিণী আছেন।

এই রোগের প্রথম সূত্রপাত দৃষ্ট হইবা মাত্র রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন। যখনই শিশুর মল কঠিন এবং মৃত্তিকাবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ দেখা যাইবে কিম্বা একটু একটু জ্বর উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস ধরিয়া অনুভূত হইবে, তখনই যকৃৎ রোগ সন্দেহ করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। সেই সময় হইতেই তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া শিশুর আহারের সুব্যবস্থা করিয়া লওয়া উচিত। চিকিৎসা সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে। যাঁহার যাহাতে বিশ্বাস তিনি সেইরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিবেন, কেননা লোকের বিশ্বাসের উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। চিকিৎসা যেরূপই করুণ না কেন, পীড়াটী অনেকস্থলে সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কি প্রতিকার নাই?

স্বদেশীয়া জননীগণ! ইহার প্রতিকার আপনাদেরই হস্তে বিন্যস্ত রহিয়াছে। আপনাদের সকল সুখের আকর, সকল স্নেহের কেন্দ্রভূমি গৃহ দেবতাগণ আপনাদিগের শতসহস্র বন্ধন অবাধে ছিন্ন করিয়া অকালে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। ইহার নিরাকরণ আপনারা

না করিলে আর কে করিবে? উহা আপনাদেরই কর্ত্তব্য। আপনারা যে অমৃতধারাসদৃশ দুগ্ধ দিয়া প্রিয়তম শিশুদিগের জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহার উন্নতি সাধন করিতে স্বকীয় জীবন সংযত ও নিয়মিত করুন; পূর্ণস্বাস্থ্য লইয়া আমাদিগের ঘরে ঘরে জগদ্ধাত্রীরূপে বিরাজিত থাকুন। স্তিমিত প্রদীপ আবার জ্বলিয়া উঠিবে; মায়ের সন্তান হাসি মুখে মায়ের কোলেই আবার খেলিতে থাকিবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শেঠ এল্ এম্ এস্।

শ্রীমতী আনন্দী বাঈজোশী।

(৩)*

গোপাল রাওয়ের ব্যবহার অন্য বিষয়ে যেরূপই হউক, একটী বিষয়ে তিনি অতীব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। স্বদেশীয় রমণী সমাজের মঙ্গল কামনা তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ে গভীর ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক সংস্কারকেরা যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া ছিলেন, তিনি তাহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। মৌখিক আন্দোলন অপেক্ষা কার্য্যতঃ স্ত্রীজাতির হিত সাধনে তাঁহার অধিকতর মনোযোগ ছিল। এ বিষয়ে স্বীয় সহধর্ম্মিনীর বিশেষ সহায়তা লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ধীর ও অবিচলিত ভাবে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিয়া আপনার অভীষ্ট সাধনের উপযোগিনী করিয়া লইতে ছিলেন। দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার এইরূপ সংস্কার হইয়াছিল যে, উপযুক্ত চিকিৎসায়িত্রীর অভাবে ভারতীয় মহিলাকুলকে পদে পদে যেরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, আর কিছুর অভাবে সেরূপ হয় না। এই কারণে, অপর কোনও বিষয় বিশেষে লক্ষ্য না করিয়া সেই অভাব মোচনের জন্য তিনি নীরবে স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া ছিলেন। শ্রীরামপুর হইতে আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে যে সকল পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহাতে এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি পত্রে তিনি বলিতেছেন,—"চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমাদিগের দেশের একটি প্রধান অভাব দূর করিবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। স্বামীর উপদেশ গুণেই যে এ বিষয়ে আমার এইরূপ প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে একথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। তাঁহার উপদেশ আমার হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে যে, তাহা আর কিছুতেই অপনোদিত হইবার নহে। আমার এ সংকল্প কিছুতেই বিচলিত হইবে না।"

এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই মহারাষ্ট্রীয় দম্পতি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকা গমনের সংকল্প করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ পূর্ব্বক দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী চিকিৎসা প্রণালীর প্রবর্ত্তনকল্পে সহায়তা করাও আনন্দী বাঈয়ের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। অর্থাভাবে তাঁহাদিগের সংকল্প অনেক দিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া গোপাল রাওয়ের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিলে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া না গিয়া আমেরিকা যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁহার আমেরিকা যাত্রা কিছু দিনের জন্য স্থগিত রহিল।

শ্রীরামপুরে কিছুদিন অবস্থানের পর গোপাল রাও সস্ত্রীক আমেরিকা গমনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দুই বৎসরের অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত আমেরিকায় থাকিবার সুবিধা হইলে দুইবৎসর আনন্দী বাঈর চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইবে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ছুটি দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার সংকল্পে বাধা পড়িল। তথাপি গোপাল রাও বিচলিত হইলেন না। বহু চিন্তার পর একদিন

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাব দ্বয়ে লেখকের অসাবধানতা ও মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ কয়েকটী ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চাল্লিখিত দুইটী নির্দ্দেশ আবশ্যক যথা,—পঞ্চম পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ২৭শ পংক্তিতে "গোপালরাও" স্থলে "গণপৎরাও" এবং ৪০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ৯ম পংক্তিতে "এতএব" স্থলে "উত্তরত্য" হইবে।

সহসা আনন্দী বাঈকে বলিলেন.—"আমি দেখিতেছি, আর বৃথা সময় নষ্ট করায় কোনও ফল নাই। অতএব তুমি একাকী আমেরিকায় গমন কর। আমি কিছুদিন পরে তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করব।"

স্বামীর কথা শুনিয়া আনন্দীবাঈ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গোপাল রাও বলিলেন—"এ পর্য্যন্ত কোনও ব্রাহ্মণপত্নী একাকিনী বিদেশে গমন করেন নাই। অতএব তুমি এ বিষয়ে সকলের পথ প্রদর্শক হও। স্বদেশীয় রীতিনীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া স্বীয় ব্যবহার গুণে আমেরিকা বাসীকে হিন্দু রীতিনীতির পক্ষপাতী কর। স্ত্রীলোকের দ্বারা কোনও মহৎ কার্য সাধিত হয় না বলিয়া এদেশে যে প্রবাদ আছে. তুমি তাহা উপকথায় পরিণত কর। এ দেশের অনেক সংস্কারক নারীজাতির মঙ্গলের জন্য অনেক মৌখিক আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কাহারও দ্বারা কিছুই ঘটিয়া উঠিতেছে না। আমার ইচ্ছা, তুমি সেই দুরূহ কার্য্য অংশত সম্পাদন করিয়া সকলের উদাহরণ স্থল হও।"

স্বামীর উপদেশামৃত সিঞ্চনের ফলে আনন্দী বাঈর হৃদয়ক্ষেত্রে স্বদেশ হিতৈষণার বীজ ইতঃপূর্ব্বেই উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই কারণে স্বামীর এই আদেশ শ্রবণ মাত্র তিনি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহার পর ভাবী বিরহের ও বৈদেশিক দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া তিনি কয়েকবার বিচলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু ভগবানের করুণায় দৃঢ় বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য পালনের অটল বাসনা বশতঃ তিনি চিরপোষিত সংকল্পের পরিহার করিলেন না। এ বিষয়ে শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পতিবিচ্ছেদ সম্ভাবনার উদ্বেগ, স্বামীর অস্বচ্ছলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ, তাঁহার আমেরিকা গমনে আত্মীয় বন্ধুগণের আপত্তি ও তাঁহার পাতিব্রত্যনাশের আশঙ্কা, তাঁহার দৃঢ় চিত্ততা, দেশ ও ভগিনীগণের কল্যাণ সাধনে উৎসাহ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একটি পত্রে তিনি স্বীয় শেষ সিদ্ধান্ত এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে কার্য্যের জন্য আমেরিকা যাইতেছি, তাহা যদি সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইব। যদি অকৃতকার্য্য হই, তবে ভারতে আর কাহাকেও মুখ দেখাইব না। প্রাচীন কালের হিন্দুরমণীগণ কিরূপ বুদ্ধিমতী, শৌর্য্যশালিণী ও পরোপকারপরায়ণা ছিলেন, তাহা আমি জানি। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি তাঁহাদিগের নাম কখনই কলঙ্কিত করিব না। যেরূপে হউক আমি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিব। আমার বিশ্বাস, কেহ আমার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। কারণ, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কাহারও ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে পারে না। আমরা সকলেই যখন পরমেশ্বরের সন্তান, তখন কেন আমি বিপন্ন হইব? আমাকে আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" মরি কিম্বা বাঁচি, আমি সংকল্পচ্যুত হইব না। * * * * * আমি যাঁহার বাটীতে থাকিব, তিনি যেন আমাকে কন্যার মত দেখেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমাকে তথায় অবস্থানকালে স্বহস্তে পাক করিতেই হইবে। তাহাতে খরচও কিছু কম পড়িবে।" এই সময়ে সেই বীর বালিকার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র!

গোপাল রাও বোম্বায়ের থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। এই কারণে আনন্দ বাঈর আমেরিকা গমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কর্ণেল অল্‌কট মহোদয় তাঁহাকে আমেরিকার একজন বিচারপতির নামে একটি অনুরোধ পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার পর উপযুক্ত সহযাত্রীর অনুসন্ধানে ও অপর নানাকারণে বহু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এদিকে আনন্দী বাঈ আমেরিকা যাইবেন, এই কথা সংবাদ পত্রে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা নানা প্রকারে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অনেক হিতৈষী বন্ধু এই সময়ে তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আনন্দী বাঈ কিছুতে বিচলিত হইলেন না।

আনন্দী বাইর আমেরিকা গমনের কারণ সম্বন্ধে

অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রকারের প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য আনন্দ বাঈ একটি বিদ্যালয়ে সভা আহূত করিয়া স্বীয় বক্তব্য ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতাকারে প্রকাশ করেন। সে বক্তৃতা সে সময়ের অধিকাংশ দেশীয় ও ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া ব্রাহ্মণ বালিকার মুখে প্রকাশ্য সভায় ইংরাজী ভাষাতে সেই অনর্গল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সে দিনকার বক্তৃতায় আনন্দী বাঈ যে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিলেন, সেগুলি এই,—

১। আমি কেন আমেরিকায় যাইতেছি?

২। ভারতবর্ষে থাকিয়া কি শিক্ষা লাভ অসম্ভব?

৩। আমি একাকিনী যাইতেছি কেন?

৪। আমি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে সামাজিকগণ আমায় জাতিচ্যুত করিবেন কিনা?

৫। যদি বিদেশে আমার কোনও বিপদ ঘটে, তাহা হইলে আমি কি করিব?

৬। আজ পর্য্যন্ত কোনও রমণী যে কার্য্য করেন নাই, সে কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করিতেছি কেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, "এ দেশীয় মহিলাসমাজের যত প্রকার অভাব আছে, তন্মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ রমণীর অভাবই সর্ব্ব প্রধান। এ দেশের অনেক সভাসমিতি স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, ও শিল্পকলা বিজ্ঞানাদির প্রবর্ত্তনের যত্নশীল হইয়াছেন; কিন্তু দেশীয় রমণীদিগকে আমেরিকার ন্যায় সভ্যদেশে প্রেরণ পূর্ব্বক চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিনী করিয়া তাহাদিগের দ্বারা এদেশে স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যার বিস্তার বিষয়ে কেহই মনোযোগ করেন নাই। ইউরোপীয় বা আমেরিকা দেশীয় চিকিৎসয়িত্রীরা এদেশীয় রীতি নীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞা ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা এদেশীয় রমণীর চিকিৎসা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ভারতীয় মহিলাকুলের এই গুরুতর অভাব দূর করিবার জন্য আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমেরিকায় ডাক্তারী শিখিতে যাইতেছি।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—মান্দ্রাজ ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি ভাল ডাক্তারি শিখিবার কলেজ নাই। অন্যত্র যাহা আছে, তাহাতে ধাত্রীবিদ্যার অধিক আর কিছুই শিখান হয় না। মান্দ্রাজেও হিন্দুরমণীর শিক্ষার কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। আমিও ডাক্তারি শিখিবার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার পক্ষে এদেশে শিক্ষার কোনও স্থানে সুবিধা নাই। বোম্বাই কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে ছুষ্ট ও ইতর জনের তাঁহার প্রতি পরিহাস বিদ্রূপাদি বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে কিরূপ ব্যথিত করিত, অনেক ভদ্রনামধারী ব্যক্তিও যেরূপে তাঁহার অলীক কুৎসা রটনা করিত, এই প্রসঙ্গে তিনি তাহার বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, আমেরিকায় এ সকল বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীয় স্বামীর দারিদ্র্যের উল্লেখ করিতে বাধ্য হন। তদ্ভিন্ন তাঁহার শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও অল্প বয়স্ক দেবরাদির ভরণ পোষণের ভার যখন তাঁহার স্বামীর উপরই ন্যস্ত ছিল, তখন তাঁহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমেরিকায় গমন গোপাল রাওয়ের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত কার্য্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন না।

আমেরিকা গমন হেতু সামাজিক দণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমি যদি সেখানে সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবে অবস্থান করি তাহা হইলে কেন আমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি বেশ-ভূষায় ও আচার ব্যবহারাদি সর্ব্ববিষয়ে আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রদর্শিত মার্গের অনুসরণ করিব, সংকল্প করিয়াছি। যেখানেই গমন করি না কেন, আমি যে হিন্দু রমণী ইহা আমি কখনও ভুলিব না। ইহার পরও যদি কেহ আমায় সমাজচ্যুত করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা এখনই তাহা করিতে পারেন। সেজন্য আমি ভীত নহি।"

পঞ্চম প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি বলেন, বিপদ স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র সকলেরই ঘটিয়া থাকে, সেজন্য দেশ হিতকর অনুষ্ঠানে কাহারও বিরত হওয়া উচিত নহে।

শেষ প্রশ্নের উত্তরে শিবি ও ময়ূরধ্বজ রাজার উপাখ্যান বিবৃত করিয়া তিনি বলেন, বহু জন সমাজের হিতের জন্য ব্যক্তিগত শ্রম স্বীকারে পশ্চাৎপদ হওয়া বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে সমাজে বাস করিতেছি ও অহরহঃ যে সমাজের নিকট হইতে নানা প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি, সেই সমাজের হিতসাধনের জন্য, প্রাপ্ত উপকারের পরিশোধ করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। অপরে সে কর্ত্তব্য পালনে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া আমাকেও কি তাহাই করিতে হইবে?"

শ্রীরামপুরের কলেজেও তিনি এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করেন। ইহার পরে শিক্ষিত সমাজের অনেকে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। ডাক বিভাগের ডিরেক্টর এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দী বাঈকে সাহায্য স্বরূপ এক শত টাকার একটি নোট পাঠাইয়া দেন। আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের কলিকাতাস্থিত রাজদূতও তাঁহাকে আমেরিকার দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামে দুই খানি অনুরোধ পত্র প্রদান এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রশংসা পূর্ব্বক আমেরিকার একটী সংবাদ পত্রে তাঁহার সচিত্র জীবন চরিত লিখিয়া তাঁহার প্রতি আমেরিকাবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন। ডাক্তার থোবার্ণ নামক জনৈক কলিকাতা বাসী আমেরিকান মিশনরীর নিকট হইতেও আনন্দী বাঈ তাঁহার আমেরিকাস্থিত বন্ধুবান্ধবের নামে অনুরোধ পত্র প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল আনন্দী বাঈর আমেরিকা যাত্রার দিবস নির্দ্ধারিত হইল। প্রথমতঃ গোপাল রাও তাঁহার সহিত এডেন বা নিতান্ত পক্ষে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গমন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ ও অবকাশের অভাবে তাঁহাকে সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করিতে হইল। পরিশেষে মিসেস জনসন নাম্নী একটি মহিলা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। ফিলেডেল্ফিয়ার "ওমেন্‌স কলেজ" নামক চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগের সকলেই রমণী; সেখানে পুরুষের সঞ্চার মাত্র নাই। আনন্দী বাঈ সেই বিদ্যালয়ে গিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন, সংকল্প করিলেন।

অতঃপর যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। আমেরিকায় এদেশীয় পদার্থ দুর্লভ বলিয়া তিনি প্রচুর পরিমাণে চুড়ি, খাঁচুলী প্রস্তুত করিয়া দেশীয় কাপড়, মারাঠী সাড়ী ও উৎকৃষ্ট দেশীয় সিন্দুর প্রভৃতি সঙ্গে লইলেন। আনন্দী বাঈ বৈদেশিক দ্রব্য ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই কারণে তাঁহাকে তিন বৎসরের ব্যবহারের উপযোগী সমস্ত দ্রব্যই এখান হইতে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। আমেরিকায় এখানকার অপেক্ষা শীতের প্রকোপ অধিক। শুদ্ধ কঞ্চুলিকা দ্বারা তথায় শীত নিবারিত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আনন্দী বাঈ জামা প্রস্তুত করিবার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের "খেসা" প্রভৃতির ন্যায় অতি কর্কশ ঊর্ণ বস্ত্রাদি বহু পরিমাণে ক্রয় করিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসীকে দেখাইবার জন্য তিনি রামচন্দ্র, শঙ্কর, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর চিত্রাদিও সঙ্গে লইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার আমেরিকাগমনে বর্ত্তমানকালের আবিলতা ও বিলাসিতার লেশ মাত্র ছিল না। তিনি আশ্রমচারিণী তপস্বিনী ঋষিকন্যার ন্যায় জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া অতি পবিত্রভাবে খৃষ্ট রাজ্য আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। যৌবনে চিত্তের এরূপ সংযম অধুনা বড় দুর্লভ।

৬ই এপ্রিল রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া আনন্দী বাঈ সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর শয্যাগত হইলেন। গোপাল রাওয়ের সে রজনীতে নিদ্রাকর্ষণ হইল না। সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী স্ত্রীকে দেশের ও তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য সমুদ্র পারে নির্ব্বাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি ভাল কি মন্দ করিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ সর্ব্বস্ব দান করিয়া তিনি যাহাকে এতদিন পালিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছেন, অপরিচিত দূর দেশে কে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তিনিই বা কিরূপে প্রিয়তমার বিরহে একাকী কালযাপন করিতে পারিবেন প্রভৃতি বিবিধ চিন্তায় সমস্ত রাত্রি তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছিল। সে যাহা হউক, গির্জার ঘড়িতে ঢঙ্ ঢঙ্ করিয়া তিনটা বাজিবা মাত্র তিনি আনন্দী বাঈর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

আনন্দী বাঈ শয্যার উপর উঠিয়া বসিবামাত্র প্রবল শোকাবেগে গোপাল রাওয়ের কণ্ঠ রোধ হইল। মুহূর্ত্ত পরে প্রিয়তম স্বামীর ও মাতৃকল্পা জন্মভূমির শান্তি স্নিগ্ধ ক্রোড় হইতে বহুদূরে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে ভাবিয়া আনন্দী বাঈর চিত্তও উদ্বেল হইল। তাঁহারও কথা কহিবার শক্তি মাত্র রহিল না। তিনি শোক গম্ভীর চিত্তে আত্মীয় বন্ধুগণকে অভিবাদন করিয়া স্বামীর সহিত শকটারোহণে বন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে উভয়েরই নিস্পন্দ দৃষ্টি পরস্পরের মুখ মণ্ডলের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিদায় সম্ভাষণের জন্য বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না।

বন্দরে উপস্থিত হইয়া আনন্দী বাঈ ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। মিসেস জন্সনের হস্তে স্বীয় পত্নীকে সমর্পন করিয়া গোপাল রাও বলিলেন, "স্বল্প ব্যয়ে অথচ যথাসম্ভব সুখ স্বচ্ছন্দের সহিত যাহাতে আমার স্ত্রী আমেরিকায় পৌছিতে পারেন, আপনি তাহার চেষ্টা করিলে আমি সুখী হইব।" এই কথা শুনিয়া মিষ্টার জন্সন অতীব উদ্ধত ভাবে উত্তর করিলেন,—"তাহা হইতে পারে না। আমার স্ত্রীর সহিত থাকিলে তোমার স্ত্রীকে আমার স্ত্রীর তুল্য অর্থ ব্যয় করিতে হইবে!" এই উত্তরে গোপাল রাও বজ্রাহত হইলেন। কিন্তু তখন আর প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ছিল না। সুতরাং তিনি আনন্দী বাঈকে সতর্ক করিয়া দিয়া পরিশেষে বলিলেন,—"করুণাময় সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের উপর তুমি নির্ভর করিয়া থাকিও।"

অতঃপর আর সেখানে দাঁড়াইতে না পারিয়া গোপাল রাও অশ্রুমোচন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে আনন্দী বাঈর নিরুদ্ধ শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রবল অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত ও বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত হইতে লাগিল। ষ্টীমার যতক্ষণ দৃষ্টি পথের বহির্ভূত না হইল, ততক্ষণ তাঁহার অশ্রুপ্লুত দৃষ্টি গোপাল রাওয়ের প্রতি স্থাপিত ছিল। তিনি অন্তর্হিত হইবার পরও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দী বাঈ চিত্রার্পিতার ন্যায় গোপাল রাওয়ের ধ্যানে নিমগ্না ছিলেন!

এইরূপে দেশের হিতকার্য্যে আপনার প্রাণের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন করিয়া গোপাল রাও শূন্য হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর তাঁহার অবস্থা যেরূপ হইল, তাহা সীতা দেবীর নির্ব্বাসনকারী রামচন্দ্রের সহিত সম্পূর্ণরূপেই তুলনীয়। তিনি তিন মাসের ছুটী লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার চিত্ত এরূপ শোকবিদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি কোনও স্থানে দুই দিনের অধিক অবস্থান করিতে পারেন নাই।

এদিকে ষ্টীমারে আরোহণের পর আনন্দী বাঈর ঘোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তিনি একে প্রিয়জনের বিরহে ও অপরিচিত দেশের দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন, সমুদ্র পীড়ায় তাঁহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর মিসেস জন্সনের দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহাকে ঘোরতর নির্য্যাতিত হইতে হইল। মিসেস জন্সন মিশনরি-রমণী, এদেশে খৃষ্ট ভক্তি প্রচারের জন্য স্বামীর সহিত আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এদেশের কতজনের হৃদয় খৃষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা জানি না; কিন্তু তিনি আনন্দী বাঈকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য যেরূপ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে মিশনরিদিগের প্রতি অভক্তির সঞ্চার হয়। ষ্টীমারে অবস্থান কালে তিনি প্রথমে মিষ্ট উপদেশ, তাহার পর প্রলোভন এবং পরিশেষে তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা অসহায়া আনন্দী বাঈকে স্বধর্ম্মত্যাগ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, আনন্দী বাঈ কিছুতেই স্বধর্ম্মত্যাগে স্বীকৃত হন নাই!

ইহার পর অন্য প্রকার প্রলোভনের ও বিপদের সূত্রপাত হইল। সেই ষ্টীমারের ইঞ্জিনীয়ার সাহেব মিসেস জন্সনের সহায়তায় আনন্দী বাঈকে বিপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাপিষ্ঠ তাঁহাকে একাকিনী দেখিলেই নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার তোষামোদে প্রবৃত্ত হইত এবং তাঁহাকে নিম্নতলে গিয়া এঞ্জিন প্রভৃতি যন্ত্রাদি দর্শনের জন্য অনুরোধ করিত। আনন্দী বাঈ তাহার অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রার্থনায় অমনোযোগ

করিলে মিসেস জন্সন তাঁহাকে তিরস্কার এবং ষ্টীমারের যন্ত্রাদি দেখিতে যাইবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতেন! এই কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ার তাঁহাকে একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত বহুমূল্য ঘড়ি উপহার দিবার প্রস্তাব করিল। আনন্দী বাঈ তাহারও প্রত্যাখ্যান করিলেন।

আনন্দী বাঈকে এইরূপ অদম্য দেখিয়া মিসেস জন্সন তাঁহার প্রতি অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সময় হইতে আনন্দী বাঈর প্রতি তাঁহার উপেক্ষা বৃদ্ধি পাইল। ষ্টীমারে অবস্থান কালে আনন্দী বাঈ দন্ত রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহাকে কয়েক দিন সম্পূর্ণ অনাহারেই কালযাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কঠোর হৃদয়া জন্সন রোগের সময়ে একদিনের জন্যও তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হন নাই। ষ্টীমারস্থিত অপর শ্বেতাঙ্গি মহিলারাও তাঁহারই পন্থানুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইঁহারা তাঁহার সহিত চাকরাণীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন! তিনি অখাদ্য ভক্ষণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া লাঞ্ছিত করিতেও বিরত হইতেন না। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের দুই একজন আনন্দী বাঈর প্রকোষ্ঠ অধিকার পূর্ব্বক তাঁহাকে ডেকের উপর উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করিতেও বাধ্য করিতেন। এইরূপ নানাপ্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও আনন্দী বাঈ যখন তাঁহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্ভাব প্রকাশ করিলেন না, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিল। কিন্তু মিসেস জন্সনের প্রকৃতির কিছুতেই পরিবর্ত্তন ঘটিল না!

ষ্টীমারে অবস্থান কালে আনন্দী বাঈ প্রত্যহ ২।৩টি আলু ভিন্ন প্রায় আর কিছু খাইতেন না। সে যাহা হউক, তিনি ১০ই মে লণ্ডন ও ১৬ই মে লিভারপুলে উপস্থিত হন। তথায় দুই এক দিন অবস্থানের পর তিনি আমেরিকাগামী ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। মিসেস জন্সন এখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। ষ্টীমার আমেরিকার নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি আনন্দী বাঈকে বলিলেন, "মিসেস জোশী! তোমার স্বামী তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। একারণে মিসেস কার্পেণ্টারের তোমার উপর কোনও অধিকার নাই। আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের নিকট রাখিতে পারি।" ইহার পর তিনি মিসেস কার্পেণ্টারকে আনন্দী বাঈর নিকট অতীব অসচ্চরিত্রা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। আনন্দী বাঈ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাকে চোর, দুষ্ট, অসভ্য, ও খুনী প্রভৃতি বিবিধপ্রকার কটুবাক্যে ব্যথিত করিয়াছিলেন। বোষ্টন নগরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মিসেস জন্সন ইহার পরও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল নির্য্যাতনের কথা আনন্দী বাঈ বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বামীকে জ্ঞাপন করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, অনেক পত্রেই তিনি মিসেস জন্সনের সাধারণ ভাবে প্রশংসাই করিয়াছেন। আমেরিকায় পৌছিবার পর বহুদিন পরে তিনি একটি পত্রে প্রসঙ্গ ক্রমে স্বীয় স্বামীকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—

"আজ পর্য্যন্ত যে কথা আপনাকে জ্ঞাপন করি নাই, অদ্য তাহা জানাইতেছি। মিসেস জন্সনের দুর্ব্যবহারের বিষয় অনেকবার আপনাকে বিস্তারিতরূপে লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কয়েকবার লিখিতে বসিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথা লিখিতে আমার এত কষ্ট হইত যে, অনেকবার অর্দ্ধ লিখিত পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি এবং অশ্রু মোচন করিয়া বহুক্ষণ পরে চিত্তকে শান্ত করিতে হইয়াছে। তথাপি সে বিষয়ের আভাস দিবার জন্ম সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি।"

বলা বাহুল্য, এই পত্রেও তিনি সকল কথা লিখিতে পারেন নাই। ফলতঃ বহুপ্রকারে নির্য্যাতন হইয়াও আনন্দী বাঈ পরনিন্দা বিষয়ে মূক ছিলেন।

যথা সময়ে আনন্দী বাঈ রোশেলের নিকটবর্ত্তী বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রত্যুদগমনের জন্ম শ্রীমতী কার্পেণ্টার বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আনন্দী বাঈ ষ্টীমার হইতে অবতীর্ণ হইলে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তাঁহারা তথা হইতে বাষ্পীয় শকট যোগে রোশেল

অভিমুখে যাত্রা করেন। এই প্রথম সাক্ষাৎকার কালে আনন্দী বাঈর ব্যবহার দেখিয়া শ্রীমতী কার্পেণ্টার নিম্ন লিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"আনন্দী বাঈ কখনও আবশ্যকের অতিরিক্ত কথা কহেন না। তিনি নিতান্ত স্বল্পভাষীও নহেন। তাঁহার ন্যায় গাম্ভীর্য্য অনেক বর্ষীয়সী রমণীর মধ্যেও দুর্লভ। এরূপ অল্প বয়সে এতাদৃশ গাম্ভীর্য্য অন্যত্র অসম্ভবপ্রায় বলিয়াই মনে হয়। আনন্দী বাঈর সহিত যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তিনি অন্যান্য চপলপ্রকৃতি বালিকার ন্যায় গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন; অথবা প্রত্যেক নবদৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া আমাকে বিরক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। তিনি অতি গম্ভীরভাবে গাড়ীতে বসিয়াছিলেন। অনেকবার আমার মনে হইত যে, এইবার তিনি আমায় প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি আমায় কোনও বস্তুর সম্বন্ধে আদৌ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাঁহার বুদ্ধির স্থূলতা বা জিজ্ঞাসাবৃত্তির অভাব যে ইহার কারণ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি পরে যে সকল কথা আমায় বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি বুঝিলাম যে তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে এই অজ্ঞাত পূর্ব্ব দেশের অনেক ব্যাপারেই কার্য্যকারণ দৃষ্টি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অতীব শান্তভাবে সমস্ত বিষয়েই সুক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে আসিবার পর নিত্য নূতন পদার্থের রীতিনীতির দর্শন করিয়াও তিনি কখনও সে বিষয়ে প্রশ্ন পূর্ব্বক আমাকে বিরক্ত করেন নাই। তাঁহার ব্যবহারে দোষারোপ করিবার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কার্য্যকুশলতা, একাগ্রতা, সদাচার প্রভৃতি গুণ সকলেরই অনুকরণীয়।"

ক্রমশঃ—

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

অদৃশ্য লেখা।

সরোজবাসিনীর শয়ন-গৃহ।

রমণীমোহন বিদেশে চাকুরী করেন। অনেক কাল পরে বাড়ী আসিয়াছেন। পিতামাতার ভয়ে দিনের বেলায় পত্নী সরোজবাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। রাত্ ১০টার পর শয়নগৃহে আসিয়া সরোজবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অনেক দিনের পর দেখা— উভয়ের প্রাণ লজ্জা, আনন্দ ও অভিমানে পূর্ণ। খানিকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। কথা বলিবার জন্য উভয়েরই ইচ্ছা—কিন্তু কেমন এক অব্যক্ত লজ্জা আসিয়া উভয়েরই যেন কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে। সরোজ আলোর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মেঝের মাটী খুঁড়িতেছিল—আর ঘর্ম্মাক্ত নাসিকায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনের আনন্দ ও বেদনা জানাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পর মৌন ভঙ্গ করিয়া রমণীমোহন কহিলেন—

"কি অমন করে দাঁড়াইয়া রহিলে যে? চিনিতে পার না কি?"

সরোজ। আমরা পারি।

রমণী। পারি না বুঝি আমরা?

সরোজ। তাই ত মনে হয়।

রমণী। বটে! তাই বুঝি সাতখানা চিঠি লিখিয়া একখানারও উত্তর পাই নাই!

সরোজ। আমি আর তোমায় চিঠি লিখিব না।

রমণীমোহন যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া সরোজকে কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন—"কেন সরোজ, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমায় চিঠি লিখিবে না? বিদেশে পড়িয়া থাকি—তোমার একখানি চিঠি পাইলে প্রাণে কত আনন্দ, কত সুখ হয় বলিবার নহে। তুমি চিঠি লিখিবে না কেন?"

স্বামীসোহাগিনী সরোজবাসিনী স্বামীর স্নেহে অতিমাত্র সুখী হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিল—

"আমি কি সাধ করিয়া চিঠি লিখিতে চাহি না ? এবার তোমাকে চিঠি লিখিতে গিয়া আমি যে সাজা পাইয়াছি, তাহা কখনও ভুলিব না।"

রমণীমোহন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"কি হয়েছে আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সব ভেঙ্গে বল ত।"

সরোজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হবে আবার কি মাথা মুণ্ডু, তোমাকে চিঠি লিখিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আমি রান্না করিতে গিয়াছিলাম, তারপর ঘরে এসে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল। দেখিলাম বড় বৌ ও ছোট ঠাকুর ঝি আমার চিঠিখানা খুলিয়া চেঁচিয়া পড়িতেছে এবং হেসে হেসে কুটি কুটি হইতেছে। আমি ত লজ্জায় মরিয়া গেলাম। তোমাকে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা লইয়া কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ হইল বলিবার নহে। আমি লজ্জায় কয়েক দিন মুখ দেখাইতে পারি নাই। আমি তাই স্থির করেছি—আর চিঠি লিখিব না।"

রমণীমোহন সরোজের কেশগুচ্ছের ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে স্নেহভরে ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন—"এই কথা ? আচ্ছা, আমি তোমায় এমন উপায় বলিয়া দিব যাহাতে আর কেহই তোমার চিঠি পড়িতে পারিবে না।"

সরোজ। সে উপায়টি কি ?

রমণী। অদৃশ্য কালী বলে এক প্রকার কালী পাওয়া যায়। তা দিয়ে লিখলে সহজে পড়া যায় না। আগুনের কাছে লেখাটী নিয়া একটু উত্তাপ দিলেই পড়া যায়, আবার শীতল স্থানে আনিলেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এবার থেকে এই 'অদৃশ্য কালীতে তুমি চিঠি লিখিয়ো। কেহই পড়িতে পারিবে না।

সরোজ। এ কালী আমি কোথায় পাব ?

রমণী। আমার কাছে এক শিশি আছে, এই নেও।

সরোজ। এইটুকু ফুরিয়ে গেলে আবার আমি কোথায় পাব ?

রমণী। কেন বাজারে ডাক্তারি দোকানে পাওয়া যায়।

সরোজ। ডাক্তারি দোকান থেকে কে আমায় এনে দিবে ?

রমণী। আচ্ছা, আমি উহার প্রস্তুত প্রণালী বলিয়া দিতেছি।—

(১) সম পরিমাণ তুঁতে ও নিশাদল জলের সহিত গুলিয়া কাগজে লিখিলে অদৃশ্য থাকে। আবার উত্তাপ দিলে স্পষ্টরূপে পড়িতে পারা যায়।

(২) পেঁয়াজের রস বা কাঁচা দুধে ঐ প্রকার লিখিলেও লেখা অদৃশ্য থাকে।

(৩) ভাত, সাগু কি এরোরূটের মণ্ড দিয়া লিখিলে লেখা অদৃশ্য থাকে। আবার টিংচার আওডিনের জলে ধৌত করিলে ঐ লেখা নীলবর্ণ হয়।

আরও অনেক প্রকার গুপ্ত মসী প্রস্তুত করিবার প্রণালী আছে, আর একদিন তোমায় বলিব, আজ অনেক রাত হয়েছে, এখন শুয়া যাক্।

কুন্তলীন প্রেস—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম ভাগ। বৈশাখ, ১৩০৮। চতুর্থ সংখ্যা।
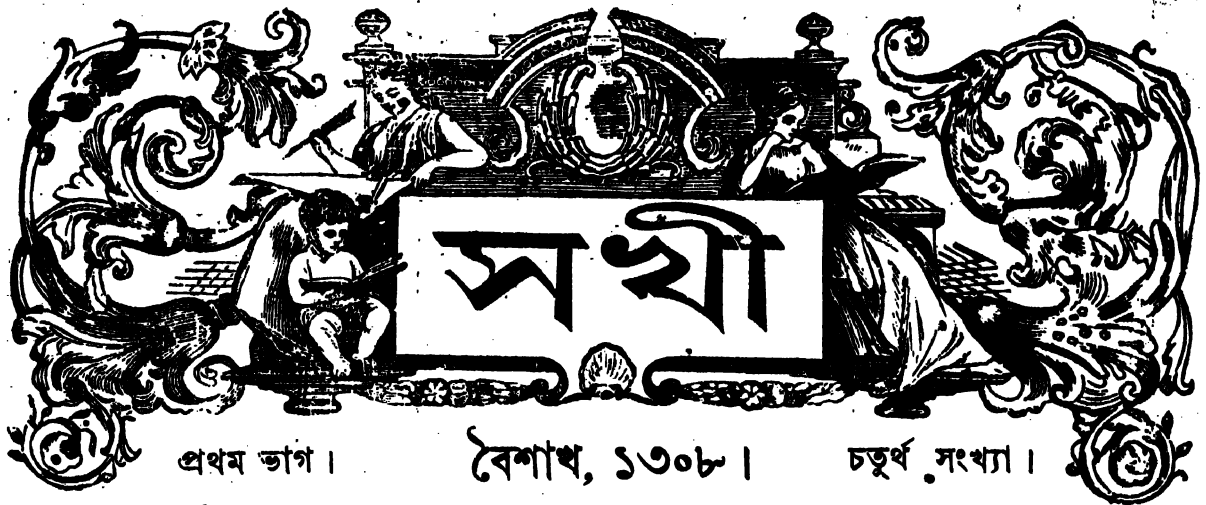
জীবন্ত পুতুল।

সে যে এক জীবন্ত পুতুল,
শত জন্ম পুণ্য ফল,
শত তপস্যার বল,
এসেছে প্রভাতকালে হয়ে অনুকূল।

৺পঙ্কজিনী বসু।

তা'রি অভ্যর্থনা তরে,
উষাবালা ত্বরা করে,
প্রস্ফুটিত করেছিল কুসুম মুকুল।
সে আসিবে ত্বরা করে,
শুনে তা মধুর স্বরে,
গেয়েছিল আগমনী কলকণ্ঠকুল।
প্রভাত সমীর ধীরে,
কয়েছিল সব নরে,
মর্ত্তপুরে আসিবেক স্বরগের ফুল।
সে যে এক জীবন্ত পুতুল,
তিন মাস দিন ছয়,
আসিয়াছে নরালয়,
আজিও সে নিরন্তর নিদ্রায় আকুল।
সে জানে না দিবানিশি,
অশ্রুপ্রীতি স্নেহ হাসি,
সকলি অজানা মেয়ে বেহুঁস বেভুল।
(তবু) সমস্ত মানবগণ,
ছুটে আসে অনুক্ষণ,
তারকাছে, মধু লোভে যথা অলিকুল।
হাসির বাজার বসে,
সে যখন উঠে হেসে,
ক্ষুদ্র হৃদয়েতে তার কি শক্তি অতুল।
সে যে এক জীবন্ত পুতুল,
তাহার অঙ্গের বাসে,
সমস্ত জগৎ হাসে,
শরমে ঝরিয়া পড়ে সেফালি মুকুল।

তার সেই উদাত্ত স্বরে,
আহা কি সঙ্গীত ঝরে,
সমস্ত জগৎ মাঝে কোথা তা'র তুল?
ত্রিদিবের শশধর,
বিরাজিত মুখ পর,
দেখিলে দ্রবিত হয় ঋষি মুনিকুল।
বিধাতা করুণা করে,
পাঠায়েছে ধরাপরে,
তাহারে 'আমার' বলা আমাদের ভুল।
সে যে এক জীবন্ত পুতুল,
সারাদিন চেয়ে থাকি,
মুগ্ধ অনিমেষ আঁখি,
তবুও অন্তরে থাকে অতৃপ্তির শূল।
নিয়ে গেছে স্নেহ প্রীতি,
নিয়েছে কবিতা স্মৃতি,
কাড়িয়া নিয়াছে মোর হৃদয়ের মূল।
যখনই যেখানে যাই,
শান্তি শূন্য সব ঠাঁই,
আমারে করিল সে যে কলের পুতুল।

৺পঙ্কজিনী বসু।

সমস্যা।

আমার একজন বন্ধু পশ্চিমে চাকুরি করেন। গত জানুয়ারী মাসে তাঁহার নিকট হইতে এই পত্র খানি পাই,—

প্রিয়ভ্রাতঃ,

অনেক দিন তোমাকে পত্র লিখি নাই, তুমিও কোন সংবাদ লও নাই; সুতরাং সে অপরাধটা উভয় পক্ষেরই সমান, তাহার জন্য কাহারও কোন কৈফিয়ৎ দিয়া লাভ নাই।

আজ তোমাকে পত্র লিখিতেছি, কেন তা জান? তোমাকে একটা সংবাদ দেওয়া নিতান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। শুনিয়া সুখী হইবে, আমার স্ত্রী গত পৌষ মাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তুমি কি এ সংবাদে সুখী হইবে না? আমি কিন্তু মহা সুখী হইয়াছি। তাহার জীবনের অবসানের সঙ্গে যে তাহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, ইহাতে সুখী না হইব কেন? এত দিন একটা ঘোর অপরাধের, মহাপাপের বোঝা আমার স্কন্ধে চাপিয়া ছিল; আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে সে বোঝা নামিয়া গিয়াছে। এখন আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেছি। কি কষ্টই সে জীবনে ভোগ করিয়াছে! কি কষ্টই না আমি ভোগ করিয়াছি। তাহার সকল শোকের, সকল দুঃখের শান্তি হইয়াছে, কিন্তু আমি—সে কথা আর তোমাকে কি বলিব!

এখন বল দেখি আমি কি করি? আজ তের বৎসর দেশত্যাগী, তের বৎসর আমি বাঙ্গলা দেশে যাই নাই। মানুষ যে বয়সে ঘর গৃহস্থালী পাতিয়া সুখে বাস করে, সে বয়স আমার চলিয়া গিয়াছে। আমি চল্লিশে পা দিয়াছি, মাথার চুল দুই এক গাছি পাকিয়াছে।

এতদিন যাহার জন্য চাকুরী করিয়াছি, তাহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন কি সন্ন্যাসী হইব? গৃহী ত কোন দিনই হইলাম না; আর পরের দাসত্ব করিতে ইচ্ছা করে না। বল দেখি, এখন আমি কি করি? আমার জীবনের সব কথা তুমি জান, তাই তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও। ইতি

তোমার হতভাগ্য
নগেন্দ্র।

চিঠির উত্তর আমি দিয়াছি। উত্তর আর কি, কেবল পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছি; তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি বলিয়া আশ্বাস দিয়াছি; কিন্তু এতদিনেও নগেনের পত্রের প্রকৃত উত্তর দিতে পারি নাই। কি বলিব, আমিই ভাবিয়া পাই না। তাহার জীবনের কাহিনী বলিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কেন আমি তাহার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।

(২)

একবার পূজার সময়ে আমি অমৃতসহর বেড়াইতে যাই। বাঙ্গালা দেশ হইতে যাই নাই, আমি তখন

পশ্চিমেই থাকিতাম। বিষয় কর্ম্ম তেমন একটা ছিল না, চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ানই আমার কর্ম্ম ছিল। অমৃতসহরে একটা ধর্ম্মশালায় আমি আশ্রয় গ্রহণ করি; আমি যে ঘরটিতে ছিলাম, তাহার পাশের ঘরেই আমার যাওয়ার পূর্ব্ব দিন আর একটী বাঙ্গালী বাবু আসিয়া বাসা করেন। ধর্ম্মশালার রক্ষক আমাকে বলিলেন যে, সে বাবুটী রাউলপিণ্ডি হইতে অমৃতসহর বেড়াইতে আসিয়াছেন। আমি যখন ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হই, তখন তিনি বেড়াইতে গিয়াছিলেন।

বেলা পাঁচটার সময়ে তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অধিকৃত ঘরের পার্শ্বের ঘরেই আমাকে দেখিয়া তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত আমার কাছে আসিলেন। এই বাবুটির নামই নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, যে নগেনের পত্র সেদিন পাইয়াছি, ইনি সেই নগেন্দ্র। বিদেশে দুই জন বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ, সুতরাং অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমরা পরস্পরের সহিত বিশেষ পরিচিত হইলাম। এক সঙ্গেই আহারাদি হইল, এমন কি তিনি আমার ঘরেই তাঁহার বিছানা আনিয়া ফেলিলেন।

পর দিনই তাঁহার রাউলপিণ্ডি ফিরিয়া যাইবার কথা, কিন্তু আমাকে এক দিন অমৃতসহরে থাকিতে হইবে শুনিয়া তিনিও যাওয়া বন্ধ করিলেন। পরের দিন অমৃতসহর ভ্রমণ শেষ করিয়া ফেলিলাম। আমার ভ্রমণ ব্যতীত অন্য কোন কাজ নাই শুনিয়া নগেন্দ্র বাবু আমাকে রাউলপিণ্ডি যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমার তাহাতে আর আপত্তি কি? কোন রকমে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইয়া দেওয়াই তখনআমার সঙ্কল্প ছিল,—তা সে দিল্লীতেই থাকি আর লাহোরেই থাকি।

পর দিন প্রত্যুষের গাড়ীতে আমরা রাউলপিণ্ডি রওনা হইলাম। যথাসময়ে নগেন্দ্রনাথের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। ছোট্ট একখানি বাড়ী, একটী ভৃত্য ব্যতীত দ্বিতীয় লোক নাই। সেই পাহাড়ী ব্রাহ্মণ ভৃত্যটী একাধারে পাচক, দ্বারবান, ভৃত্য, সরকার সব। রামানন্দ নগেন্দ্রের বড় বিশ্বাসী ভৃত্য; টাকা পয়সা, জমা খরচ সব তাহার জিম্মা। সে কাপড়খানি বাহির করিয়া দেয়, তবে নগেন্দ্র পরিধান করেন। অতি নির্জ্জনে এই ভৃত্যটাকে লইয়া নগেন্দ্র এই প্রবাসে তাহার কেরাণী জীবন অতিবাহিত করে।

দুই দিন থাকিয়াই দেখিলাম, রাউলপিণ্ডিতে নগেন্দ্র বড় কাহারও সঙ্গে মেশে না। দশটার সময়ে আফিসে যায়, চারিটায় বাসায় আসে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে একটু বেড়ায়, নতুবা সেই নির্জ্জন গৃহে একাকী পড়াশুনা করে বা শুইয়া শুইয়া কি করে, ভগবান জানেন। সহরের বাঙ্গালীরা কেহই বড় একটা নগেন্দ্রের বাসায় আসেনা। নগেন্দ্র আমার সমান বয়েসী।

(৩)

এই কয় দিনেই নগেন্দ্রের সহিত আমি বিশেষ পরিচিত হইয়া পড়িলাম। নগেন্দ্রের বাড়ী চন্দননগরে, বাড়ীতে ছোট ভাই এবং একটী বিধবা ভগিনী আছেন। ভাইটী যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই সংসার বেশ চলিয়া যায়, নগেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে হয় না। নগেন্দ্র বিবাহিত। স্ত্রী তাহার পিত্রালয়েই বাস করেন; ছেলে পিলে হয় নাই। মাসে নব্বইটী টাকা মাহিয়ানা—নিতান্ত কম নহে, নগেন্দ্র ইচ্ছা করিলে রাউলপিণ্ডিতে সপরিবারে বাস করিতে পারেন, অথচ তিন বৎসর হইল, রাউলপিণ্ডিতে আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে পরিবার আনিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর কথায় কথায় আমি তাহার পরিবার আনিবার কথা বলিলাম। এখন আর নগেন্দ্রের সহিত 'আপনি' সম্বোধনে আলাপ করি না; এই কয় দিনের পরিচয়েই এমন ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে যে, আমরা 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া নগেন্দ্র গম্ভীর হইল। তাহার পর বড়ই অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল "কেন, আমি ত বেশ আছি"? তরুণ বয়স্ক বিবাহিত যুবক, নব্বই টাকা বেতনে চাকুরী করে। এ কয় দিনে যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্বভাব নিষ্কলঙ্ক বলিয়াই বোধ হইল, অথচ পরি-

যার লইয়া থাকিতে চায় না—বলে, "আমিত বেশ আছি"! আমার মনে একটা খট্‌কা লাগিল; আমি নগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, তাহার মুখে একটা ঘোর বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। আমি একটু যেন অপ্রস্তুত হইলাম; শেষে বলিলাম, "কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া বোধ হয় ভাল কাজ করি নাই। তা ও কথায় আর কাজ নাই।" "সেই ভাল" বলিয়া নগেন্দ্র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহার সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে যেন তাহার হৃদয়ের গভীর বেদনা অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, বিশেষ কোন কারণে নগেন্দ্র নাথের বিবাহিত জীবন বড়ই দুঃখের। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইল, কিন্তু তখন আর কিছুই বলিলাম না।

আমরা দুই জনে এক ঘরেই শয়ন করিতাম। রাত্রে শুইয়া শুইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নানা বিষয়ে গল্প করিতাম। সেদিনও গল্প আরম্ভ হইল। আমার মন কিন্তু নগেন্দ্রের বিবাহিত জীবনের কথা জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক; কেমন করিয়া কথাটা পাড়িব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। শেষে কথায় কথায় যখন বাঙ্গালা দেশের কথা উঠিল, তখন আমি বলিলাম—"নগেন, তোমার এটা বড়ই অন্যায়; আজ তিন বৎসর মধ্যে তুমি একবারও দেশে গেলেনা। বাড়ীতে ছোট ভাই আছে, বিধবা ভগিনী আছে, স্ত্রী আছে, তাহাদের দেখিবার ইচ্ছাও কি তোমার হয় না?" নগেন্দ্র বলিল—"ইচ্ছা হইবে না কেন? কিন্তু কি করিব, আমি নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছি। যে কয়দিন বাঁচিব, বিদেশে এই ভাবেই কাটাইয়া দিব।" আমি বলিলাম, "ইহাই যদি তোমার অভিপ্রায় ছিল, তবে পরের মেয়ে গলায় করিলে কেন? তার সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে কেন? সে কাজটা কি বড় ভাল"? আবার সেই হৃদয়-ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস! একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই নগেন্দ্র বলিল, "ভাই, সকল কথা যদি জানিতে, তবে আর এ উপদেশ দিতে পারিতে না। আমার জীবন বড় দুঃখের; বড় কষ্টে বড় যন্ত্রণায় আমি দেশ ত্যাগ করিয়াছি। সুখ শান্তি আমার অদৃষ্টে নাই। এ জীবন এমন করিয়াই কাটিয়া যাইবে। আমি বলিলাম, "দেখ আমিও বড় দুঃখী। আমার কাছে তোমার দুঃখের কাহিনী বলিলে তোমার হৃদয়-ভার কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে। আমাকে কি সব কথা খুলিয়া বলিতে পার না"?

নগেন্দ্র বলিল—"যেদিন তোমাকে প্রথম অমৃত সহরে দেখি সেই দিন হইতেই তোমার উপর আমার যেন কেমন একটা টান হইয়াছে; তাহার পর এই কয়দিন তোমার সঙ্গে একত্র বাস করিয়া আমি তোমাকে নিতান্তই আপনার জন করিয়া লইয়াছি। তোমার নিকট আমার জীবনের কথা বলিব; এ জগতে আমার স্ত্রী ব্যতীত আর কেহই এ সংবাদ জানেনা। আজ তোমাকে বলিব। কথা বড় বেশী নয়। আমাদের বাড়ী চন্দন নগরে; ছেলে বেলায় বাপ মা মারা যায়; বিধবা পিসিমাই আমাদের তিন ভাই ভগিনীকে মানুষ করেন। বাবা অতি অল্প টাকাই রাখিয়া যান, পিসিমার হাতে যথেষ্ট নগদ টাকা ছিল। সেই টাকার সুদেই আমাদের সংসার চলিয়া যাইত। দিদির যখন বিবাহ হয় আমি তখন স্কুলে পড়ি, আমার ছোট ভাই নলিনও তখন স্কুলে পড়ে, নলিন আমার দেড় বৎসরের ছোট। বিবাহের এক বৎসর পরে দিদি বিধবা হন এবং সেই অবধি তিনি আমাদের বাড়ীতেই আছেন। আমার বয়স যখন বাইস বৎসর, তখন পিসিমা আমার বিবাহের জন্য জেদ করিয়া বসিলেন; তাঁহার ইচ্ছা আমাদের দুই ভাইয়ের এক সঙ্গেই বিবাহ দেন। আমি তখন বি, এ ক্লাসে পড়ি, নলিন দুইবার এল্, এ ফেল করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে এবং কলিকাতার এক সওদাগরের আফিসে ৪০৲ টাকা বেতনে কেরানীগিরিতে ভর্ত্তি হইয়াছে। এখনও নলিন সেই কর্ম্মেই আছে, এখন সে ৬৫৲ টাকা বেতন পায়। পিসিমার জেদে পড়িয়া আমরা দুই ভাইই বিবাহ করিতে স্বীকার করিলাম। কলিকাতা হইতে দুই ভাইয়েরই সম্বন্ধ আসিল; আমার এক মামা কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। এক জন মুনসেফের কন্যার সহিত আমার বিবাহ স্থির হইল, নলিনের বিবাহ তাহাদের আফিসের

একটী বাবুর মেয়ের সঙ্গে স্থির হইল। এক দিনেই মহানন্দে দুই ভাই বিবাহ করিতে গেলাম; বিবাহ হইয়া গেল; পরের দিন দুই ভাই বিবাহ করিয়া বাড়িতে ফিরিলাম। বৌ দেখিয়া পিসিমা ভারি সুখী। আমার স্ত্রীর বয়স তখন পনর পার হইয়াছে। মুনসেফ বাবুর একটী ছেলে ও একটী মেয়ে; সুতরাং তিনি যত দিন পারিয়াছেন, মেয়েটীকে ঘরে রাখিয়াছেন। আর এখন কায়স্থের ঘরে ১৪।১৫ বৎসরের মেয়ে প্রায়ই থাকে। আমার স্ত্রী খুব বেশী লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; তিনি বিবাহের পূর্ব্বেই বাঙ্গালা, ইংরেজি ও সংস্কৃত বেশ ভাল শিখিয়াছিলেন। মুনসেফ বাবু বাড়ীতে মাষ্টার পণ্ডিত রাখিয়া মেয়েকে লেখা পড়া শেখান। সে কথা থাক্, ফুল শয্যার পরের দিনই আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। তুমি হয় ত মনে করিতেছ, পনর বৎসরের স্ত্রী, বিবাহের রাত্রেই তাহার সঙ্গে আমার কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। সে সব কিছুই হয় নাই। কেন হয়নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, বিবাহের রাত্রে বা ফুল শয্যার রাত্রে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার কোন কথাই হয় নাই। আমি অবশ্য কথা বলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী সেই যে আমার দিকে পেছন ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া ছিলেন, আর ফিরিলেন না; তার পর দিনই তিনি বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

(৪)

"ঐ বৈশাখ মাসের কথা। এক মাস চলিয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে এক দিন প্রাতে ডাকপিয়ন আমাকে এক খানি পত্র দিয়া গেল; পত্র খানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। সে পত্র আমার স্ত্রীর লেখা। পত্র খানি আমার কাছে এখনও আছে"। এই বলিয়াই নগেন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিল; তখনও আমার শিয়রের কাছে টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। নগেন্দ্র সেই টেবিলের একটা দেরাজ খুলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল "এই পত্র খানি পড়। তাহা হইলেই সমস্ত জানিতে পারিবে; আমাকে আর কিছুই বলিতে হইবে না। পত্র খানি আমার হাতে দিয়া নগেন্দ্র আবার তাহার বিছানায় যাইয়া শয়ন করিল। আমি তখন পত্র খানি হাতে করিয়া উঠিয়া বসিলাম। খুলিয়া দেখি, এক খানি চিঠির কাগজের চারি পৃষ্ঠা লেখা—পত্র। পত্র খানি আজ দশ বৎসর আমার কাছে রহিয়াছে; পত্র খানিতে কোন পাঠ লেখা নাই। পত্র খানি এই—

কলিকাতা
৫ ই জ্যৈষ্ঠ; ১২৯৫।

আজ একমাস হইতে আপনাকে এক খানি পত্র লিখিব মনে করিতেছি, পত্র লেখা বিশেষ আবশ্যক ও কর্ত্তব্য বলিয়াই আমি স্থির করিয়াছি, কিন্তু সকল কথা ভাল করিয়া গোছাইয়া ধরিতে পারিতেছি না, সকল কথা কেমন করিয়া বলিলে আপনি ঠিক বুঝিবেন তাহাই এতদিন স্থির করিতে পারি নাই—এখনও স্থির হয় নাই; কিন্তু আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়াই আজ এই পত্র লিখিতে বসিলাম। আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব তাহা ভাবিয়া পাইলাম না, তাই সম্বোধন মোটেই করিলাম না। এ পত্র খানি পড়িয়া আপনার বড়ই কষ্ট হইবে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন আমি কত কষ্টে পড়িয়া কত ভাবিয়া আপনাকে এ পত্র লিখিতেছি।

আপনি হয় ত শুনিয়াছেন যে, বাবা আমাকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন, আমিও সাধারণ মেয়েদের অপেক্ষা লেখা পড়া একটু বেশী শিখিয়াছি। তাহার পর আমার বয়সও এখন পনর বৎসর, সুতরাং হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আমার বেশই আছে।

এখন আমার কথা আপনাকে বলিতেছি। আমার বয়স যখন বার বৎসর তখন আমার বাবা আলিপুরে মুন্সেফী করিতেন; দাদা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এল, এ ক্লাশে পড়িতেন। দাদার একটী সহাধ্যায়ী সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন; তিনি দাদার বিশেষ বন্ধু; তাঁহার বাড়ী বাঙ্গাল দেশে। আমি আর দাদা এক ঘরে বসিয়াই পড়াশুনা করিতাম, তাঁহার বন্ধুও

আমাদের পড়ার ঘরে আসিয়া বসিতেন। ক্রমে তাঁহার সহিত আমারও পরিচয় হইল। তিনি যখন তখন আমার পড়া বলিয়া দিতেন, বিশেষ যত্ন করিয়া আমার অঙ্কগুলি বুঝাইয়া দিতেন। প্রথম প্রথম তিনি দুই চারি দিন পরে পরে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন; কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আমার বয়স পনর বৎসর, তাহার বয়স ১৮ বৎসর; আমি তখন অনেক বাঙ্গলা বই পড়িয়াছি; ভালবাসা কি তাহা বেশ বুঝিয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহাকে যে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাঁহারও ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে ভাল বাসিয়াছেন। তখন মনে করিয়াছিলাম, এমন ভালবাসা কত হয়। কিন্তু ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার কথাই আমার প্রধান চিন্তা হইল, আমি দিন রাত ভরিয়া তাঁহারই কথা ভাবিতাম, আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম তিনিই যেন আমার স্বামী হন। তিনি ছাড়া আর কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না। শেষে এমন হইল যে আমি একদিন তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম, কি লিখিয়াছিলাম তাহা আমার মনে নাই। সেই পত্রের উত্তরে তিনি কত আদর, কত স্নেহ, কত ভালবাসা জানাইয়া আমাকে পত্র লিখিলেন; আমিত আনন্দে অধীরা হইলাম। তাহার পর একদিন তাঁহার সম্মুখে আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তাঁহাকেই মন প্রাণ সমর্পণ করিলাম। স্থির করিয়াছিলাম বাবা যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। শেষে একদিন আমি সকল কথা দাদাকে ভাঙ্গিয়া বলিলাম; দাদা বাবার নিকট প্রস্তাব করিলেন; বাবার অমত ছিল না, কিন্তু মৌলিকে বিবাহ দিতে মা একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। দাদা তাঁহাকে কতই বুঝাইলেন; মা কিছুতেই সম্মত হইলেন না এবং শীঘ্র আমার বিবাহের জন্য বাবাকে জেদ করিয়া ধরিলেন। বাবা কি করেন, চারিদিকে সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিলেন; আমি ধীর ভাবে সব দেখিতে লাগিলাম। শেষে যখন আপনার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল, তখন বাবা মাকে কিছুই বলিলাম না; কারণ, আমি স্থির করিয়াছিলাম, বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রি বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমার বিবাহের কথা শুনিয়া তিনি আমাদের বাড়ীতে আসা ত্যাগ করিলেন। আমি তাঁহাকে কোন সংবাদ দিতে পারিলাম না।

বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল, আমিও মরণের আয়োজন করিতে লাগিলাম; বিবাহের পূর্ব্ব দিন রাত্রে বিষ খাইব বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলাম। কিন্তু রাত্রে আমার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল; প্রাণের উপর কেমন একটা মমতা হইল। পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলাম; মনে করিলাম যিনি আমার স্বামী হইতেছেন তাহাকে ভালবাসিয়া আমার পূর্ব্ব ভালবাসা ভুলিয়া যাইব; আশায় বুক বাঁধিলাম। প্রাণের মায়ায় আমি অন্ধ হইলাম।

বিবাহ হইয়া গেল। আপনাকে দেখিলাম, আপনাকে ভালবাসিতে চেষ্টাও করিয়াছি। আজ এই এক মাস আমার হৃদয়ের আসন হইতে সে মূর্ত্তি সরাইয়া ফেলিয়া সেখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সব বিফল; সেই মূর্ত্তি আরও স্পষ্ট হইয়া আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

আমি দ্বিচারিণী হইতে পারিব না। ভগবানকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমার দেহ কলঙ্কিত হয় নাই, আমি কোন দিন তাঁহাকে স্পর্শও করি নাই। কিন্তু আমার মন ত কলঙ্কিত, আমি মনে মনে যে তাঁহাকেই ধ্যান করি। মন একজনকে দিয়াছি, এখন কি আপনার নিকট আমার দেহ বিক্রয় করিব? তাহা আমি পারিব না। তবে কি শাস্ত্রানুসারে আপনার পত্নী হইয়া আমি তাঁহার চরণে দেহ বিক্রয় করিব? এই মহাপাপের উপর আবার মহাপাপের বোঝা চাপাইব? তাহা ত এ জীবনে পারিব না। পাপের বোঝা যথেষ্ট ভারি করিয়াছি।

এখন আপনিই বলুন আমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য? আমি আপনার গৃহিণী হইতে পারি, আপনার দাসী হইতে পারি, কিন্তু আপনার শয্যাভাগিনী হইতে পারিব না; যাঁহাকে মন প্রাণ অর্পণ করিতে পারিলাম না

তাঁহার নিকট দেহ বিক্রয় করিতে পারিব না। মন এক জনের, দেহ আর একজনের! দ্বিচারিণী আর কাহাকে বলে! আমি কি স্থির করিয়াছি শুনিবেন? আমি এই ভাবেই জীবন যাপন করিব। আমি তাঁহারও হইব না, আপনারও হইব না; আমার জীবন অভিশাপ-গ্রস্ত; আমার জীবনের কোন সাধ মিটিবে না। আপনার নিকট প্রার্থনা আপনি আমার উপর পত্নীত্বের দাবী করিবেন না। তাহার পর দেবতাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি তাঁহার সঙ্গেও এ জীবনে আর সাক্ষাৎ করিব না। ভাবিয়া দেখুন কি কষ্টে আমি এত কথা লিখিতেছি। পোড়া প্রাণের মায়াতেই আমাকে অধীর করিয়াছে; এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমার বাঁচিবার সাধ। সমস্ত কথা আপনাকে খুলিয়া লিখিলাম। যাহা আপনার ধর্ম্মে লয় করিবেন। ইতি

হতভাগিনী
যামিনী।

পত্রখানি পড়া শেষ হইলে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি নগেন্দ্র একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমি আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না, আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমাকে আর কিছু বলিতে হইল না। নগেন্দ্র বলিল "কেমন, পত্র পড়িয়াছ? বল দেখি ভাই, আমার অপেক্ষা দুঃখী কে আছে? আর বল দেখি ভাই তা'র অপেক্ষা হতভাগিনী কে আছে? আমি তাহার উপর রাগ করিতে পারিলাম না। কেন রাগ করিব? কিন্তু সেই দিনই স্থির করিলাম, দেশ ত্যাগ করিব; তাহা ছাড়া অন্য উপায় পাইলাম না। পরদিনই কাহাকে কিছু না বলিয়া আমি বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া আসি; সে আজ তিন বৎসরের কথা। প্রথম কয়েক মাস এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া শেষে এখানে এই চাকুরী পাইয়াছি। প্রথমে বাড়ীতে সংবাদ দিই নাই; শেষে চাকুরী হইলে সংবাদ দিয়াছিলাম। যামিনী চিরদিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমার শ্বশুর আমাকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এ তিন বৎসর কেহই আমাকে দেশে লইয়া যাইতে পারেনি নাই। যতদিন বাঁচিব এই দেশে এই অবস্থায় থাকিব। যে বেতন পাই, তাহা হইতে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিই। প্রথমে দুই তিন মাসের টাকা ফিরিয়া আসে; শেষে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আমার শ্বশুরকে পত্র লেখায় এখন আর মনিঅর্ডার ফেরত আসে না। শুনিলে আমার দুঃখের কথা! আমি চির নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছি। এ জীবনে আর বিবাহ করিব না, এ জীবনে আর গৃহস্থ হইব না। দিন ত যাইতেছে; তবে কাহারও দিন সুখে যায়, আমার দিন না হয় দুঃখেই গেল।" নগেন্দ্র আর কথা বলিতে পারিল না, তাহার মুখে আর কথা সরিল না। আমি নীরবে তাহার জীবনের এই ইতিহাস শুনিলাম। কি বলিব, বলিবার কথা কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না।

তাহার পর পাঁচদিন আমি নগেন্দ্রের বাসায় ছিলাম। দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও সে দিনের কথা আমি ভুলিতে পারি নাই। এই দশ বৎসরের মধ্যে নগেন্দ্র বাঙ্গালা দেশে আসে নাই। আমি পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাহার স্ত্রীর সংবাদ লইতাম, শেষে আর সংবাদও পাইতাম না। নগেন্দ্রও অনেক দিন পত্র লেখে না, নানা কাজের গোলে পড়িয়া আমিও তাহাকে অনেকদিন পত্র লিখিনা।

অকস্মাৎ সেদিন তাহার পত্র পাই, সে পত্রের কথা প্রথমেই বলিয়াছি।

আজ ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ই, আজও নগেন্দ্রের পত্রের জবাব দেওয়া হয় নাই। কি জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। যামিনী মরিয়াছে; এখন কি নগেন্দ্রকে আবার বিবাহ করিতে বলিব! এই চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় সেকি আর সংসারী হইতে পারিবে? এমন সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক জীবন—এমন প্রেমময় হৃদয়—এমন স্নেহময় প্রাণ—যার! কেহই সে প্রেমের আদর করিল না—একটা দুর্লভ জীবন কেমন করিয়া শুকাইয়া যাইতেছে। পত্রের উত্তর কি দিব?

শ্রীজলধর সেন।

আমার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী।

(১)

সুন্দর বনে চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের অনেক ভূসম্পত্তি আছে। তাহার অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ। সাময়িক ভাবে সে সব জমী চাষ আবাদ হইয়া থাকে। 'আবাদী' বলিয়া এক শ্রেণীর কৃষক আছে, তাহারা অস্থায়িভাবে ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় সাত মাস কাল তথায় বাস করে; আবার ফসল উঠিয়া গেলেই স্ব স্ব দেশে চলিয়া যায়।

সেইখানে রাজাদের একটা কাছারী আছে। একদিন হঠাৎ একটা সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম, সুন্দরবনের কাছারীর জন্য একজন উপযুক্ত সাহসী নায়েবের আবশ্যক—মাসিক বেতন ১০০৲ একশত টাকা। তাহা ছাড়া সেখানকার নানা অসুবিধার, হিংস্র জন্তুর ও চোর দস্যুর উৎপাতের কথাও বিজ্ঞাপনে লিখিত ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার যৌবন কাল, শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল। সহজে কিছুতেই ভীত হইতাম না। অন্যের নিকট যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত, আমি তাহা সম্ভব মনে করিতাম। বাল্যকাল হইতেই আমি শিকার করিতে ভাল বাসিতাম। আমাদের গ্রামের জমিদার-পুত্রের সঙ্গে বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইতাম। ভয় কাহাকে বলে, আমি জানিতাম না। কত সময়ে কত বিপদে পড়িয়াছি, কিছুতেই ভীত হইনাই। কিন্তু এই অসাধারণ নির্ভীকতাই আমার কাল হইল। এই জন্য কত সময়ে কত বিপদে যে পতিত হইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কি, আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনেক সময়ে মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। এখন এই বৃদ্ধ বয়সেও সে সব কথা স্মরণ করিলে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। সখীর পাঠক পাঠিকাদের নিকট আজ সেই সব অদ্ভুত কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেই কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়া আমি বড়ই উৎফুল্ল হইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি চন্দ্রদ্বীপের রাজার নিকট আবেদন করিলাম; আবেদনে আমার শক্তি ও সাহসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াদিলাম। কিছুদিন পরেই রাজার নিকট হইতে আমার নিযুক্তিপত্র আসিল। পরম আহ্লাদে সুন্দরবনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বন্ধুবান্ধবের ভয়প্রদর্শন, আত্মীয় স্বজনের রোদন, গুরুজনের নিরাশাব্যঞ্জক উপদেশ প্রভৃতিতে আমি উপেক্ষা করিয়া চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইলাম; এবং একদিন প্রাতঃকালে সুন্দরবনের দিকে নৌকাপথে যাত্রা করিলাম। আমার মনিব আত্মরক্ষার্থ দুইটী পিস্তল, একটী বিলাতী দুনলা বন্দুক এবং গুটিকয়েক বর্ষা আমায় দিলেন। তাহা লইয়া আনন্দপূর্ণ অন্তরে এক অজ্ঞাত সুখের আশায় সেই হিংস্র জীবজন্তুপূর্ণ দুর্গম প্রদেশে যাত্রা করিলাম।

আমার নৌকায় পাঁচ জন বলবান মাঝি ছিল। তাহারা সুন্দরবনে বহুবার গিয়াছে। পথঘাট তাহাদের সমস্ত জানা শুনা। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত মনে নৌকায় আরোহণ করিলাম।

মধ্যাহ্নে ভোজনের পর আমি প্রতিদিন কিছুক্ষণ নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। অভ্যাসমত সেই দিনও নৌকায় যথাসময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নৌকার ঝাকুনী এবং শীতল সমীরণে সে দিনের ঘুমটা কিছু গাঢ় হইয়াছিল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, বলিতে পারি না; হঠাৎ মাঝিদের চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রে, কি হয়েছে? অমন করে চেঁচাচ্ছিস্ কেন?" মাঝিরা পারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—"বাবু, ঐ দেখুন—একটা প্রকাণ্ড কুমীরকে কেমন করিয়া গ্রামের লোকেরা নদী হইতে বাঁধিয়া তুলিতেছে।" আমি পারের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম—সত্য সত্যই একটা অতি বৃহদাকারের কুমীরকে কতকগুলি গ্রাম্য লোক দড়ী দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। গ্রামের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সেই কুমীরটা অতি দুর্দ্দান্ত। এই কয়েক মাসের মধ্যেই সে কত মানুষ, ভেড়া, ছাগল ও গরু যে গ্রাস করিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। উহার ভয়ে কেহ কখনও নদীর ধারে একাকী

পদার্পণ করিত না। গ্রামের লোকেরা অনেক দিন হইতেই উহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। বহু-কালের পর ফাঁদে ফেলিয়া তাহারা যাদুকে আটকাইয়াছে। ছবিতে দেখ, কেমন মনের আনন্দে তাহারা কুমীরটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি এত বড় কুমীর আর কখনও দেখি নাই।

আমাদের নৌকা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সে গ্রাম পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য্যাস্ত হইল। ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার আসিয়া জগৎকে আবৃত করিল। নদীর দুই পারে নিবিড় বন। তাহার মধ্যে বড় বড় শাল, তমাল, কদম্ব ও নাগেশ্বরের গাছ মাথা তুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জোনাকীর আলোকে নদীর দুই পার এক একবার চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছিল। জন মানবের শাড়া শব্দ নাই। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। শৃগাল ও ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে স্থানের গাম্ভীর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইতেছিল। আমি ছইয়ের ভিতর বসিয়া প্রকৃতির এই গাম্ভীর্য্য প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম, আর মনে মনে কত কি ভাবিতেছিলাম। আমার আহারাদির কার্য্য সন্ধ্যার প্রাকালেই শেষ করিয়াছিলাম। মাঝিরা ছইয়ের বাহিরে রান্না করিতেছিল, আর ডাবা হুক্কায় তামাক টানিতে টানিতে আপনাদের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করিতেছিল।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ মাঝি বলিল—"বাবু, বন দেখে বুঝি ভয় পেয়েছ? কোন চিন্তা নাই। আজ রাত্রে আর কোন গেরাম পাব না। কাল ভোরেই দুর্লভপুরের বাজারের নাগ পাব। বনের মধ্যে নৌকা খাড়া করা ভাল না। কত ভয় বিপদ আছে। তাই তামান রাত নৌকা চালাইয়া যাতি লাগছি"। আমি মাঝির কথার দুই একটা উত্তর দিয়ে পাশ ফিরিয়া শুইলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই একটা শব্দ আমার কাণে গেল। নৌকা কোন প্রকার বিপদে পড়িয়াছে, অনুমান করিয়া ধড় মড় করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তাহারা ঘুমের ঘোরে নৌকা চালাইয়া পথভ্রান্ত হইয়াছে এবং নৌকা এমন এক অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে যে, গন্তব্য-পথ কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছে না। আমি চারিদিকে তাকাইয়া কেবল জল রাশিই দেখিতে লাগিলাম। সেই বনাকীর্ণ নদীতট কোথায়? উচ্চশীর্ষ শাল তমালের শ্রেণীই বা কোথায়? সেই ঝিঁ ঝিঁ পোকা

ও শৃগালের ঐকতানিক স্বরলহরী আর শ্রুত হয় না। আমি অবাক্ হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। মাঝিরা ভয়-বিহ্বল চিত্তে নানা কথা বলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ অরুণাভ হইয়া উঠিল। অন্ধকার ক্রমে বিদূরিত হইল। কিন্তু আলোকের সাহায্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার ন্যায় নির্ভীক ব্যক্তির প্রাণও কাঁপিয়া উঠিল। মাঝিরাও প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আমরা বঙ্গোপ-সাগরে আসিয়া পড়িয়াছি! তীরের চিহ্ন নাই, জনমানবের শাড়া নাই। কোন দিকে কূল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই অগাধ জলে নৌকা চালাইয়া কোন্ দিকে যাইবে? মাঝিরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া সমুদ্রের খেলা দেখিতে লাগিলাম। শিশুক ও কুম্ভীরেরা জলে খেলা করিতেছিল। আমি এক মনে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু বেশী ক্ষণ আর দাঁড়াইতে হইল না, ক্রমে বাতাস বাড়িতে লাগিল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়া সমুদ্রের মূর্ত্তি ভীষণতর হইতে লাগিল। মাঝিরা হাহাকার করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা ঢেউ আসিয়া নৌকা খানিকে উল্টাইয়া দিল! মাঝিদের যে কি হইল, তাহা আমার দেখিবার অবসর হইল না। আমি একটা পিস্তল লইয়া নৌকার এক খানি কাঠ ধরিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও আমার সুবিধা হইল না। উত্তাল তরঙ্গমালা আমার মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগল; আমার নাকে মুখে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছু ক্ষণের মধ্যেই আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ—

থান কাপড়ে পাকা পাড়।

(অসহায়া স্ত্রীলোকের জীবিকার উপায়)।

প্রতিভা, বিধবা নির্ম্মলার এক মাত্র কন্যা, দুঃখিনীর বুক জুড়াইবার এক মাত্র সম্বল। মেয়ে পাড়ায় খেলা করিতে গিয়াছিল—ছুটিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মা, প্রফুল্ল এমন সুন্দর এক নূতন রকমের পেড়ে কাপড় পরেছে, তুমি তা কখনো দেখনি। বড় সুন্দর, বড় সুন্দর। মা তুমি আমায় এক খানা কিনে দাও না"।

নির্ম্মলা। কোন্ প্রফুল্ল রে?

প্রতিভা। সেনেদের প্রফুল্ল, সেই যে একদিন আমায় নারকেলী কুল খেতে দিয়েছিল!

নির্ম্মলা। সে কেমন কাপড়?

প্রতিভা। সে বলেছে ওরকম পেড়ে কাপড় নাকি এই নূতন উঠেছে। থান কাপড়ে পাড় বসানো।

নির্ম্মলা। তোমার ত কাপড় আছে মা। এ গুলি ছিঁড়ে যাক্, আবার কিনে দেব।

প্রতিভা। হ্যাঁ মা আমাকে এখুনি এক খানা কিনে দেও।

নির্ম্মলা। ছি, মা, তুমি এখন সেয়ানা হয়েছ। অমন করে কি বায়না কত্তে আছে ? এ গুলো ছিঁড়ে যাক্, আস্‌ছে রথের সময় এক খানি কিনে দেব।

প্রতিভা। প্রফুল্লর ত অনেক কাপড় ছিল। তবুত তার বাবা তাকে আবার এই নূতন কাপড় কিনে দিয়েছে! হাঁ মা তুমি আমায় এক খানি অম্নি কাপড় কিনে দাও, আমি আর তোমার কাছে কিছু চাইব না।

নির্ম্মলা। প্রফুল্লরা বড় মানুষ। তাদের টাকা আছে। আমরা টাকা কোথায় পাব মা ?

প্রতিভা। ওদের কেবল টাকা থাক্‌বে, আমাদের কেন থাক্‌বেনা মা ?

নির্ম্মলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"এই অভাগিনীর পেটে জন্মিয়াছিলি তাই"।

প্রতিভা। প্রফুল্লের বাবা কত কাপড় কিনে দেয়, আমার যদি বাবা থাক্‌ত। হ্যাঁ মা তুমি বলেছিলে বাবা মরে গেছে—আর কি বাবা ফিরে আস্‌বে না ?

নির্ম্মলা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মনের আবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

"ওকি নির্ম্মল! তুমি কি চিরকালই অমনি করিয়া কাঁদিবে ? তোমার কান্না কি দূর হইবে না ? সে দিন না আর কাঁদবে না বলে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে! তোমার কান্না দেখে দেখ দেখি মেয়েটা কেমন কচ্ছে" ! এই কথা বলিতে বলিতে প্রমদা প্রতিভাকে নির্ম্মলের কোল হইতে টানিয়া লইলেন। প্রমদা মিত্রদের মেঝ বউ। নির্ম্মলার সঙ্গে বড় ভাব। প্রতিভাকে কোল থেকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি বলিলেন—"যাও মা খেলা কত্তে যাও"। তার পর নির্ম্মলার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—

"আজ আবার কি হয়েছে নির্ম্মল ?"

নির্ম্মল। কি আর হবে ? কাঁদিতে জন্মিয়াছি—চিরদিনই কাঁদিব ?

প্রমদা। কাঁদিয়া কিছু লাভ আছে ?

নির্ম্মল। লাভ নাই জানি—কিন্তু পোড়া চোখের জল যে রাখ্‌তে পারি না। আপনি বেরিয়ে আসে।

প্রমদা। আচ্ছা মেয়েকে কোলে করে অমন করে কান্‌ছিলে কেন বল দেখি ?

নির্ম্মলা প্রমদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রতিভা যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিলেন। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি পয়সা কোথা পাব বল দেখি ভাই! মেয়েটা কিছুতেই বুঝ্‌বে না।"

"মেয়ের আর দোষ কি ? সে সরল ছেলে মানুষ, যাহা মনে আসে, তাই বলে। অমন বয়সে কে না বায়না করে থাকে বল। যাক্ আমি এখনি পাড় বসান কাপড় এনে দিচ্ছি"। এই বলিয়া প্রমদা স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

নির্ম্মলা অতি ব্যগ্রভাবে প্রমদার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী দিদিটী আমার মাথার দিব্য, তুমি অমন কাজ করোনা! তুমি কত দেবে ? তোমার খাইয়াই"—

প্রমদা কথা সম্পূর্ণ হইতে না দিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"দেখ্ নির্ম্মলি! তুই যদি আমার সঙ্গে অমন করিস্, তবে ভাল হবে না। আমার মেয়েকে আমি যা খুশী তাই দিব। তুই তার বাধা দেবার কে লো ? প্রতিভা বুঝি তোরই মেয়ে, আমার নয় কি ?" এই বলিয়া প্রমদা প্রতিভাকে কোলে লইয়া সবেগে আপনার গৃহে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা সেই রোদন-রুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে কেবল বলিল—"প্রমদা! তোর মত যদি সংসারের সবাই হত, তবে আর মানুষের দুঃখ থাক্‌ত না।"

প্রমদা কিছু ক্ষণ পরই প্রতিভাকে এক খানি পাড় বসান কাপড় পরাইয়া কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন। নূতন কাপড় পরিয়া প্রতিভার মুখে আর আনন্দ ধরে না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"দেখ মা, মাসী মা কেমন সুন্দর কাপড় দিয়েছে। আমি যাই প্রফুল্লকে দেখিয়ে আসিগে"। এই বলিয়া সরলা বালিকা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা বলিল—"পাড়টি ত বেশ ভাই। এ কোথায় পাইলে ?"

প্রমদা। থান কাপড় কিনে এনে আমি নিজে এ পাড় বসাইয়া লইয়াছি।

নির্ম্মলা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"নিজে ?"

প্রমদা। কেন তাহা কি বড় অসম্ভব !

নির্ম্মলা। ওত বিলেত থেকে তৈয়ের হয়ে আসে, না ?

প্রমদা। তুমি বুঝি ক'লকাতায় কখনও যাওনি ? ক'লকাতার ঢের লোকে ঐ ব্যবসা করে। এ অতি সোজা কাজ। নিজে কত্তে পাল্লে অতি অল্প পয়সায় হয়। শুদ্ধ দুটো কি তিনটে পয়সা খরচ কল্লেই এক খানি কাপড়ে পাড় বসান যায়।

নির্ম্মলা। তুমি এ কোথায় শিখ্‌লে ?

প্রমদা। আর কোথায় শিখ্‌ব ? তোমার সর্ব্ব-গুণান্বিত ভগিনীপতি শিখিয়ে দিয়েছে। ভাল কথা মনে পড়ে গেল—সে দিন তিনি বল্‌ছিলেন, তুমি চরকায় সুতা কেটে পৈতা তৈয়ের করে বিক্রি কর। তাহাতে খাট্‌তে হয় বেশী, অথচ পয়সা কম। এ কাজটা কল্লে হয় না ?

নির্ম্মলা। কি কাজ, পাড় বসান ? ওকি আমি পারব ?

প্রমদা। কেন পারবে না ? আমি পারি, আর তুমি পারবে না ? এতে তোমার যেমন ঘরে বসে পয়সা উপার্জ্জন হবে, তেমনই মেয়েকে মনের মত কাপড় পরিয়ে খুসীও হবে।

নির্ম্মলা। কিন্‌বে কে ?

প্রমদা। কেন পাড়াপড়শীরা কিন্‌বে। তা ছাড়া সে দিন বাবু বল্‌ছিলেন তৈয়ার কত্তে পাল্লে পাইকেরেরা বাড়ী এসে নিয়ে যাবে।

নির্ম্মলা। কাপড় কিন্‌বার টাকা পাব কোথায় ?

প্রমদা। টাকা আমি দেব।

নির্ম্মলা। তুমি আর কত দেবে ? তোমার স্বামীর আয় বেশী নয়। তোমার সংসার আছে, ছেলে পুলে আছে। না আমার অমন ব্যবসায় কাজ নেই, আমার সুতা কাটাই ভাল।

প্রমদা। আমি কি তোমার পর ? থাক্। আচ্ছা না হয় ধার নিও, বিক্রি হলে আমার টাকা ফিরিয়ে দিও। (নির্ম্মলার থুতিতে হাত দিয়া) এবার হ'ল ত ?

নির্ম্মলা। আচ্ছা কি করে পাড় তৈয়ের কত্তে হয়, বল দেখি।

প্রমদা। পাড় বসাতে দুটী জিনিস চাই। খুব ভাল কাল খয়ের, খয়ের দুই রকমের আছে। যে খয়েরের রং খুব কাল, তাহাই এ কাজের উপযোগী। এই কাল খয়েরকে কোন কোন দেশে 'মঘাই খয়ের'ও বলে। বেনে দোকানে পাওয়া যায়। এক সের কাল খয়েরের দাম ছয় আনা কি সাত আনার বেশী হবে না। তারপর দ্বিতীয় জিনিসটী হচ্ছে বাইক্রোমেট অব পটাস্। এটা যে বিলাতী তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছ। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার খানায় পাওয়া গেলেও যাইতে পারে ; কিন্তু ক'লকাতার বড় বড় বিলাতী ঔষধের দোকানে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। তা'র দামও খুব বেশী নয়। আধ সের (এক পাউণ্ড) দশ আনা এগার আনাতেই পাওয়া যাইতে পারে। এই দুইটী জিনিস এনে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখ। খয়েরটা জলের সঙ্গে মিশিয়া মধুর মত হইয়া যাওয়া চাই।

নির্ম্মলা। মধুর মত বলিলে কেন ?

প্রমদা। মধু জলের মত পাতলা নয়—আবার গুড়ের মত ঘনও নয়। খয়েরের জল যদি তদপেক্ষা পাতলা বা ঘন হয় তবে পাড় ভাল হইবে না। যে থান কাপড়ে পাড় বসা'বে, তাহাতে অধিক মাড় থাকা ভাল নয়, আবার না থাকাও ভাল নয়। অধিক মাড় থাকিলে বা একেবারে না থাকিলে খয়েরের জল সরিয়া পড়ে। তাহাতে পাড় ভাল হয় না। অধিক মাড় থাকিলে কাপড়টা ধুইয়া ফেলিলে ভাল হয়। তারপর পিঁড়ে বা কোন সমান কাঠের উপর যে স্থানে পাড় বসাইবে, তাহা সটান করিয়া রাখ। তারপর পাড়ের দুই পাশের স্থান কোন বস্তুর দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। তালপাতা দ্বারা এ কাজ অনায়াসে হইতে পারে। এখন আস্তে আস্তে একটী তুলি দ্বারা আঢাকা স্থানে অর্থাৎ যেখানে পাড় হবে, তাহার উপর খয়েরের জল বেশ করে মাখাইয়া দেও। উহা শুকাইয়া গেলে বাইক্রোমেট অব পটাশের জলে ধৌত করিয়া লইলেই বেশ কটা রঙ্গের ফিতা পেড়ে

কাপড় হইবে। আর পাড়টা যদি চিত্র বিচিত্র করিতে চাও, তবে সন্দেশের ছাঁচের মত ইচ্ছামত কাঠের ছাঁচ তৈয়ার করিয়া লইলেই হইতে পারে। বাইক্রোমেট অব পটাসের জল শুকাইয়া গেলে পরিস্কার জলে কাপড়খানি ধৌত করিয়া লওয়া আবশুক। এতে দেখ্‌বে ঘরে তোমার দু পয়সা আস্‌বে, এবং মেয়ের বায়নাও পূর্ণ করিতে পারিবে।

নির্ম্মলা। তুমি ত শুধু কটা রঙের পাড়ের কথাই বলিলে। আর কোন রঙের পাড় হয় না কি ?

প্রমদা। আমাদের বাবু বলেছেন—আরও অনেক রঙের পাড় প্রস্তুত করা যায়। সেগুলি তাঁর কাছ থেকে জেনে আর একদিন তোমায় এসে বলে যাব। সন্ধ্যা হয়ে এল, এখন যাই ভাই। সব কাজ পড়ে আছে।

নির্ম্মলা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। আমরাও আজিকার মত এইখানে পট নিক্ষেপ করিলাম।

আমেরিকার কথা।

নিউইয়র্ক—দ্বিতীয় পত্র।

গত বারে নিউইয়র্ক সহরের অনেক কথা বলিয়াছি, এবারে সেথানকার লোকের কথা কিছু বলি।

তোমরা জান যে পূর্ব্বে আমেরিকা এক অসভ্য জাতির বাসভূমি ছিল। তাহাদিগকে ইণ্ডিয়ান কহিত, আমরাও ইণ্ডিয়ান—আমরাই খাটি ইণ্ডিয়ান; কিন্তু আমেরিকা প্রথম আবিষ্কৃত হইলে লোকের তাহাই আমাদের এই ভারতবর্ষ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা তাহাকে ইণ্ডিয়া নামেই ডাকিতে আরম্ভ করে; এবং দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে ইণ্ডিয়ান নাম দান করে। ক্রমে সে ভ্রান্তি দূর হইলেও প্রাচীন নাম থাকিয়া গেল। এখনও আমেরিকার অজ্ঞ লোকেরা ইণ্ডিয়ান বলিলে তাহাদের দেশের সেই প্রাচীন আদিম, অসভ্য জাতির লোকই বুঝিয়া থাকে। এজন্য আমরা আমেরিকাতে আপনাদিগকে প্রায় ইণ্ডিয়ান বলিয়া পরিচয় দেই না; সর্ব্বদাই হিন্দু বলিয়া থাকি।

আমেরিকার সেই আদিম অধিবাসীদিগকে আমি দেখিয়াছি কিনা, অনেকেই আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাদের একটিকেও দেখি নাই। নিউইয়র্কে মাঝে মাঝে পথের ধারে, তা'দের কাঠের প্রতিমূর্ত্তি, দোকান পসারীর পণ্য দ্রব্যের ছবি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু যে পাঁচ মাস আমেরিকার নানা স্থানে বেড়াইয়াছি, তার মধ্যে কোথাও একদিনও এক জন ইণ্ডিয়ান দেখি নাই।

ইউরোপের লোকেরা আমেরিকায় যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে, কতক বা তাহাদের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া, কতক বা আপন আপন ভূমি খণ্ড হইতে তাড়িত হইয়া, আর কতক বা মদ্যপানাদি ইউরোপীয় সভ্যতা অনুকরণ করিতে যাইয়া, অনেক ইণ্ডিয়ান জাতিই একেবারে লোপ পাইয়াছে। এখনও যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা নিউইয়র্ক হইতে অনেক দূরে, এক স্বতন্ত্র ভূমি খণ্ডে, স্বজাতিগণ মধ্যে বাস করে। আমেরিকার বড় বড় সহরে তাহাদের প্রায় গতি বিধি নাই।

এখন আমেরিকা ইংরাজ, ফরাশিশ্‌, জার্ম্মান, ইটালিয়ান প্রভৃতি ইউরোপীয় লোক দিগের বাসভূমি হইয়াছে। নিউইয়র্কে এই সকল দেশের লোকই আছে; তবে মোটের উপরে ইংরাজই প্রধান বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু জাতিতে ইংরাজ হইলেও, এখানকার লোকেরা বিলাতের লোকদের অপেক্ষা কোনও কোনও বিষয়ে অনেক বিভিন্ন। আমার নিকট ইহাদের স্বভাব চরিত্র ও রীতি নীতি বিলাতের সাধারণ ইংরাজদিগের স্বভাব চরিত্র ও রীতি নীতি অপেক্ষা, কোনও কোনও অংশে অনেক শ্রেষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছে।

প্রথমতঃ বিলাতের লোকেরা এদের মত এমন সরল, এমন অমায়িক ও এমন মিশুক নহে। বিলাতেও আমার অনেক বন্ধু বান্ধব জুটিয়াছিল, সেখানেও অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ আত্মীয়তা হইয়াছিল, অনেকের স্নেহ, প্রীতি, প্রেম ও সহানুভূতি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে সেখানে এই প্রকার উদার ভাব দর্শন করি নাই।

বিলাতে কেহ কাহারও খর্পর বড় একটা লয় না। এক বাড়ীতে থাকি, একই সিঁড়িতে উঠি নামি দিনে সাত বার করিয়া উঠিতে, নামিতে, সিঁড়িতে, গলিতে, সদর দরজায় মাথা ঠুকাঠুকি হয়, অথচ কখনও একটা কথা পরস্পরের সঙ্গে কহি নাই; হোটেলে বা বাসাতে বাড়ীতে এ ঘটনাটা সর্ব্বদাই ঘটিত কিন্তু এখানে সেরূপ দেখিলাম না। যেই আমি হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, অমনি হোটেলের অপর লোক, স্ত্রী, পুরুষ সকলে, আমার সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য—আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিবার জন্য—আমার দেশের নানা বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। এটী আমেরিকায় নূতন ব্যাপার দেখিলাম।

আমি বৈকালে হোটেলে গিয়া উপস্থিত হই। সন্ধ্যার সময় হোটেলের আহারের নিয়ম। আমি যে হোটেলে উঠি, সেখানে তখন প্রায় ত্রিশ জন লোক নিয়মিত মত বাস করেন। আমেরিকায় হোটেলে থাকাটা একরূপ প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরকন্নার ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য, অনেক লোক সপরিবারে হোটেলে চিরদিন বাস করেন। সপ্তাহে সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট টাকাটা ফেলিয়া দিলেই হইল, আর কোন উৎপাৎ নাই। কি খাইব, কি রাঁধিব, এ ভাবনা নাই। চাকর খাটাইবার জন্য সময় ও শক্তি ক্ষয় করিতে হয় না। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত আহার জুটিয়া যায়। আর আপন আপন ঘর, আপনার বাড়ীরই মত। সেখানে বন্ধু বান্ধবদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারা যায়; অতিথি সৎকারের প্রয়োজন হইলে হোটেলেই, উপরি পয়সা দিয়া, তারও সুবন্দোবস্ত করা সহজ; এই কারণে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার এখন নিউইয়র্ক সহরে, এই সকল হোটেলে বাস করেন। আমার হোটেলেও এরূপ দু চারিটী পরিবারের বাস ছিল। ইহাদের কাহারো সন্তান সন্ততি ছিল না, আর দু এক জনের ছোট ছোট ছেলে পিলেও ছিল। সন্ধ্যাকালে আহারের স্থানে গিয়া দেখি সেখানে প্রায় পঞ্চাশ জন স্ত্রী পুরুষ আপন আপন স্থানে বসিয়া গিয়াছেন। হোটেল স্বামী, আমাকে দেখিয়াই সাদর অভ্যর্থনা করিয়া একটা টেবিলে নিয়া বসাইয়া দিলেন। সেই টেবিলে যাঁহারা আহার করিতেছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার ইতিমধ্যেই আলাপ পরিচয় হইয়াগিয়াছে; সুতরাং সেখানে বসাতে আমার সুবিধাই হইল।

আহারান্তে কেহ কেহ আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন; আর কেহবা সর্ব্বসাধারণের জন্য একটা বড় বসিবার ঘর আছে, সেখানে আসিয়া বসিলেন। আমিও সেখানে গিয়া বসিলাম, তখন সকলে আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া বসিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি আগ্রহ সহকারে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

ফলতঃ আমেরিকাকে একরূপ স্ত্রীরাজ্য বলা যাইতে পারে। বিলাতের স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীন ভাবে যেখানে সেখানে গমনাগমন করেন। সেখানেও পরিবারের মধ্যে ও সামাজিক অনুষ্ঠান'দিতে স্ত্রীপুরুষে খুবই মিশামিশি হয় বটে, কিন্তু স্বাধীনতাটা আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের যেমন স্বাভাবিক ভাবে পরিণত হইয়াছে, বিলাতের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সেরূপ কখনও হয় নাই। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সত্বেও বিলাতের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা কেমন যেন একটা সঙ্কুচিত ভাবে চলেন ফেরেন, দেখিয়া বোধ হয় এখনও যেন এই স্বাধীনতায় তাঁহারা সুন্দর রূপে অভ্যস্ত হয় নাই। আপনার আত্মীয় স্বজন বা কোনও পূর্ব্ব পরিচিত লোকে মাঝে পড়িয়া আলাপ পরিচয় না করাইয়া দিলে, বিলাতের কোনও ভদ্রমহিলা কাহারও সঙ্গে মুখ ফুটিয়া কথা কহিবেন না। এক বাড়ীতে তোমার সঙ্গে তাঁ'র বাস হইতে পারে, এক গাড়ীতে তোমার সঙ্গে তিনি দশ ঘণ্টা যাইতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ না কেহ সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া তোমার সঙ্গে তাঁ'র পরিচয় করাইয়া দিয়াছে, ততক্ষণ তিনি কদাপি তোমার সঙ্গে একটীও বাক্য বিনিময় করিবেন না। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা অতটা বাঁধাবাঁধির ভিতরে নাই। ইচ্ছা হইলে, বা প্রয়োজন হইলে, তাঁরা নিঃসঙ্কোচে আসিয়া তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিবেন।

আমেরিকার রমণীগণের এই মুক্তভাবের একটা

প্রধান কারণ এই যে, সেখানে বহুকাল হইতে, বিদ্যালয় সমূহে, বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণের একশ্রেণীতে একই সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ভাই বোন যেমন সহজ, সরল ভাবে, একসঙ্গে পরিবারের মধ্যে বাড়িয়া উঠে, এবং কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক অধীনভাব তাহাদের মধ্যে জোর করিয়া আনিয়া না দিলে, তাহারা যেমন পরস্পরের সঙ্গে সর্ব্বদাই নিঃসঙ্কোচে, মুক্ত ভাবে ব্যবহার করে, সেইরূপ নির্ম্মল শৈশবাবধি এক শ্রেণীতে, একই সঙ্গে যুবক যুবতীতে মিলিয়া বিদ্যাভ্যাসাদি করাতে, তাহাদের মধ্যেও ঐরূপ একটা মুক্তভাব জন্মিয়া যায়। আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের পুরুষদিগের সঙ্গে চলা ফেরাতে যে একটা সহজ, সরল, মুক্তভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ।

এই সকল রমণীদের সকলেই স্বল্প বিস্তর সুশিক্ষিত। একজন কুমারী উকিল বাড়ীতে কেরাণীর কার্য্য করেন। আর একজন এই সহরে দন্ত চিকিৎসা করেন। তাঁর দন্ত চিকিৎসার একটা দোকান আছে; সমস্ত দিন সেখানেই থাকেন, হোটেলে আসিয়া দুবেলা আহার করেন, ও রাত্রিকালে বাস করেন। ইনি এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দন্ত চিকিৎসার উপাধি পাইয়াছেন। ইনি পিতৃহীন; কিন্তু মাতা, একটি বড় ভাই, ও একটি ছোট ভাই আছেন। বড় ভাইটি কিছুদিন হইতে রুগ্ন হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মাতা ও ছোট ভাইয়ের ভরণপোষণ পিতার মৃত্যু হইতে ইনিই করিয়া আসিতেছেন। বড় ভাইএর সামান্য আয় ছিল, তাহাতে তাঁহার আপনার স্ত্রীপুত্রের ভার বহন করাই কষ্টকর ছিল। এখন ভাই পীড়িত, সুতরাং উপার্জ্জনক্ষম ভগ্নীই তাঁরও পরিবারের ব্যয় ভার বহন করিতেছেন! এই যুবতির বয়স ২৮।২৯ বৎসর মাত্র। যেরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া, দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, অতি সামান্য ভাবে থাকিয়া, যেরূপে আপনার জননীর, ছোট ভাইয়ের ও বিপন্ন অগ্রজের পরিবারবর্গের সেবা করিতেছেন, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। মেয়ে ত দূরের কথা, ছেলেরাও প্রায় ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে, মা, ভাইয়ের জন্য এতটা স্বার্থত্যাগ করেনা। আমি একদিন প্রসঙ্গক্রমে ইঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা কখনও হয় কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনি বলিলেন,—"আমার ছোট ভাই গুলি যতদিন না মানুষ হইয়াছে, আমি বিবাহের কল্পনাও করিতে পারি না!!" আর একটি কুমারী আমাদের হোটেলে থাকিয়া চিত্রবিদ্যা শিখিতেছেন; অপর এক জন একটু অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক—শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন। ইঁহারা সকলেই অতি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ইঁহাদের সাধারণ শিক্ষা ও শীলতা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

আমাদের হোটেলে যত মহিলা আছেন, তাঁহাদের একজনার সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে। বিদেশী বলিয়া ইনি আমাকে কত যে যত্ন করেন বলিতে পারি না। যে দিন নিউইয়র্কে পৌঁছি, সেই দিনই ইনি অযাচিত ভাবে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। তার পর দিন হইতে তাঁর টেবিলে গিয়া এক সঙ্গে আহার করিতে আরম্ভ করেন, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয় যাহাতে আমার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, ও আমার কাজ কর্ম্মের সুবিধা হয়, মায়ের মতন তাহার চেষ্টা করিতেন। ইঁহার বয়স প্রায় ৮৪ বৎসর হইবে; কিন্তু এ বয়সেও তাঁহাকে অসাধারণ রূপসী বলিয়াই মনে হয়। যদিও বয়োধিক্য নিবন্ধন স্বভাবতঃই তাঁহার চর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে লোল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কিন্তু তাহাতে তাঁহার মুখাকৃতির সুঠাম গঠন, বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের কিছুই হ্রাস হয় নাই। এইরূপ ছবি ও প্রতিমূর্ত্তিই গ্রীক দেশীয় কলাশিল্প অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ফলতঃ এরূপ বর্ণের আভা, এমন সুদীর্ঘ, অথচ অসাধারণ সৌম্য দেহযষ্টী, এমন কোমল প্রতিভাব্যঞ্জক রমনীমুখ ছবিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু জীবন্ত মানুষে আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইনি অন্ধ, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়সে এক অতি রূপবান্ ও গুণবান্ পুরুষের সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে বিবাহ দিনেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া স্বামীর প্রাণনাশ হয়। একরূপ বাসর ঘরেই বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া

নিদারুণ শোকে ছয়মাস কাল মধ্যে ইহার চক্ষু দুটী এক বারে নষ্ট হইয়া যায়। আপনার জীবন-কাহিনী বলিতে বলিতে, ইনি আমাকে বলিলেন যে এই রূপে পতিহীন করিয়া, অকূলে ভাসাইয়া দিয়া, বাহিরের সুখসম্পদ ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিয়া, কেবল আধ্যাত্মিক সম্পদ, সুখ ও সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার জন্যই যেন বিধাতা পুরুষ দয়া করিয়া আমার চক্ষুর আলো নিভাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা কেহই প্রথমে শোক ও দুঃখের মঙ্গল অভিপ্রায় ধরিয়া উঠিতে পারি না। আমিও তাহা ধরিতে পারিনাই, তাই অসহ্য যাতনা ভোগ করি। চক্ষু দুটী ফিরিয়া পাইবার জন্য কত যে চেষ্টা করিয়াছি বলিতে পারি না। কিন্তু এখন আর আমার কোনও ক্লেশ নাই। আমি আর এক আলোকে এখন যেন সংসারের সুখ ও সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতেছি।"

পতিহীন হইয়াই ইনি একরূপ অকূলে ভাসিয়া ছিলেন। এখন চক্ষুহীন হইয়া আরো একেবারেই অসহায় হইয়া পড়িলেন। ইহার পিতৃপরিবার অতি সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন। কিন্তু যদিও ভ্রাতারা আদর করিয়া তাঁহাকে আপনাদের বাড়ীতে ডাকিলেন, ইনি আজন্মকাল এইরূপে তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকা নিতান্ত ক্লেশকর হইবে মনে করিলেন। তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত যুবতীগণ যেরূপ সুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, ইনি তাহা লাভ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাতে গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেও, জীবিকা উপার্জ্জন সহজ হয় না। এইজন্য উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ইনি পতির মৃত্যুতে যে অতি সামান্য অর্থের উত্তরাধিকারী হন, তদ্বারা এক উচ্চ শ্রেণীর অন্ধ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে শিক্ষা সমাপন করিয়া ক্রমে দু চারিখানি সুন্দর উপন্যাস রচনা করেন। এখন ইহাতেই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এ পর্য্যন্ত কোনও পদ্য গ্রন্থ না লিখিলেও, ইঁহার কবিত্ব শক্তি অসাধারণ এবং লিপিচাতুর্য্য অতি মনোহর। এই লিপিচাতুর্য্যের জন্য আমেরিক সমাজে ইনি বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ঘরের লক্ষ্মী।

(পারিবারিক চিত্র।)

(অ)

শশাঙ্ক শেখরের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, গৃহে অনেকগুলি পরিবার—মা, স্ত্রী, ছোট বড় দুটি বিধবা ভগিনী, একটী পুত্র ও একটি কন্যা। তিনি মাতুলালয়ে প্রতি পালিত হইয়াছিলেন, একটি বিধবা মামীর প্রতি-পালনভারও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; অথচ গ্রামের মুনসেফী আদালতে কেরানীগিরি করিয়া তিনি মাসে পঁচিশটি টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিতেন। পরলোক-গত মাতুলের পরিত্যক্ত জোত জমা দুই চারি বিঘা ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে জমীদারের খাজনার অতিরিক্ত অধিক কিছু উৎপন্ন হইত না।

শশাঙ্কশেখর ব্রাহ্মণ—উচ্চশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। তাঁহার পিতামহ ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত বিবাহের ব্যবসায় চালাইতেন, খাতা বাহির করিয়া না গণিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুরালয়ের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিতেন না। শশাঙ্কের পিতা শশিশেখর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও কৌলিন্য মর্য্যাদা রক্ষায় উদাসীন ছিলেন না, তিনি পাঁচটি কুলিন দুহিতার যৌবন তরণীর কর্ণধার হইয়াছিলেন; কিন্তু শশাঙ্কশেখর দুর্ম্মতি বশতঃ তাঁহার পিতা-পিতামহ-প্রদর্শিত উচ্চ আদর্শের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশপূর্ব্বক এক মাত্র পত্নী কাঞ্চন মালাকে লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, এজন্য সে কালের কৌলিন্য সংরক্ষণনিপুণ পল্লীবৃদ্ধগণ অনেক সময়েই শশাঙ্ককে কুলপাংশুল নামে অভিহিত করিতেন এবং একালের খৃষ্টানী শিক্ষা দেশের সনাতন রীতিনীতি নষ্ট করিয়া ফেলিল বলিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন।

শশাঙ্কের স্ত্রী কাঞ্চনমালার সংসারে কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না, শাশুরী নিস্তারিণী দেবীই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি পতিপ্রেমে চিরবঞ্চিতা ছিলেন বলিয়াই হউক, কি পুত্রবধূর প্রতি পুত্রের অনুরাগ চিরন্তন কৌলিন্য প্রথা অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়াই হউক, তিনি কাঞ্চনমালার

প্রতি প্রসন্না ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আজ কাল বর নামক পণ্য দ্রব্যের এই মহার্ঘ্যতার দিনে যদি তাঁহার কুলিন পুত্র পাঁচ সাতটি কুলিন কুমারীর 'কুমারী' নাম হরণ করিতেন, তবে তাঁহার গৃহে স্বর্ণ রৌপ্যে আট দশ হাজার টাকা অতি সহজে উপস্থিত হইত, আর সে টাকা গুলি সুদে খাটাইলে তাঁহার বার্দ্ধক্য জীবন ধর্ম্ম কর্ম্ম, ব্রত নিয়ম ও তীর্থ ভ্রমণাদি দ্বারা পরম সুখে অতিবাহিত হইতে পারিত।

কিন্তু কাঞ্চনমালা একালের লেখা পড়া জানা মেয়ে হইয়াও ঠিক সেকেলে মেয়ের মত শাশুড়ী ননদগণের সকল অত্যাচার সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার ন্যায় অবিচলিত ভাবে সহ্য করিতেন। একমাত্র পতিপ্রেম ভিন্ন সংসারে তাঁহার অন্য সুখ ছিলনা, এবং অন্য সুখ না থাকিলেও সেজন্য তাঁহার হৃদয় কোন দিন কাতর হয় নাই। পল্লী গ্রামের অন্যান্য গৃহস্থ বধূর ন্যায় বধূত্ব হইতে ধীরে ধীরে তিনি জননীত্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাই পঁচিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মুখে চোকে ও সর্ব্বাবয়বে যৌবন মাধুর্য্য পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত না থাকিলেও তাঁহার পবিত্র অঙ্গের প্রত্যেক ভঙ্গিতে এমন একটী স্নেহ-কোমল মাতৃত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যাহার সহিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতীর রূপানল-শিখার কিছু মাত্র তুলনা হইতে পারেনা, সেই কোমলতার সহিত ধৈর্য্য ও মহত্ত্ব সম্মিলিত হইয়া তাঁহার নারী হৃদয় রাণীত্ব দ্বারা বিমণ্ডিত করিয়াছিল।

একদিন মধ্যাহ্নে শশাঙ্কের বিধবা ছোট ভগ্নী পার্ব্বতী ব্যস্ত ভাবে আসিয়া বলিল, "মা, বৌ কালরাত্রে কি করেছিল শুনেছিস্? আমি ত আর লজ্জায় বাঁচিনে, কি ঘোর কলিই যে হোলো!"

মা বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, "বৌর গুণ সবই ত জানা আছে। কি বিবিআনা চালই শিখেছেন! কলিকাতা হ'তে আবার খবরের কাগজ আনিয়ে পড়া হয়, গেরস্তর ঘরের ঝি বৌর কি এত বেহায়াপনা ভাল? আমার কোন পুরুষে যা হয়নি এই আবাগের বেটী হতে তাই হোলো"—গৃহিণী অঞ্চল বিস্তীর্ণ করিয়া হস্ত পদ প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার উপর বিশ্রাম করিতেছিলেন, বক্তৃতার সুরের মাত্রাধিক্য বশতঃ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "মরুক নচ্ছার বেটি, কাল আবার করেছে কি?"

"আর করেছে কি! খবরের কাগজ ত ভাল, একটা ছড়া লিখেছে, এই দেখ আমি চুরি ক'রে এনেছি। কাল লিখে গুন্ গুন্ করে পড়া হচ্ছিল, আমি শুনেছি, কি লজ্জা!"—পার্ব্বতী তাহার লজ্জার পরিমাণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মায়ের কাছে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

গৃহিণী কাগজ খানি হস্তে লইয়া বজ্রাহতের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সক্রোধে বলিলেন, "ডাক্‌তো ও বাড়ীর কেষ্টো দাসকে!" 'কেষ্টোদাস' গৃহিণীর জ্ঞাতি ভ্রাতা, বয়স বার বৎসর। গ্রামের পাঠশাল হইতে পাশ করিয়া মাসিক দুটাকা জলপানী পাইয়াছে; এখন ছাত্রবৃত্তি পড়িতেছে।

পার্ব্বতী মায়ের এ সকল ফরমাস্ খাটিতে অত্যন্ত নিপুণা,—এ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য নারদের ঢেঁকির মত সে সর্ব্বত্র ঘুরিতে পারিত। অনতিবিলম্বে কেষ্টোদাস গৃহিণীর সম্মুখে হাজির হইল। গৃহিণী কেষ্টোদাসের বিদ্যাবুদ্ধি ও ভবিষ্যতে বিবাহে বহু অলঙ্কার সমেত রাজকন্যা সমতুল্যা বধূ লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়া বলিলেন, "কেষ্টোদাস এই লেখনটা পড় তো, বড় বড় ক'রে পড়।"

কেষ্টদাস বক্তৃতার সুরে আরম্ভ করিল—

বঙ্গবীর!

তোরা কি চেতনা হারা, মূঢ়, হীন বল,
নারী গর্ভে হয় নি কি জনম তোদের?
রমণীর স্নেহ স্তন্য, রমণীর প্রেম
করেনি কি ও হৃদয়ে পৌরুষ সঞ্চার?
তবে কেন যাস্ ভীরু দূরে পলাইয়া
প্রেয়সীরে, জননীরে ফেলিয়া বিপদে?
নিরাশ্রয়া বেপমানা লজ্জা-নম্র নারী;
অপমান করে তারে পাষণ্ড নারকী!
রাখিতে তাদের মান সাধ্য যদি নয়,
বন্ধ করি রাখ তবে রুদ্ধ অবরোধে;
রেলপথে বাষ্পপোতে আনা নাহি সাজে,

কুকুরে যাদের মান নাশে অবহেলে।
মান চেয়ে বড় যার পরাণের মায়া,
তার চেয়ে বিশ্বে নাহি অধম বেহায়া।

কাঞ্চনমালার পিতা ইন্দুভূষণ বাবু সে কালের সিনিয়ার স্কলার, জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টারী করিয়া তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সে কেলে হইলেও ইন্দুভূষণ বাবু আধুনিক তন্ত্রের লোক, স্ত্রী শিক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল এবং কন্যা কাঞ্চনমালার শিক্ষাদান-কার্য্যে তাঁহার সে অনুরাগ সুপ্রকাশিত হইয়াছিল। কাঞ্চনের এক আধটু কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল, কবিতা লিখিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে স্বামীকে পড়িয়া শুনাইতেন; ইহাতে মুন্সেফী আদালতের কেরাণী মহাশয়ের সমস্ত দিনের শ্রান্তি অনেক পরিমাণে লঘু বোধ হইত। একদিন কঠোর পরিশ্রমের পর শশাঙ্কশেখর শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছেন, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। শশাঙ্ক দরিদ্রের কবি, কবিকঙ্কণের রচিত বাঙ্গালীর চিরদুঃখময় নিরন্ন জীবনের মহাকাব্য 'চণ্ডী' পাঠ করিতেছিলেন, খুল্লনার 'বার মাস্যার' দরিদ্র জীবনের উজ্জ্বল চিত্র পাঠে তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্য-লিপ্সু হৃদয় করুণা-প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে কাঞ্চনমালা সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক চম্পকাঙ্গুলীতে মৃৎপ্রদীপের আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "কি ভাগ্যি! নথি নিয়ে না ব'সে আজ যে পুঁথি নিয়ে বসা হয়েছে; বাঙ্গলা বই যেই আমার দুই এক খানা ছিল, তাই রক্ষে, হরফ গুলো কোন রকমে আজও ভুল্‌তে পারনি।"

শশাঙ্ক মুখের সম্মুখ হইতে পুঁথি সরাইয়া বলিলেন, "তোমার ঠাট্টা আজ কাল বড় ধারালো হয়েছে দেখ্‌চি, বাঙ্গলা খবরের কাগজ গুলো প'ড়ে বুঝি? যাহোক, বাঙ্গলাটা তোমার মাতৃভাষা আর আমার কেউ নয়, তা তো আর নয়—কাজেই তোমার চেয়ে আমার মনে যে এতে কম আনন্দ হয় তা মনে করোনা। দেখ খুল্লনার দুঃখ পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আমাদেরই জীবন কাহিনী পড়চি, কিন্তু সে কালের সে সুখ, সে শান্তি দেবতার উপর তেমন নির্ভর আর আমাদের নেই।"

"সে দোষ ত আর আমাদের নয়"-বলিয়া কাঞ্চন খাটের ধারে স্বামীর পাশে বসিলেন, বালিসের কাছে পানের ডিবেটা ছিল, তাহা খুলিয়া বলিলেন, আজ পান গুলোর উপর এত অযত্ন কেন? অন্য দিন ত এতক্ষণ ডিবে প্রায় খালি হয়ে যায়!"

শশাঙ্ক বলিলেন, "লেখা পড়া শিখে একেবারে দেশের সর্ব্বনাশটা কল্লে! পানে চুণ হয় ত খয়ের হয় না, মাছে নুন হয় ত ঝাল হয় না।"

"তা বলে পাতে ত আর কিছু পড়ে থাক্‌তে পায় না, আর পাতের প্রসাদ—"

বাধাদিয়া শশাঙ্ক বলিলেন,"ভারি নেমকহারাম তুমি!"

"তা আমি মানি, কিন্তু এই নেমকহারাম গুলোকে নিয়ে তোমাদের মান রক্ষে দিন দিন শক্ত হয়ে উঠ্‌চে।" শশাঙ্ক হাসিয়া বলিলেন, "ও আবার কি হেঁয়ালি—একটু পরিষ্কার করে না বল্লে ও সব বুঝ্‌তে পারিনে। মুখ্‌খু কেরাণী মনুষ্য!"

বিছানার নীচে হইতে একখানা সংবাদ পত্র বাহির করিয়া কাঞ্চনমালা বলিলেন, "আজ কাগজ পড়নি বুঝি? শোন, (পাঠ আরম্ভ) 'একজন বাবু রাণাঘাট হইতে রেল পথে সস্ত্রীক গোয়ালন্দ যাইতেছিলেন, একটা ফিরিঙ্গি গার্ড সেই কামরায় প্রবেশ পূর্ব্বক সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করে, বাবুজি ইহাতে আপত্তি করায় সাহেব তাঁহার পত্নীর উদ্দেশে অনেক অশ্লীল কথা বলিয়া সে কামরা ত্যাগকরে। বাবু সস্ত্রীক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ছিলেন, সে কক্ষে অন্যলোক ছিলনা। যথাকালে বাবু সাহেবের নামে নালিশ করিলেন, সাহেব গার্ড জবাব দিয়েছে যে সে অসদভিপ্রায়ে উক্ত স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেয় নাই, গাড়ীর জানালা দিয়া সে পা বাহির করিয়া ঘুমাইতেছিল, কোন প্রকার দুর্ঘটনার আশঙ্কায় গার্ড তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। বাবুর স্ত্রীকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। বাবুজি কোন উপায়ে স্ত্রীকে সাক্ষীর দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এবং মোকদ্দমা মিটাইবার জন্য গার্ড সাহেবকে তিনি খেসারত দিয়াছেন'।"

শশাঙ্ক প্রশান্ত চিত্তে বলিলেন, "এ আর নূতন কথা

কি ? এর পরে সাহেব তোমাদের অঙ্গ স্পর্শ করলে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে কর্‌ব।"

কাঞ্চন মুখ খানি লাল করিয়া বলিলেন, "তার পূর্ব্বে যেন আমাদের চিতায় স্থান হয়। আমি একটা কবিতা লিখেছি, সংশোধন করে দেবে ?"

"আমি গুরুমারা বিদ্যের ধার ধারিনে। পড় শুনি।"

কাঞ্চন নত মুখে বলিলেন, "তুমি পড়।"

"না তুমিই পড়, বেশী মিষ্টি লাগ্‌বে।"

ধীরে ধীরে সুস্পষ্টস্বরে কাঞ্চনমালা তাঁহার রচিত 'বঙ্গবীর' নামক ক্ষুদ্র চতুর্দ্দশ পদী কবিতাটী পাঠ করিলেন।

সেই রাত্রে কবিতা পাঠ করিয়া কাঞ্চনমালা শশাঙ্ক শেখরের নিকট যে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক পতিসোহাগিনী সাধ্বী সতীর চির কামনার সামগ্রী,—একটী পবিত্র, অমৃত ময়, আগ্রহ ভরা প্রেমচুম্বন।

পরদিন মধ্যাহ্নে কাঞ্চনমালা যখন রন্ধন কার্য্যে রত ছিলেন, সেই সময়ে পার্ব্বতী ধীরে, ধীরে, তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই কবিতাটী অপহরণ করিয়া জননীর নিকট একটী অতি আবশ্যকীয় সংবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল।

কেষ্টদাসের মুখে কবিতা শুনিয়া গৃহিণী তক্ষক সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল ছড়াটার মধ্যে ভারি কদর্য্য রসিকতা আছে; কেষ্টোদাস পড়িয়াছে, ইহাতে নারী গর্ব্ব, রমণীর প্রেম, স্তন্য, অধম, বেহায়া প্রভৃতি কথা যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই এখানি গুপ্ত প্রেম লিপি—লেখা পড়া জানা বৌ ঘরে আনিয়া তাঁহার মনস্তাপের আর সীমা ছিলনা।

দুই এক দিনের মধ্যেই ঘাটে পথে কাঞ্চনমালার কলঙ্ক-কাহিনী ছড়াইয়া পড়িল। যাহাদের সামান্য অক্ষর পরিচয় ছিল, সেই সকল রমণী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতে লাগিল, "লেখা পড়া যে আমরাও না জানি তা নয়, তবে কিনা বাড়ুয্যে বৌর সবই বাড়াবাড়ি।' যাহারা লেখা পড়ার কোন ধার ধারেনা তাহারা বলিল "ঐ সব কলঙ্ক ভয়েই ত আমরা লেখা পড়া শিখিনি, গেরোস্তার ঝি বৌ ভাত রাঁধ, ছেলে পেলে মানুষ কর, বেশ, ও আবার কি অভ্যেস!" বাড়ী বাড়ী মেয়েদের বৈঠক বসিতে লাগিল। কাঞ্চনমালার ননদদ্বয়ের কাছে যাহারা ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করিল তাহারা জানিল, কাঞ্চনের লিখিত একখানি প্রেমলিপি ধরা পড়িয়াছে, পত্রখানি ছড়ায় লেখা, বালিসের নীচে পাওয়া গিয়াছে।

শশাঙ্ক একদিন রাত্রে আহার করিতে বসিয়াছেন, কাঞ্চন মাসীমার কি একটা ফরমাস খাটিতে তাঁহার ঘরে গিয়াছে। শশাঙ্কের মা আসিয়া দুই একটি কথার পর ছেলেকে বলিলেন, "বাবা, কলঙ্কে ত আর কান পাতা যায় না।"

শশাঙ্ক মুখ তুলিয়া বলিলেন, "লোকের মিথ্যা কথায় কান না দিলেই হোলো। মুখ বন্ধ করবার ক্ষমতা এক রাজার আছে—তাও কেবল সংবাদ পত্রের। লোকের মুখ বন্ধ না হলে আর উপায় কি ?"

"উপায় আছে বাবা, বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও; চোখের আড়াল হলেই লোকের গঞ্জনা কমে যাবে।''

"সে কি ক'রে হবে মা ? তারা নিতে টিতে আসেনি, আর কি দোষেই বা বৌকে ত্যাগ করবো ?"

বড় ভগিনী নৃত্য কালী আসিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্‌ শশা, তুই একেবারে উচ্ছন্ন গিয়েছিস্‌, মা বলছেন একটা কথা, আর তোর কাছে বৌই বড় হ'লো! আমার হাতে কিছু থাক্‌লে মাকে নিয়ে এখনই ছিরিবিন্দাবন চলে যেতাম, ছিঃ—এসংসারে কি একদণ্ড থাক্‌তে আছে ?"

শশাঙ্কশেখর বলিলেন, "বড়দি, তুমি আমার দোষ দিচ্ছ এ বড় অন্যায়, আমি অকারণে বৌটাকে বিদেয় করে দিই কি করে বল দেখি ?"

"হ্যাঁ, এখন এই রকমই হবে! মাতৃ আজ্ঞা চেয়ে বৌই এখন বড় হবে। এক কাজ করিস্‌, এক গাছা শিকে টাঙ্গিয়ে তার উপর বৌকে বসিয়ে রাখিস্‌, আর সকালে সন্ধ্যেবেলা তার যুগল চরণ মাথায় ধরিস্‌।"

"তা হলে পাড়া প্রতিবাসীরা বুঝি গঞ্জনা ছেড়ে ধন্য ধন্য করবে ?" ঈষৎ হাসিয়া শশাঙ্ক এই উত্তর দিলেন।

পরদিন পাড়ার সকলে জানিতে পারিল, কুলিন কুল-পাংশুল শশাঙ্কশেখর বন্দোপাধ্যায় মাতৃ আজ্ঞা অপেক্ষা পত্নীকে বড় করিয়াছে। তেতাল্লিশটী কুলিন কন্যার ভবার্ণবের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ষোড়শী ভার্য্যার পরামর্শে অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধা জননীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; শশাঙ্কশেখরের মাতৃ ভক্তি হীনতায় তাঁহার ভক্তি-গঙ্গায় সহসা ভয়ঙ্কর জোয়ার উপস্থিত হইল। তিনি সান্যাল বাড়ীর পাশার আড্ডায় সুবাসিত তামাকের ধোঁয়া নাক মুখ দিয়া উদ্গীরণ পূর্ব্বক বলিলেন, "স্ত্রৈণটার মাথায় ঘোল ঢেলে তা'কে গাঁ হতে দূর করে দাও, নৈলে সে এ দেশের ছেলে গুলিকে বেবাক বিগ্ড়ে দিবে।"

শশাঙ্কশেখরের ঘরে ও বাহিরে গঞ্জনার সীমা রহিল না। মুন্সেফ বাবুও শশাঙ্কের নথি পত্র অসায়েস্তা দেখিয়া যেন অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে কিন্তু এমন ছিলনা। শশাঙ্কের মাতৃদ্রোহের কথা নানা আকারে পল্লবিত হইয়া মুন্সেফ বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। অত্যন্ত সহিষ্ণু চিত্তে শশাঙ্কশেখর সকল নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন, এবং এই সকল হীন কুৎসার প্রতিবাদ করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রেম-প্রবণ হৃদয়ে শান্তির অভাব ছিলনা।

(উ)

কিন্তু তথাপি তাঁহাকে সময়ে সময়ে অন্যমনস্ক দেখা যাইত, যে যত সহ্য করে সে বেদনা তত প্রবলভাবে অনুভব করে। এক রবিবারে শশাঙ্ক তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া কি ভাবিতেছিলেন। বৈশাখ মাসের অপরাহ্ন, পশ্চিমাকাশে অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ উঠিল, দেখিতে দেখিতে তাহা বর্দ্ধিতায়তন হইয়া সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অবশেষে জল, ঝড়, ধূলা, অন্ধকার, বিদ্যুচ্ছটা, মেঘের কড়্ কড়্ গর্জ্জন প্রভৃতি সঙ্গীদল আসিয়া জুটিল।

একটা ছোট চড়ুই পাখী হাতে লইয়া কাঞ্চনমালা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, "ওমা একি আলিস্যি! দেখ দেখি ঘরের মধ্যে রাজ্যের ধুলো বালি আস্‌চে তা, যদি উঠে একবার জানালাটা বন্ধ কর্‌বে!"

"তাইত, আমি একটা কথা ভাবছিলাম, ঝড়টা বেশীই হয়েছে বটে" এই বলিয়া শশাঙ্ক উঠিয়া জানালা বন্ধ করিলেন, সহসা পত্নীর হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওটা আবার কি?"

"একটা চড়ুইয়ের বাচ্চা।"

"রাত্রে ভাজা হবে নাকি?"

"তোমার মাংসে এত লোভ! তা আমি তোমাকে মাংস রেধে দিতে পারি, কিন্তু মা তাহলে তোমাকে আর আমাকে আস্ত রাখ্‌বেন না। ঠাকুরঝিরা ত অবিলম্বেই রাগ ক'রে বাড়ী ছেড়ে যাবেন, তাঁরা যে পরম বৈষ্ণব। এই চড়ুইয়ের বাচ্চাটা ঝড়ে উড়ে আমার পায়ের কাছে হঠাৎ এসে পড়েছে, আজ ঐ দুধ ঢাকাটা দিয়ে ঢেকে রাখি, কাল সকালে উড়িয়ে দেব, আহা, এর বুকের মধ্যে কাঁপচে, নিরীহ অবোলা প্রাণী!"

"তোমার মত সকলের যদি দয়ার শরীর হতো!" বলিয়া শশাঙ্ক আবার অন্যমনস্ক হইলেন।

"তুমি কি ভাবচো বল দেখি!"—বলিয়া চড়ুই শাবকটি ঢাকা দিয়া রাখিয়া কাঞ্চন স্বামীর মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সস্নেহে তাঁহার চুলের ভিতর অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিলেন।

শশাঙ্ক পত্নীর গম্ভীর প্রেমব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মরণ!"

কাঞ্চন শশাঙ্কের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উভয় বাহুতে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, "ওকি কথার শ্রী, বল কি হয়েছে, আমার মাথা খাও।"

"হবে আবার কি?—তোমার মাথা খেলে কি আমার মাথা ঠিক থাক্‌বে!" কিঞ্চিৎ কাল নির্ব্বাক থাকিয়া কাঞ্চন বলিলেন, "আমার একটা কথা রাখ্‌বে?"—

"বল।"

"রাখ্‌বে?"

"কি বিপদ, হঠাৎ যদি ব'লে বস, 'আমাকে কাঁধে তুলে নৃত্যকর' তবে সে অসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করা

আমার এ বয়সে সমীচীন হবেনা, তাই—আগে জান্‌তে চাই অনুরোধটা কি রকম।”—অতি গম্ভীর স্বরে শশাঙ্ক এই উত্তর করিলেন।

“কত রসিকতাই জান! আমি তোমাকে গন্ধমাদন ঘাড়ে করতে বলছিনে গো! আমি একবার ভোলাদের দেখ্‌তে যাব ”

ভোলা কাঞ্চনের অষ্টম বর্ষীয় সহোদর।

শশাঙ্ক বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপের বাড়ী ?”

“কেন ? যেতে নেই কি ? আজ তিনবছর এসেছি, মা বাপের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা ত উচিত।”

“খুব উচিত, এবং উচিত, আরও উচিত, যে হেতু তোমার স্বামীর কাছারীর অন্ন যোগাবার জন্যে হাল্‌ফিল তিনজন বাবুর্চ্চি বাহাল হয়েছে।”—শশাঙ্কের স্বর ভয়ঙ্কর গম্ভীর।

“মা সকল ভার নিয়েছেন। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন, কেবল তোমার হুকুম হলেই হয়, শুনেছি কাল বেহারা আস্‌বে—তোমাকে না দেখে কেমন ক’রে থাক্‌বো ?”

অনেকক্ষণ শশাঙ্ক কোন কথা বলিলেন না; তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কেন এমন কাজ কর্‌লে কাঞ্চন ? আমার হৃদয় ত তোমার অজানা নেই, তবু এত অভিমান! আমি এখনও বেঁচে আছি।”

এবার কাঞ্চন অবনত মুখী হইলেন। তাঁহার দুটী চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, শশাঙ্ক অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইলেন না। চক্ষু মুছিয়া কাঞ্চন বলিলেন,—

“সুখে দুঃখে, ইহলোকে পরলোকে আমি তোমারই, তোমার চরণ ছাড়া অভাগিনীর আর স্থান নাই।”—কাঞ্চনের কণ্ঠ রোধ হইল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর অন্ধকারে আত্মগোপন করিতে পারেনা, কেবল যিনি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহার হৃদয়ে তাহা একটী করুণ দীর্ঘ নিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া তোলে।

শশাঙ্ক উঠিয়া বসিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কাঞ্চন কেঁদোনা। আমি তোমার কষ্ট বুঝেছি, তুমি যেতে চাচ্ছ, যাও, আমি বাধা দেবনা। আমি বুঝেছি আমাকে সকলের বাক্যবাণ হ’তে রক্ষা ক’রবার জন্য তুমি এই কঠোর নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ কচ্ছ, আর নানা কথা ভেবে মাও তোমাকে যাওয়ার মত দিয়েছেন, কিন্তু তুমি মার উপর রাগ করোনা,—উনি অবুঝ।”

“তা আমি জানি। পৃথিবীর অবিশ্বাস আমি গ্রাহ্য করিনে, পরমেশ্বর যেন আমার মনে বল দেন। ঐ দেখ মেঘ অন্ধকার; পৃথিবী যেন প্রলয়ের মুখে গিয়ে পড়েছে—কিন্তু সকালে আবার চারিদিকে হাসি ফুটে উঠ্‌বে, মেঘ দূরে গিয়ে আকাশ উজ্জ্বল হবে,—আজকার এ দুর্য্যোগের কথা তখন আর কার মনে থাক্‌বে ? হিন্দুর ঘরে জন্মেছি, নারী জন্ম পেয়েছি, সহ্য করবোনা ত কি ?”

বাহিরে পার্ব্বতি ডাকিল “বৌ!”

কাঞ্চন গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শশাঙ্ক গৃহে একাকী মৌন।

পরদিন প্রাতঃকালে বাপের বাড়ী হইতে পাল্‌কি আসিল; কাঞ্চন পিতৃ-গৃহে যাত্রা করিলেন। শশাঙ্ক শেখরের পাঁচ বৎসরের ছেলে সুধাংশু পাল্কির ভিতর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর কণ্ঠে বলিল—“হেই কর্ত্তামা তোর পায়ে পড়ি, আমাকে নে, আমার বড় মন কেমন করচে তোর জন্যে!” অবিলম্বে বাহক গণের বিকট হুঙ্কারে তাহার সে শিশু-স্বর ডুবিয়া গেল।

(উ)

পুত্র বধুর প্রতি গৃহিণীর মনে যে ভাবই থাক, পৌত্র সুধাংশুর জন্য তাঁহার মনে বড় বেদনা লাগিল, পাঁচ বৎসরের সেই ক্ষুদ্র বালক তাহার কর্ত্তামা রূপ গ্রহের চতুর্দ্দিকে একটা চির-চঞ্চল ধূমকেতুর ন্যায় বিরাজ করিত, কর্ত্তামার উপর তাহার একটা অন্ধ অনুরাগ ছিল। এক একদিন দেখা যাইত, সন্ধ্যার পর নিস্তারিনী দেবী হরিনামের মালা লইয়া বসিয়াছেন, সুধাংশু কর্ত্তামার ঘাড়ের উপর উঠিয়া “হেঁই কর্ত্তামা, একটা শোলোক বল” বলিয়া তাঁহার জপ ভঙ্গ করিতেছে।

তিন বৎসরের ছোট বোন পারুল তাহার কর্ত্তামার

পাশে বসিয়া লাড়ুর রসাস্বাদন করিতেছিল, সে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া আধ বিগলিত স্বরে বলিল,—

"থুলুকতি মুলুকতি আঙা দানের খৈ,
দাদা এতে বোল্‌বে আমাল লাল বৌতি কৈ ?"

"স'রে যা দস্যি, এখন দুদণ্ড হরিনাম করি" বলিয়া কর্ত্তামা সুধাংশুকে সরাইয়া দিলেন। সুধাংশু বাঁধরুদ্ধ নদীতরঙ্গের ন্যায় দ্বিগুণবেগে কর্ত্তামার পিঠতটে আছড়াইয়া পড়িল, এবং সজোরে কিল চড় মারিতে লাগিল।

কর্ত্তামা উঠিয়া সরোষে বলিলেন, "বৌমা, লক্ষীছাড়াকে নিয়ে যাও ত গো, দুদণ্ড যে স্থির হয়ে বসে ভগবানের নাম কর্‌বো তার পর্য্যন্ত অবকাশ পাইনে, আমাকে দিক্ করে মারলে।" মাতা বহুকষ্টে পুত্রকে শান্ত করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

কাঞ্চনমালা পিতৃগৃহে চলিয়া যাইবার সঙ্গে এ দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। বৌমা বাড়ী অন্ধকার করিয়া গিয়াছেন, সুধাংশুর সে শিশু-সুলভ অত্যাচার আর নাই, পারুলের সে আধ আধ মধুস্বরে আর তাঁহার গৃহ ধ্বনিত হয় না। কাঞ্চন যখন শাশুড়ীকে মা বলিয়া ডাকিতেন তখন সে স্বরে যেন স্নেহময়ী কন্যার সুকোমল হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা, ভক্তি বিনয় ও বিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত; কোমলতা-বঞ্চিতা কলহ-নিরতা কন্যাদ্বয়ের শত মাতৃধ্বনিও সে সুমধুর স্বরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বলিয়া গৃহিণীর নিকট প্রতীয়মান হইত না।

(ঝ)

হঠাৎ একদিন গৃহিণীর বড় জ্বর হইয়া সমস্ত শরীরে বসন্ত দেখা দিল। বড় দিদি বলিলেন, "শশা, বৌকে না আন্‌লে ত আর চলে না! বৌ ত তোর সঙ্গে সাট করে সেই চলে গেছে, এদিকে মার যে কত কষ্ট তা দেখে কে? আর এত রাঁধে বাড়ে কে? পরের মেয়ে বাপের বাড়ীর নাম শুন্‌লেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে।" বড় দিদির কথা শুনিয়া কাহারও একবার সন্দেহও জন্মিত না যে তিনি বালবিধবা, আজন্ম ভ্রাতৃগৃহবাসিনী।

"তা, আনতে গাড়ী পাঠাও।"

প্রায় তিন মাস পরে গাড়ী লইয়া বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য মধু ঘোষ তাহার 'বৌ মা ঠাকরুণে' আনিতে গেল।

কাঞ্চন শাশুড়ীর পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্বশুরালয়ে আসিলেন। শাশুড়ীর রোগ শয্যায় একেবারে তাঁহার পদপ্রান্তে গিয়া বসিলেন, বলিলেন, "মা আপনার অসুখ শুনে কি যে ভাবনা হয়েছে! এখন কেমন আছেন? বড় কষ্ট কি?"

গৃহিণী অতি কষ্টে বলিলেন, "একটু কাছে বস মা। আহা মায়ের আমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। কেউ একটু কাছে বসে না, এ ঘরে পর্য্যন্ত ঘেঁস্‌তে চায় না। আমার সুধাংশু কৈ? পারুল কেমন আছে, কত দিন তাদের দেখিনি। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে! বৌমা এই হাতের কাছে এসে বোস ত, একবার ভাল করে দেখি।" গৃহিণী দক্ষিণ হস্ত শয্যার উপর প্রসারিত করিলেন।

পদতল হইতে উঠিয়া শাশুড়ীর উপাধানের কাছে বসিয়া কাঞ্চন নতমুখে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন, দুঃখে নহে, এমন স্নেহ কোমল স্বরে শাশুড়ীর কাছে কোন দিন তিনি অভ্যর্থনা লাভ করেন নাই।

শাশুড়ী বধূর হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা আমি মরতে বসেছি, বুড়ীর অপরাধ নিও না। আমি ঘরের লক্ষ্মী জোর করে বিদেয় করেছিলাম, তাই অলক্ষ্মীর দল আমাকে ঘিরে ফেলেছে, তুমি এসেছ এখন আমি সেরে উঠ্‌বো।'

বধূর যত্ন ও শুশ্রূষা গুণে গৃহিণী শীঘ্রই সারিয়া উঠিলেন। কাঞ্চন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শাশুড়ীর সেবা করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার ননদ দ্বয়ের মুখে কুৎসার হলাহল উদ্গীরিত হইতে লাগিল, কিন্তু সে তীব্র হলাহল ব্যর্থ করিবার উপযুক্ত অমৃত কাঞ্চন মালার হৃদয়ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

অতঃপর গৃহিণী আর কখন কাঞ্চনমালার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেন নাই। বধূর প্রতি কটাক্ষ করিয়া কেহ কোন কথা বলিলে গৃহিণী বলিতেন "ও কথা বলো না বাছা, বৌমা আমার "ঘরের লক্ষ্মী।'

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

একাদশীতে বাল বিধবার উক্তি।

আজি দেবতার পদে প্রাণ দিব বলিদান।
স্বামীন্! প্রাণেশ! প্রভু! হৃদয় বল্লভ!
বলগো কেমন তুমি রয়েছ কোথায়?
তোমারি মূরতি ও কি নিদাঘের রবি,
গগনের ভালে জ্বলে মহা জ্যোতির্ম্ময়?
ওহে প্রেমাধার প্রভু, এতদিন পরে
অভাগীরে মনে বুঝি পড়েছে তোমার?
তাই কি মহিমাময়, খুঁজিতে আমায়
দিগন্ত বিভাসি আজি হয়েছ উদয়?
প্রতি অন্ধকার কক্ষে বিবরে গহ্বরে
প্রেরিছ প্রোজ্জ্বল ছটা হেরিতে আমায়?
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আজি তাপিয়া তুলিছ,
নদ নদী শুখাইছ, সমুদ্র শুষিছ,
অন্বেষিতে মোরে? প্রতি অণু রেণু কণা
অনল স্ফুলিঙ্গ সম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিছে!
অনল তরঙ্গ তুলি শীতল সংসারে
গর্জ্জে বায়ু রোষ ভরে শেষাহি সমান!
আমি প্রিয়তমা তব, আর পারিলেনা
সহিতে বিরহ জ্বালা, তাই কি ত্বরায়
করিতে সঙ্গিনী মোরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে—
ধরিয়া স্বকরে আজি অস্ত্র খরসান
ছিঁড়িতে সংসার বন্ধ' হ'য়েছ উদ্যত?
কোটী মত্ত করিবলে গগনে থাকিয়া
ছিঁড়িয়া ধমনী নাভি স্নায়ু শিরা ভেদি
আকর্ষিছ জীবন আমার? খরকরে
স্নেহময় জননীর, ভাই ভগিনীর
নেত্র হ'তে শুকায়েছ স্নেহ নীর ধীর?
সংসারের সুশীতল মমতার উৎস
মায়ের হৃদয়ে শিখা করেছ সঞ্চার?
জ্বালায়ে দিয়াছ দয়া মায়ার আগার?
মাতৃ প্রাণ বিবর্জ্জিত তাই, মা আমার,
দেয় না দেয় না আহা মুমূর্ষু কন্যায়
এক বিন্দু বারি আজি একাদশী ছলে!
নীরস কণ্ঠের মম সুক্ষীণ আরাব
তাই কি জননী প্রাণে করেনা প্রবেশ?
অন্তিমের অশ্রুময় সুদীন নয়ন
নিরখি' তাই কি মাতা উদাসিনী রয়?
বহ্নিতেজে পিতৃপ্রাণ করেছ অঙ্গার?
মরুসম শুষ্কমুখে তৃষা বিনির্গত
রুক্ষ রসনায় ঝলে মরীচিকা শিখা,
মর্ম্মভেদী দৃশ্য হেন জনক আমার
নির্ব্বিকার নেত্রে হায় তাই কি দেখেন?
ভীমতেজে ভ্রাতৃ-স্নেহ দগ্ধ করিয়াছ?
প্রাণের সোদর তাই, আহা পরিতাপ,
নিরন্ন আনন পানে দেখেও না দেখে?
নীরস রসনা ক্লেশ প্রাণে না জাগায়?
না-না একাদশী নয়;—এযে শুভক্ষণ
প্রাণের ধ্যানের দিন, পবিত্র গ্রহের
পুণ্যময় মহাযোগ আজিগো কেবল!
প্রভুর স্বর্গীয় ভাবে হ'তেছি বিভোর!
মহান পবিত্র শুভ লগ্নে আজি আমি
পেয়েছি দেখিতে ওই রাজীব চরণ,—!
ও বরণ নবাম্বুদ নয়ন রঞ্জন,!
ও বদন প্রভাকর চির আয়ুষ্মান,!
ও নয়ন প্রেমোৎফুল্ল—লক্ষ শশাঙ্কের
অমল ধবল ধারা জুড়ায় জীবন!
ও হৃদয় প্রেমাধার অনন্ত অসীম,
অগাধ গভীর—সিন্ধু সহস্র শতেক,
যার তুলনায় ক্ষুদ্র বিন্দু গোষ্পদের!
কিন্তু সে প্রেমের প্রাণ বদ্ধ এ হৃদয়ে,
অগস্ত্য জঠরে যথা বরুণ নিলয়।
প্রাণের দেবতা মম ওহে প্রেম ময়,
প্রসারি সহস্র কর এস জ্যোতির্ম্ময়!
গাঢ় আলিঙ্গনে মম বাঁধিয়া হৃদয়
অবস করিয়া দাও এ দেহ আমার!
প্রেমের মন্দির স্রোতঃ শিরায় শিরায়

দাও প্রবাহিয়া মোর শোণিতের সাথে!
মোহন মাধুরি ভরা আসক্তি তোমার
দাও মিশাইয়া প্রাণে, প্রেমোচ্ছ্বাসে তব
স্বর্গীয় সমীর ব'ক নিশ্বাসে আমার!
নয়ন নিমেষহীন উর্দ্ধমুখী হ'য়ে
তোমার রূপের শিখা পিয়িয়া জুড়াক,
এ প্রাণ পরাণে তব জড়াইয়া থাক্!
বিলম্ব ক'রোনা আর এস দয়াময়,
এ বিরহ—আর প্রভু সহ্য নাহি হয়!
প্রাণের প্রেয়সী তোমা ডাকে উভরায়,
দূরে থেকে দেখা দিয়ে যাতনা বাড়াও—
কেন নাথ! কাছে এসে সঙ্গে নিয়ে যাও!
এ অসহ জ্বালা হ'তে বাঁচাও জীবন!
সংসারের বস্তু আর দেখিতে না পাই,
ধূমের বসন এক চলিতেছে ধাই;
ঢাকা পড়ে ভাই বন্ধু জনক জননী
কুজ্ঝটি মণ্ডিত যেন আঁধার ধরণী—!
কোথা মাতা কোথা পিতা স্নেহের কন্যায়
দাওগো দাওগো আজি অন্তিম বিদায়!
দাদাগো! ভগ্নীরে ল'য়ে হও অগ্রসর,
হের ওই প্রাণ নাথ লইবারে মোরে
এসেছেন—ওই! ওই! দাঁড়ায়ে শিয়রে!!
দুঃখিনী ভগিনী তব পতি অনাদরে
এতদীন নীরধারে কাঁদিত নীরবে,
স্বামী-সোহাগিনী আজি স্বামী-ঘরে যায়
স্নেহের ভগ্নীরে দাও অন্তিম বিদায়!—
যাই-যাই-যাই মাগো—বাবাগো—বিদায়!!—

(মৃত্যু!!)

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষ অন্তে।

চির জীবনের মত ঐ বর্ষ যায়,
ফিরিয়া না যাবে আর শত সাধনায়।
তাই আজ বর্ষ শেষে,
প্রকৃতি মলিন বেশে,
তেরশ সাতের কাছে নিতেছে বিদায়,
বিদায় সঙ্গীত ঐ বিহগেরা গায়।
বয়ষের শেষ রবি ঐ অস্ত যায়,
ঢাকিল বসুধা বক্ষে সান্ধ্য নীলিমায়
একে একে তারা গুলি
করুণ নয়ন মেলি
উজলি অম্বর তল বিমল প্রভায়,
মাতোয়ারা করে ধরা তার পানে চায়।
বরষের শেষ চাঁদ গগনের গায়,
ফুটেছে কুসুমরাশি পূর্ণ সুষমায়,
জোছনা প্লাবিত বুকে
প্রকৃতির ম্লান মুখে
খেলিছে যে রূপ-জ্যোতি নাহি উপমায়,
কত হাসি অশ্রু লয়ে বর্ষ চলে যায়।
তুমিতো চলিলে ফিরে আসিবেনা আর,
স্মৃতি রাশি কেন বর্ষ রহিল তোমার?
তাহাও তোমার মত,
হোক চির অস্তমিত,
দিন যায় স্মৃতি কেন পড়ে থাকে তার,
করিতে কেবল প্রাণে যাতনা সঞ্চার!
এ বরষ কেটে গেলে অতৃপ্ত আশায়
"করিব" বাসনা সবি রহিল হিয়ায়।
এমনই ত অবহেলে
কত বর্ষ গেছে চলে
রয়েছে যা বাকি বল কত হবে তায়?
এ জীবন কাটিবে কি এমনই বৃথায়?

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। পঞ্চম সংখ্যা।

ডাকো।

ডাকো সখা ডাকো পুনঃ মোরে,
পুরাতন সেই তব স্বরে,
মৃত আশা মৃত সুখ মৃত সে বাসনা,
ও স্বর শুনিলে পুনঃ ফিরে।
নিয়ে যায় ত্রিদিবের অতি কাছাকাছি,
সুখময় অতীতের তীরে,
জেগে উঠে যৌবনের বসন্ত স্বপন,
মরুময় বর্ত্তমানে ঘিরে।

জীবনের পুরাতন এই জীর্ণ কথা,
মনে হয় যেন নব কাহিনীর মত।
হয় পূর্ণ স্তব্ধ হৃদি তট,
কল্পনার সঙ্গীতে ধ্বনিত।
পুনঃ হায় মনে পড়ে যায়,
সুদূরে হারানো শত স্বপনের কথা,
উথলিত হৃদয় আবার,
গায় নব উৎসাহের গাথা।

ফিরে আসে বিস্মৃত জীবন,
মরমের সেই নব সুর,
দেবতার বীণোত্থিত সঙ্গীত মতন,
জাগাত যাহা গো এক বাসনা মধুর।
শুষ্ক ম্লান লতাটি যেমন,
হয়ে উঠে পল্লবিত বসন্তের স্বরে,
প্রেমের কাহিনী পুন হয় মর্ম্মরিত,
মঞ্জুরিত কিশলয় ভোরে।

তেমনি গো ওই তব স্বরে,
হয় পুন পল্লবিত যৌবন স্বপন,
প্রেমের সে ঝরা পত্রচয়,
শ্যামল সঙ্গীত পুনঃ করেগো রচন।
তাই বলি ডাকো সখা মোরে,
পুরাতন সেই তব স্বরে,
যা কিছু আছিল মোর শ্যামল সুন্দর,
ও স্বর শুনিলে পুনঃ ফিরে।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

পতিব্রতা।

এখন যে দেশের নাম ফ্রান্স, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রোমানদিগের সময়ে তাহা গ্যালীয়া ও তাহার অধিবাসিগণ গল্ নামে পরিচিত ছিল। এই রোমান ও গলেরা আমাদিগের জ্ঞাতি। কারণ হাজার হাজার

বৎসর পূর্ব্বে, ইহাদের এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একসঙ্গে মধ্য এসিয়ায় বাস করিতেন; তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহার এক ছিল। ক্রমে লোক সংখ্যা অধিক হইলে একদল ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন; আর কয়েকদল বিভিন্ন সময়ে ইউরোপে যাইয়া গ্রীক, রোমান, গল প্রভৃতি নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রোমানেরা অনেক পরিমাণে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, আর গলেরা প্রায় বর্ব্বর অবস্থায় দিন যাপন করিতেছিল।

সভ্য ও অসভ্য জাতি পরস্পরের নিকটে বাস করিলে যেমন হয়, রোমান ও গলদিগের মধ্যে প্রায়ই সেইরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। এক এক সময়ে এই যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিত। এমন কি একদা গলেরা রোম পর্য্যন্ত দখল করিয়া তাহা পুড়াইয়া ফেলে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, উৎকৃষ্ট সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ কৌশলের গুণে রোমানগণ ক্রমে জয়ী হইতে আরম্ভ করে; কয়েক শত বৎসরের সংঘর্ষণের পর গলগণ ইটালী হইতে তাড়িত হয়। তখন রোমানেরা ধনে ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং তাহারা গ্যালিয়া জয় করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া বারংবার যুদ্ধ যাত্রা করে। গলেরা অপেক্ষাকৃত অসভ্য হইলেও বড় স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। তাহারা পুনঃপুনঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিত না। এজন্য গ্যালিয়া জয় করিতে রোমানদিগের বহু বৎসর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে খৃষ্টের জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রোমের সর্ব্ব প্রধান পুরুষ জুলিয়স্ সীজর গ্যালিয়া জয় করিয়া তথায় রোমের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুশাসনের গুণে গলেরা রোমের অনুগত প্রজা হইয়া উহার ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার গ্রহণ করে এবং গ্যালিয়া রোমক সাম্রাজ্যের একটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রদেশরূপে পরিণত হয়।

দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু গলদিগের মধ্যে স্বাধীনতা-প্রিয়তা নির্ব্বাপিত হইল না। স্বদেশপ্রেমিক গল্ যুবকেরা দেশের অধঃপতনের বিষয় চিন্তা করিয়া অশ্রুমোচন করিত, এবং কিরূপে রোমের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন হইতে পারে, গোপনে সঙ্গীদিগের সহিত তাহার পরামর্শ করিত। এই পরামর্শের ফলে, পরাজয় নিশ্চিত জানিয়াও তাহারা সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। রোম তখন তৎকালপরিচিত পৃথিবীর অধীশ্বরী; সুতরাং এই সকল বিদ্রোহ দমন করিতে তাহাকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গল্-বীর ক্লডিয়স সিভিলিস ও জুলিয়স স্যাবাইনাস যে প্রচণ্ড বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করেন, তাহা সমগ্র রোমক শক্তিকে গ্রাস করিবার প্রয়াস করে। স্যাবাইনাস সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়া গ্যালিয়াকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং বিপুল অনীকিনী লইয়া রোমক সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথমে তিনি কিয়ৎপরিমাণে সফলতা লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, কিন্তু অচিরাৎ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন; তাঁহার সমস্ত সৈন্য অদৃশ্য হইল; প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহাকে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইতে হইল।

এখন হইতে তাঁহার পত্নী সাধ্বী এপনিনা তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। স্যাবাইনাস সমস্ত দিন পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত থাকিতেন, এপনিনা ফল মূল আহরণ করিয়া তাঁহার ক্ষুধা নির্ব্বাণ করিতেন; দিবা রজনী প্রহরিণী হইয়া গুহামুখে অবস্থান করিতেন, দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনিলে স্বামীকে সতর্ক করিয়া দিতেন, এবং বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে তাঁহাকে লইয়া নির্জ্জনতর, সুদৃঢ়তর স্থানে প্রস্থান করিতেন। রোমক সৈন্য প্রতি গ্রাম জনপদে, প্রতি অরণ্য পর্ব্বতগহ্বরে বিদ্রোহী স্যাবাইনাসের সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু এই প্রত্যুৎপন্নমতি প্রতিভাশালিনী পতিব্রতা রমণীর অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে তাহাদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়াছিল। স্বামীর অজ্ঞাতবাসকালে ইনি একাকিনী তাঁহার মাতা, সহোদরা, কন্যা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু—সকলেরও অভাব পূরণ করিতেছিলেন। স্যাবাইনাসও পত্নীতে অতীব অনুরক্ত ছিলেন, হয় ত পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে দূরতর দেশে যাইয়া তিনি প্রাণ বাঁচাইতে পারিতেন; কিন্তু কে

এমন গুণবতী ভার্য্যার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে? এজন্য নিত্য মৃত্যু নিকটে জানিয়াও ইঁহারা পর্ব্বত গহ্বরে শত ক্লেশের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে এপনিনা দেখিলেন, এরূপে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। রোমক সম্রাটের সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি হইতে কোন্ অপরাধী কবে দীর্ঘকাল লুক্কায়িত থাকিতে পারিয়াছে? তখন তিনি এক অসম সাহসিক সংকল্প করিলেন। তিনি ছদ্মবেশে স্যাবাইনাসকে লইয়া রোম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই রমণী এমন অলৌকিকবুদ্ধিশালিনী ছিলেন যে, ইনি স্বামীকে লইয়া সুদীর্ঘ পথের অসংখ্য বিপদ অতিক্রম করিয়া, রোমকদিগের শত শত সৈনব্যূহ ভেদ করিয়া নিরাপদে রোমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্বামীকে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বয়ং সম্রাটের নিকট পতির প্রাণ ভিক্ষার জন্য ভিখারিণী বেশে উপস্থিত হইলেন। এপনিনা কেবল গুণবতী ছিলেন না, অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্নাও ছিলেন। তাঁহার কাতরোক্তিতে সম্রাটের পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইল; কিন্তু রোমক রাষ্ট্র-বিধিতে বিদ্রোহীর ক্ষমা ছিলনা, কাজেই সম্রাট এপনিনার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তখন সতী এপনিনা ভগ্নহৃদয়ে স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ কৌশলে রোমক সৈন্যের সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা বিফল করিয়া পুনরায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগুহায় উপস্থিত হইলেন।

এখন হইতে তাঁহারা মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; তথাপি এপনিনার বুদ্ধিকৌশলে আরও কয়েক বৎসর নিরাপদে কাটিয়া গেল। এই কয়েক বৎসর প্রিয়তমা পত্নীর আত্মজ্ঞানশূন্য ঐকান্তিক সেবায় স্যাবাইনাসের দুঃখময় জীবনেও সুখের উৎস খুলিয়াছিল, প্রেমের স্নিগ্ধ ছায়াপাতে নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকাও কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। অবশেষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী হইল। নয় বৎসর পরে স্যাবাইনাস ধৃত হইয়া রোমে আনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। পতিপ্রাণা এপনিনার জীবনের কাজ ফুরাইল; তিনিও স্বামীর সহিত মৃত্যুভিক্ষা করিলেন। তাহার পর? তারপর এই সাধ্বী রমণী হাসিতে হাসিতে ঘাতকের হাতে প্রাণ দান করিলেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

প্রেমের জয়।

(১)

চারুচন্দ্রের চাকুরিতে বুঝি শনির দৃষ্টি ছিল! নচেৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি, অগাধ পাণ্ডিত্য, সাধুচরিত্র ও বিনয়—এতগুলি সদ্‌গুণের সমবায় সত্বেও তাহার ভাগ্যে চাকুরি জুটিল না কেন?

চারুচন্দ্র সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়াই বুঝি লক্ষ্মীদেবীর ত্যাজ্যপুত্র হইয়া বসিল। যতদিন সে কলেজে ছাত্র ছিল, ততদিন তাহার যশের সীমা ছিল না। ভাগ্যদেবী যেন অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া স্বহস্তে তাহার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া চলিতেছিলেন। সকল পরীক্ষায় সে গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং শিক্ষকগণ এক বাক্যে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দেখিল, কলেজের বহির্ভূত জগৎ "বড় কঠিন ঠাঁই;" সেখানে গুণ অপেক্ষা গরিমার আদর বেশী, বিদ্যা অপেক্ষা চটকের বাহবা বেশী, আসল অপেক্ষা নকল অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। সে বুঝিল, চাকুরী করিতে হইলে শিক্ষা ও আত্মসম্মানকে কলেজের ত্রিতল গৃহে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া, তোষামোদ, ও গতানুগতিক ভাবকে অঙ্গের ভূষণ করিতে হয়। প্রকৃতি চারুচন্দ্রকে এই দুই গুণেই বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সুতরাং চাকুরি করা তাহার ভাগ্যে ঘটিল না।

অধিক অর্থের লোভ তাহার কখনই ছিলনা, তাহার কোমল প্রকৃতি চিরদিনই শান্তির জন্য ব্যাকুল থাকিত। কিন্তু হায়! অনেকের অনেক চাকুরি জুটিল; পরিচয়ের পরশ পাথর স্পর্শে অনেক লৌহ সুবর্ণে পরিণত হইয়া জগতে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে লাগিল—কিন্তু চারুচন্দ্রের ভাগ্যে একটি প্রাইভেট এণ্ট্রেন্স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই জুটিয়া উঠিল না।

সে তাহাতেও ক্ষুব্ধ হইল না, কিন্তু নিয়তি তাহার সে কাজটুকুও কাড়িয়া লইলেন।

সেই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক মহাশয় স্কুলের স্বত্বাধিকারীর একজন আত্মীয় ও প্রিয় পাত্র ছিলেন, সুতরাং স্কুলে যে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপ হইবে, একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আত্মগৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া পরের তোষামোদ করা চারুচন্দ্রের কোষ্ঠীর কোন স্থানে লেখা ছিল না, সুতরাং সে হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের অযথা ব্যবহার সহ্য করিতে পারিত না। এইরূপে অল্পে অল্পে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল এবং সেই প্রধূমিত বহ্নি একদিন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠায় চারু রোষে ও ক্ষোভে চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া বসিল।

ইহার পূর্ব্বেও আর একটা চাকুরিতে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সুতরাং সে মনে মনে নিশ্চিত বুঝিল যে, চাকুরি তাহার মত লোকের জন্য নহে। এরূপ স্বাধীনচিত্ততা কখনই চাকুরির বাজারে জয়লাভ করিতে পারে না।

যেদিন চারু শিক্ষকতার পদ পরিত্যাগ করিল, সেদিন রাত্রিতে তাহার মনে এমন সকল চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল, যাহা ইতঃপূর্ব্বে কখনও তাহার মনে উদিত হয় নাই। সে চাকুরির আশায় চির-জলাঞ্জলি দিয়া ভাবিল, এখন কি করি? নিশ্চয়ই উর্ম্মিলা আমার প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এই চিন্তায় সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িল। সে উর্ম্মিলাকে অত্যন্ত আবেগ ভরে নিকটে টানিয়া বলিল—"উমা, আমার মেজাজটা বড় ভাল নয়, কাহারও সঙ্গে মিশিয়া আমি কাজ করিতে পারি না।" উর্ম্মিলা পতিসোহাগে অধিকতর সুন্দর, অধিকতর উজ্জ্বল, লাবণ্যপূর্ণ মুখ খানি তুলিয়া বলিল—"কেন তাই ব'লে চাকরির জন্ত নিজের মান খোয়াতে হবে নাকি? আর তোমাকে চাকরি ক'রতে হবে না। দেশে আমাদের এত জমি যায়গা রয়েছে, সেই খানে গিয়ে চাষ আবাদ ক'রলে সচ্ছন্দে দিন কেটে যাবে। কাহারও খোসামুদী ক'রতে হবে না। লোকেত তোমাকে মূর্খ ব'লবে না, চল দেশে যাই। দেশে আমার কষ্ট হবে ব'লে যেতে চাও না; কেন, আমরা কি কখনও দেশে ছিলাম না?"

চারু অবাক্। সে পত্নীর কাছে এরূপ কথা শুনিবে, আশা করে নাই। উর্ম্মিলাকে সে শুধু সুকোমল-স্বভাবা পতিগতপ্রাণা বলিয়াই জানিত। আজ বুঝিল উর্ম্মিলা অগ্নিমন্ত্রদীক্ষিতা 'দেবী"। সে সাদরে উর্ম্মিলার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "উমা, তোমার মত গুণের স্ত্রী যাহার গৃহ আলোকিত করিয়া থাকে, তাহার কিসের অভাব? তাহার পর্ণকুটিরের জীর্ণপত্র রাজঅট্টালিকার স্বর্ণ ইষ্টকরাশি অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। সে সামান্ত চাকুরি কেন, অতুল সাম্রাজ্যও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে। আজ বুঝিলাম, নিঃস্ব আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী।"

স্বামী স্ত্রীতে এইরূপ কথোপকথনের পর, অবশেষে দেশে যাওয়াই স্থির হইল। চারু যথা সময়ে সহরের বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

(২)

চারুচন্দ্র উর্ম্মিলাকে লইয়া তাহার জন্মভূমিতে ফিরিল। কতদিন সে দেশে আসে নাই, সুতরং সকলই ভগ্ন ও সংস্কারবিহীন দেখিল। এরূপ জীর্ণ বাটিতে বাস করিতে উর্ম্মিলার কত কষ্ট হইবে ভাবিয়া সে অত্যন্ত দুঃখিত হইল

উর্ম্মিলা গৃহস্থালীতে নিপুণা, কর্ম্মদক্ষা। সে বাড়ীতে পা দিয়াই নিজের হাতে ঝাঁটা ধরিল, শুইবার ঘরখানি উত্তমরূপে ঝাড়িল, জিনিস পত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল, চৌকিখানি একটু সরাইল, বাসনগুলি সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া সাজাইল, দেওয়ালের মাকড়সার জাল ছিঁড়িল, টিকটিকিগুলাকে তাড়াহুড়া করিল, জানালাগুলি খুলিল এবং চারুচন্দ্রের সাধের পুস্তকগুলিকে সুন্দররূপে সাজাইয়া চারুকে ডাকিল—"ওগো একবার এসে ঘরের ভিতরে দেখে যাও ঠিক হয়েছে কিনা, নয়তো একটু পরে আবার সব টেনে হেঁচড়ে কোথায় কি ফেলে দেবে।"

চারুচন্দ্র তখন বাহিরে বাড়ীর প্রাঙ্গণের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজ প্রাঙ্গণের প্রত্যেক তৃণকণায়, প্রতি তরুপত্রে, কুসুমের প্রত্যেক হিল্লোলে তাহার

মনে স্মৃতির কত অব্যক্ত আবেগময় প্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছিল। সে অভিভূত ও নির্ব্বাক্ হইয়া সেই কথাই ভাবিতেছিল।

উর্ম্মিলার ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ঘরে যাইয়া দেখে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে উমা ঘর খানিকে বড় সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে।

চারু বলিল, "উমা আমি তোমার নিপুণতা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি; এখন আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তুমি এই দুঃখের সংসারে তোমার নিরুপম চরিত্রমাধুর্য্যে সুখ-শান্তি আনয়ন করিতে পারিবে। আমি আর কিছুতেই দুঃখিত নই।" উর্ম্মিলা কৃত্রিম বিরক্তিসহকারে বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, দার্শনিক গুরুমহাশয়! তোমাকে আমি এখন তত্ত্ব আলোচনা করিতে ডাকি নাই; সে তো চিরদিনেরই আছে, এখন বল সব ঠিক হলো কিনা?"

চারু বলিল, "অতি সুন্দর হ'য়েছে; এখন আর কিছু ক'রতে হবে না। দেখ তো ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছো, মুখ খানি লাল হ'য়ে উঠেছে। একেবারে এত ভাল নয়, এই জন্যেই তো দেশে আস্‌তে চাইনি।" উমা বলিল "আচ্ছা ঢের হ'য়েছে।"

(৩)

এদিকে গ্রামের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এ হুলস্থুলের একটু অর্থ আছে। কথাটা ভাঙিয়া বলা উচিত। পল্লীগ্রামে যাঁহারা জীবনে কখনও পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা আমার কথা কতদূর বুঝিবেন জানিনা। নভেলে, নাটকে, কবিতায়, গল্পে, সুনিপুণ গ্রন্থকারের মোহিনী তুলিকা হইতে পাঠকগণ পল্লীগ্রামের যে সুন্দর রমণীয় চিত্র প্রাপ্ত হন, তাহা অতীব মনোরম ও হৃদয়স্পর্শী সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহাদের সে চিত্র সর্ব্বত্র সত্যের উপরে অঙ্কিত নহে। ইহাতে যদি কেহ আমার উপরে খড়্গহস্ত হন, তবে আমি নাচার।

কিন্তু এখন সেকথা থাক্, আসল কথা বলি। চারুচন্দ্র সামাজিক জগতের একটি বিচিত্র ভুল। সে না সহরের উপযোগী, না পল্লীগ্রামের উপযোগী। পল্লীগ্রামে থাকিতে হইলে দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি করিতে হয়, উপবীত-ধারী ব্যক্তিমাত্রেরই পায়ের ধূলা মস্তকে রাখিতে হয়, সন্ধ্যাকালে বৈঠক বিশেষে বসিয়া দলাদলি সম্বন্ধে মতামত দিতে হয়, তা ছাড়া পরচর্চ্চাও করিতে হয়। সেখানে বিদ্যার জাহাজ হইলেও কোন সমাদর নাই, অথচ নিরক্ষর হইয়া যে কোন উপায়ে দোলদুর্গোৎসব ও ব্রাহ্মণভোজন করাইতে পারিলে জয় জয়কার আছে। কিন্তু চারু এ সকলের কিছুরই উপযুক্ত ছিল না।

তাহার আরও অনেক দোষ ছিল। সে নাকি দিবা দ্বিপ্রহরে "প্রশস্ত সূর্য্যালোকে" উর্ম্মিলার সহিত কথা কহিত। ঘোষেদের নিস্তারিণী তাহার ভাইঝি জ্ঞানদাকে তাহাদের বাড়ী খুঁজিতে গিয়া আড়াল হইতে সমস্ত শুনিয়া আসিয়াছে। ঘরে গুন্ গুন্ শব্দ হচ্ছিল; সে জানালার কাছে গিয়া স্পষ্ট শুনিয়াছে, দুজনে গান গাহিতেছিল! "মা গো! ঘোর কলিকাল, ধর্ম্ম আর ক'দিন থাকবেন? কালামুখী ছুঁড়ীর কি একটু ঘেন্নাও হয় না?" চারু ও উর্ম্মিলার প্রীতি এইরূপ মন্তব্য চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহাদের প্রত্যেক চাল চলন লোকের তীক্ষ্নদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। চাটুর্য্যেদের দীনতারিণী বলিলেন—"সেই চেরো লো, সেই চেরো, ছেলে বেলায় শান্ত শিষ্ট কেমন নরম সরম ছিল, আর কোথা হ'তে কি ছাই ভস্ম প'ড়লে—আর সব উল্টে পাল্টে গেল। আমাদের উনি ভূতোকে ইংরিজি স্কুলে দিবেন বল্‌ছিলেন—ইংরিজির মুখে ছাই, যেমন শুনতে সাঁওতালী বুলি কাণে ছুঁচ ফুটায়, মানুষকে করেও ঠিক সাঁওতাল! লজ্জা সরমের মাথা খাইয়ে বসে—তা নইলে মেয়ে মানুষ আবার দিনের বেলায় সোয়ামীর সাক্ষেতে মাথায় ঘোমটা দেয় না—ওমা ঘেন্নায় মরি! আপদরা বিদেশে ছিল, বেশ ছিল, এখানে ম'রতে এল কেন?"

উর্ম্মিলা কাপড়ের নীচে সেমিজ পরে, তাই নিয়ে বাঁড়ুয্যেদের যোগমায়া ঠাকুরুণ ব'ললেন—"আ মরি! কিই না দেখায়, যেন আলখাল্লা প'রে বেড়াচ্ছেন!—ঠিক যেন খোলের মধ্যে বালিশটী! তার উপুরে মাঝে মাঝে আবার জামা চড়ে! আহা, যেন চুড়োর উপুরে ময়ূর পাখা!

কেন বাপু, আর একটি বাকি থাকে কেন? কাছা লাগিয়ে চাকুরিতে বেরোলেই হয়, সোয়ামী তো পারলে না! তুইই কর্—মরণ আর কি!"

জগদম্বা বলিলেন—"সবেতেই বাড়াবাড়ী, নইলে কলি ব'লবে কেন? সেদিন দুটো মুখোমুখী ক'রে ই, বি, সি ডি, প'ড়ছিল! কেন রামায়ণ মহাভারত এসব রোচে না বুঝি? সেদিন তাস্ খেলতে ডাকতে গেলুম, তা মেয়ে দেমাকে দেখ্‌তে পেলেন না, তবু যদি সোয়ামী চাকুরে পুরুষ হ'তো! বল্‌লেন কি, আমি তাস খেল্‌তে জানিনে, কচি খুকি আর কি! দুপুর বেলায় একটু শেলাই ক'রবো। শুনে আমি অবাক্! বলি, টাকা রোজগারের জন্যে বাড়ীতে কি দরজির দোকান খুলতে হবে নাকি? মরণ, তবে খোদাবক্স দরজির ঘরে জন্মাস্ নি কেন?"

আর কত লিখিব? এই রূপে চারিদিকে একটা না একটা ছুতা ধরিয়া সেই নবাগত দম্পতীর উপরে চারিদিক হইতে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ হইতে লাগিল। প্রতিদিন দুই প্রহরে ঘোষেদের বাড়ী বৈঠক বসিয়া ষোড়শোপচারে তাহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

(৪)

ঠিক এই সময়ে গ্রামে বারোয়ারী পূজার সোরগোল পড়িয়া গেল। গ্রামের পাণ্ডাগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রিতে মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ১২।১টা পর্য্যন্ত কি যাত্রা আসিবে, কোন্ বাইনাচ বায়না করা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী বাড়ী চাঁদা তুলিবারও ধুম পড়িয়া গেল।

একদিন রাত্রিতে অধিনায়কগণ তাঁহাদের আসরে চারুচন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ইহার কারণ ছিল। গ্রামের অধিকাংশ ইতর জাতীয় লোক চারুর প্রজা, সুতরাং তাহারা ভিতরে ভিতরে যাহাই হোক, এবার চারু যখন বাড়ীতে রহিয়াছে, তখন তাহার অনুমতি ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। অথচ বারোয়ারীর সময় ছোট লোকের অতিশয় প্রয়োজন। তাহাদের নিকট হইতে চাঁদাও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদায় হয়। তাই চারুর মনস্তুষ্টির জন্য নেতৃগণ তাহাকে ডাকাইলেন। চারু তাঁহাদের প্রস্তাবের উত্তরে বলিল—"আমার মতে যাত্রা ও বাই নাচে অনর্থক পয়সা নষ্ট না করিয়া সেই টাকাতে গ্রামের পাঠশালাটির সংস্কার করা হউক; কারণ সেখানে ছেলেরা জল বৃষ্টির সময় বসিতে পারে না এবং বেশী মাহিনা দিয়া একটী ভাল পণ্ডিত রাখা যাক্। আর গ্রামের রাস্তাগুলির অবস্থা বড় শোচনীয়। এ বছর এই টাকা হইতে কিছু মেরামত করা হউক, পরে সরকার হইতে টাকা লইবার চেষ্টা করা যাইবে।"

যুবক পাণ্ডাদল ক্রোধে অধীর হইয়া চুপি চুপি বলাবলি করিতে লাগিল—"এই সকল কাজের শনি অকাল-কুষ্মাণ্ডকে কেন ডাকা হইল? ও যদি তেমনি হবে, তবে কি ওকে চাকরি থেকে দূর ক'রে দেয়?" বসন্ত চট্টোপাধ্যায় একটু কাশিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, —"অবশ্য বাবাজি তুমি যা ব'লছ, সে তো খুব উত্তম প্রস্তাব; তবে কি জান, এক ঘেয়ে নিরামিষ্যি জীবনটা ভাল লাগে না, মাঝে মাঝে একটু রকমারি থাকা চাই।" চারু কিছুতেই রাজি হইতে পারিল না। শেষে অনেক রাত্রি হওয়াতে সভাভঙ্গ হইল।

সে বৎসরে বারোয়ারীতে যাত্রা আসিল বটে, কিন্তু বাই নাচ হইতে পারিল না। চারু নিজে বেশী চাঁদা দিয়া ও আপনার লোকদের কাছ হইতে টাকা তুলাইয়া পাঠশালাটিকে নূতন নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ছেলেরা পাণ্ডা নহে, সুতরাং তাহারা পাঠশালাটিকে নূতন হইতে দেখিয়া বড়ই আমোদ উপভোগ করিল।

চারুচন্দ্র বাই নাচে বাধা দেওয়াতে পাণ্ডাদের অন্তঃকরণে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহারা বিরক্ত ছিল, এখন একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। চারুকে ইহার জন্য পরে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

(৫)

মেয়ে মহলে উর্ম্মিলা সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে নানারূপ আলোচনা চলিত বটে, কিন্তু সকলেই তাহার রূপ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরিত।

যতই তাহারা তাহার রূপের কোন ত্রুটী বাহির করিতে পারিত না, ততই জোর করিয়া নানারূপ কাল্পনিক নিন্দা দ্বারা মনকে স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিত। রংটা কি ফ্যাকাশে! মাথায় চুল থাকা ভাল বটে, কিন্তু তাই ব'লে মাথাতে পঞ্চবটী বন থাকা কিছু ভাল নহে; জোড়া ভুরু সুন্দর, কিন্তু কপালের নীচে কালী লেপিয়া রাখা একটুও মানায় না; লম্বা যেন তালগাছ—ইত্যাদি প্রবোধবাক্যে মনের অন্তর্দাহ নিবাইত। কিন্তু উর্ম্মিলার মধ্যে কি এক প্রকার বিজয়িনী মন্ত্রশক্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহা সকল নিন্দা ও অপযশকে পরাভূত করিয়া সেই পল্লীবাসিনীদের প্রাণকে সময়ে সময়ে তাহার দিকে টানিয়া লইত। তাহাদের কুবুদ্ধি যখন রসনায় প্রচার করিত—উর্ম্মিলা লজ্জাহীনা, অহঙ্কারদৃপ্তা, বিলাসপরায়ণা ইত্যাদি, তখন সুবুদ্ধি হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিত,—কেন সে তো আপনার স্বামীর সহিতই কথা বলে, সে বিদ্যা বা ধনের অহঙ্কার করে না, সে সোনায় গা মুড়িয়া তাহারই গরবে এই ধরাকে সরা জ্ঞান করেনা, বরং তোমাদের অনেকের সোনার ভারে কাণ ছিঁড়িয়া যায়।—এইরূপে অনেক সময় কুবুদ্ধির শতপ্ররোচনা সত্ত্বেও তাহাদের হৃদয় নামক পদার্থটী অজ্ঞাতসারে উঁকি দিয়া উর্ম্মিলাকে দেখিত এবং তাহাকে দেখিয়া তাহার মহিমমণ্ডিত চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িত।

উর্ম্মিলা যখন কোন কোন দিন স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক চাটুর্য্যে-বাড়ী গিয়া মহাভারতের শান্তি পর্ব্ব পাঠ করিত, তখন তাহার সুকোমল কণ্ঠোচ্চারিত মধুর পদাবলীর ঝঙ্কারে নারীকুলের স্বভাবকোমল হৃদয় দ্রব হইয়া যাইত; তাহারা দেখিতে পাইত, তাহাদের অযথা আরোপিত শত কলঙ্কের মলিনতা অতিক্রম করিয়া একটী সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ পুণ্যজ্যোতিঃ সেই সরল সুন্দর মুখখানিতে প্রতিভাসিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের স্বামিগণের ভয়ে তাহারা হৃদয়ের এ ভাব চাপা দিয়া বাহিরে বিরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিত।

পৃথিবীতে কতকগুলি লোক আছে, যাহারা স্নেহ যত্ন ও ভালবাসার জন্য অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত। পাড়ার শিশুরা অবসর পাইলেই উর্ম্মিলার কাছে ছুটিয়া হাজির হইত। উর্ম্মিলা ছেলেদের বড় ভালবাসিত, সে এমন প্রীতিভরে তাহাদের সঙ্গে গল্প করিত, যেন সেও একটী ক্ষুদ্র বালিকা—তাহাদেরই মত সরল তেমনিই কোমল প্রকৃতি। উর্ম্মিলার কাছে আসিবার জন্য তাহারা প্রায়ই বাড়ীতে প্রহার পাইত, কিন্তু তথাপি তাহারা না আসিয়া থাকিতে পারিত না। হয়তো রামমুখুর্য্যে তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা নীরুকে অনেক শাসন করিয়া আপনার কাছে লইয়া ঘরে শুইয়াছিলেন, কিছুতেই চারুদের বাড়ীতে যাইতে দিবেন না। ইত্যবসরে কখন তাঁহার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, তাহার পর চক্ষু খুলিয়া দেখেন প্রেমের মন্ত্র কোলের ছেলেকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে! কাজেই গৃহিণীকে আবার মেয়ে আনিতে ছুটিতে হইত।

উর্ম্মিলা যদি ছেলেদের বলিত—"দেখ, এখানে এলে তোমাদের বাপ মা তোমাদের মারেন, তোমরা আর এসো না, তা আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে গল্প ব'লে আসুব।" তাহারা উত্তর দিত—"আমাদের বাড়ী ভাল লাগেনা, তোমাদের বাড়ী খুব ভাল, তুমি বেশ ভাল।" কাযেই ইহার উপরে কথা চলিত না।

(৬)

সেই দিনকার নৈশসভায় চারু বারোয়ারির পাণ্ডাগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে বিষবৃক্ষের বীজ পবন করিয়াছিল, অচিরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। চারু আপনার জমিগুলিকে প্রকৃষ্টতর প্রণালীতে কর্ষণ করিয়া রীতিমত সার দিয়াছিল বলিয়া সে বৎসর তাহার জমিতে খুব ফসল জন্মিয়াছিল। সে দেশে আসিয়া দুইখানি নূতন ঘর করিয়াছে, অবশ্য কতকটা সহরের ধরণে। একটিতে সে পড়াশুনা করে, সেই ঘরে একটি আলমারিতে তাহার হৃদয়ের প্রিয় পদার্থ পুস্তকগুলি সযত্নে রক্ষিত থাকে। অপরটী তাহার শয়ন গৃহ। পূর্ব্বের শয়ন গৃহটি এক্ষণে ভাঁড়াররূপে ব্যবহৃত হয়।

একদিন মাঠে জমি দেখিতে গিয়া চারু দেখিল যে, তাহার অধিকাংশ ফসল কাহার গরুতে নষ্ট করিয়াছে;

পুকুরের পাড়ের নারিকেল গাছ হইতে সমস্ত নারিকেল চুরি হইয়াছে। চারু অনেক সন্ধান লইয়াও অপচয়-কারীকে বাহির করিতে পারিল না।

কিন্তু সে বুঝিল, এইবার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। বারোয়ারীর পাণ্ডারা যে ইহার মূল তাহা বুঝিতেও বাকি রহিল না। ইহাতে সে দুঃখিত হইল, কারণ উর্ম্মিলার কথাই তাহার সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে।

ইহার পর একদিন দুই প্রহরে সে ও উর্ম্মিলা ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, হঠাৎ দেখিল তাহাদের প্রাঙ্গণ ধূমে পরিপূর্ণ। বাহির হইয়া দেখে, তাহাদের ভাঁড়ার ঘর খানি দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। অবশ্য দেখিতে দেখিতে বাড়ী লোকে ভরিয়া গেল, কিন্তু অগ্নি-নির্ব্বাণ করিতে করিতে ঘরখানি দগ্ধ হইল; ভাণ্ডারে সঞ্চিত যাবতীয় দ্রব্যাদি ভস্মীভূত হইয়া গেল।

চারু ভাবিল -- আর না, কোন্ দিন প্রাণে মারিবে। উর্ম্মিলাকে সঙ্গিনী করিয়া পথে ভিক্ষা করিলেও সে নৃপতির ন্যায় দিন যাপন করিতে পারিবে। তাহার ন্যায় সতী লক্ষ্মী প্রেমময়ী যেখানে চির সহচরী, সেখানে গৃহলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য বাঁধা। তাই রাত্রে চারু উর্ম্মিলাকে বলিল—"উমা আর কেন? চল।"

উ। কোথায়?

চা। এ গ্রাম ছাড়িয়া।

উ। কেন?

চা। প্রাণ বাঁচাইতে।

উ। আমাদের প্রাণ বাঁচাইবার কর্ত্তা তো আমাদের উপরে একজন আছেন। তিনি আমাদের চেয়ে কম ভাবেন না। তুমি কি মনে কর, এর মধ্যে কোন অভি-প্রায় নেই? আমিতো তোমারই শিক্ষায় বেশ বুঝেছি, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন গাছ হ'তে একটি শুক্‌নো পাতাও মাটিতে পড়ে না।

চারুর হৃদয় উচ্ছ্বসিত স্নেহাবেগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, তাহার সম্মুখে কোন উদ্ধারকারিণী দেবীপ্রতিমা এই সঙ্কটকালে তাহার সখীরূপে দণ্ডায়মানা। সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উর্ম্মিলার মুখ চুম্বন করিল।

(৭)

কোন্ ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়া বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় এ জগতে সংসাধিত হয়, অজ্ঞান মানব তাহার কি বুঝিবে? এই বিশ্বরঙ্গভূমির ক্ষুদ্রতম লীলার অভিনয়েও গভীর অর্থ নিহিত আছে।

পূর্ব্বে গ্রাম শুদ্ধ লোক চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কিন্তু সেই দিনের দ্বিপ্রহরের সেই নৃশংস ঘট-নায় অনেকের মনে হঠাৎ যেন কি এক দারুণ আঘাত লাগিল। নিরপরাধের প্রতি এ অন্যায় অত্যাচার কেন? চারু গ্রামের মঙ্গল ব্যতীত কখনও অমঙ্গল করে নাই।

গ্রামবাসিগণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে চারু বা উর্ম্মিলা গৃহদাহের জন্য একবারও হা হুতাশ করিল না, উচ্চ চীৎকারে গ্রাম বিদীর্ণ করিল না, কাহারও সন্তানের মস্তক চর্ব্বণ করিল না; নীরবে অসীম ধৈর্য্যের সহিত সকলই সহ্য করিল।

প্রকৃত সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার মধ্যে এমন একটী অপূর্ব্ব উচ্চ মহিমা জড়িত থাকে যে, তাহার সম্মুখে কঠোর নৃশংস দানব হৃদয়ও অভিভূত হইয়া পড়ে।

একদিন বৈকালে চারু ও উর্ম্মিলা বহির্ব্বাটির অঙ্গনে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। সূর্য্য তখন অস্ত যায় যায়। দুইএক খানি খণ্ডমেঘ অনন্ত আকাশের অকূল সাগরে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে; সন্ধ্যা দেবী নিঃশব্দ চরণে ধরণীর পৃষ্ঠে পদার্পণ করিবার জন্য পূর্ব্বা-কাশের প্রান্ত সীমায় অপেক্ষা করিতেছেন; কুলায়ো-মুখ বিহঙ্গকুলের কলধ্বনিতে তরুশির প্রতিনিনাদিত, অদূরে প্রাঙ্গণে বাঁধা গাভিটি সন্ধ্যাসমাগমে গৃহ প্রবেশের জন্য ব্যাকুল ভাবে দণ্ডায়মান, বৎসটি তাহার চতুর্দ্দিকে লাফাইয়া বেড়াইতেছে; আকাশে নবমীর চন্দ্র শুক্লাম্বর পরিহিতা নববধূটীর মত ব্রীড়াবনতমুখী—ঠিক এমন সময়ে চারু বলিল, "উমা! এই আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ উদার আলোকে তোমার মুখখানি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!"—

উমা। থাম কবি, পায়ে পড়ি—এখনি হয়তো বল্‌বে, আকাশের চাঁদ আমার মুখের কাছে দাঁড়াতে পারে না! তা হে দার্শনিক! হঠাৎ এ কবিত্বের উচ্ছ্বাস কেন?

চারু। স্থান, কাল, সঙ্গ মাহাত্ম্যে। মূর্ত্তিমতী বাণী সম্মুখে থাকিলে কোন্ ভক্তের হৃদয় শূন্য থাকে?

উ। না না, আমার অপরাধ হয়েছে, তুমি বল, বল। এমন সময়ে ভট্টাচার্য্যদের আদ্যাঠাকুরাণী ব্যাকুল ভাবে সেখানে আসিয়া বলিল—"বাবা চারু, রাখালের আমার ক'বার বমি হয়েছে, বড় যেন কাহিল হ'য়ে প'ড়েছে; তুমি একবার এসে দেখ বাবা।" তখন গ্রামে দু একটি ঘরে কলেরা হইতেছিল। চারু বাড়ীতে হোমিওপ্যাথিক পাঠ করিত, এবং চিকিৎসা বিষয়ে তাহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। রোগীর সেবা করিতে সে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিত। উর্ম্মিলাও এ বিষয়ে তাহার যথার্থ সহধর্ম্মিণী ছিল।

রাখাল বাবু গ্রামের জমিদার। চারু এই সংবাদ পাইয়াই তাহার ক্ষুদ্র ঔষধের বাক্সটী লইয়া চলিল। সে অবস্থা বুঝিয়া কয়েকটী ঔষধ প্রয়োগ করিল। তাহাতে ঠিক কলেরার লক্ষণাদি দূরীভূত হইলবটে, কিন্তু পর দিন প্রাতঃকালে হইতে রাখাল বাবুর জ্বর হইল এবং সেই জ্বর ক্রমশঃ "রেমিটেণ্ট ফিভারে" (Remitent fever) পরিণত হইয়া পড়িল। চারু রাত্রিদিন রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইল, বাড়ীতে কেবল দুটী খাইত মাত্র। কিন্তু রোগীর যখন অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিল এবং বাড়ীর লোকেরা সেবার পরিবর্ত্তে ক্রন্দনের হাট বসাইয়া রোগীর গৃহ অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল, তখন সে তাহার শান্তিময়ী সঙ্গিনীকে সেবা কার্য্যের সহচরীরূপে রাখাই স্থির করিল। উর্ম্মিলা প্রত্যহই বলিত—"ক্রমাগত রাত জাগিয়া তোমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, আমিও না হয় যাই। তবু রাত্রে কিছুক্ষণ সাহায্য করিতে পারিব।" চারু বলিত—"অনর্থক তোমাকে কেন কষ্ট দিব, দরকার হইলে নিশ্চয়ই লইয়া যাইব।"

এখন উর্ম্মিলাকে এই কথা বলিবামাত্র সে স্বামীর সহিত ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। উর্ম্মিলা অতীব ধীরা, বুদ্ধিমতী এবং সুশিক্ষিতা। রোগীর সেবা এই তাহার প্রথম নহে। তবে পুরুষ রোগীর সেবা তাহার পক্ষে এইপ্রথম বটে; কিন্তু স্বামীর পার্শ্বচরী হইয়া সে কোন রোগীর সেবা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাহার বিশ্বাস ব্যাধি ভগবানের পরীক্ষা বিশেষ, তাহার কাছে সুদীর্ঘ ঘোমটা বা অযথা লজ্জাশীলতার আবশ্যক নাই। উর্ম্মিলা সলজ্জ সম্ভ্রমের সহিত রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা দেখিল, কি আশ্চর্য্য—যাহাকে হাস্যপরিহাসের সহযোগিনীরূপে তাহারা এ পর্য্যন্ত বাড়ীতে আনিতে পারে নাই, আজ সে বিনা অনুরোধে স্বইচ্ছায় এই ভীষণ রোগ-শয্যার পার্শ্বে অম্লান বদনে আপনাকে সমর্পণ করিল! তাহারা জানিত, যে বাড়ীতে রোগ, সে বাড়ীর ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে নাই, অথবা মৌখিক ভদ্রতার খাতিরে স্নানের সময় তৈলাক্ত দেহে একবার দূর হইতে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে হয় মাত্র। কিন্তু রোগের সময় স্বার্থ-সুখ, সৌভাগ্য বিসর্জন দিয়া পরার্থে এমন করিয়া প্রাণ সমর্পণ এ তাহাদের চক্ষে নূতন দৃশ্য বোধ হইল।

রাখাল বাবু রোগ শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া দেখিতেন, চারু আপনার ভাই অপেক্ষা অধিক যত্নে নিয়ত তাঁর সেবা করিতেছে। একখানি সুকোমল পবিত্র হস্ত সর্ব্বদা তাঁহার রোগোত্তাপক্লিষ্ট কপালের ঘর্ম্মধারা মুছাইতেছে, তাহার সন্তাপদগ্ধ শরীরের উপর সুশীতল করুণার বাতাস সঞ্চালিত করিতেছে। আহা! সে স্পর্শ যথার্থই দেবস্পর্শ; এমন নারীর স্বর্গীয় পুণ্যপ্রভাবে রোগের যন্ত্রণা অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। রাখাল বাবুর মনে হইল, চারু উর্ম্মিলা বুঝি পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার পিতা মাতা ছিলেন। অথবা তাঁহারা স্বর্গের দেবদূত, পাপী নরাধমের শিক্ষার জন্য তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাখাল বাবু আজ নির্নিমেষ লোচনে উর্ম্মিলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে যেন কি এক দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হইল।

তখন সেই রোগি-গৃহের নিশীথ নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া রাখাল বাবু রোগশীর্ণ হস্তে উর্ম্মিলার হাতখানি ধারণ করিয়া উচ্ছ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি আমার মা; তুমি কি আমার মা নও? বল, মা ছাড়া কে এমন

করিয়া নরাধমের সেবা করে? মা! আমার মাথায় তোর পায়ের ধূলা দে। তোরা দেবতা, এ পাপীকে উদ্ধার কর্। চারু, ভাই আমার—তোমায় কি ব'ল্‌ব? আমার যে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। যদি এই রোগেই মরি, ভাই আমাকে ক্ষমা করিও—নচেৎ আরও নরকে পুড়িয়া মরিব। ভাই! আমিই তোদের সকল কষ্ট যন্ত্রণার মূল, এই পাষণ্ডের পাপ বুদ্ধিতেই তোর শস্য নষ্ট, ও সকল জিনিষ অপহৃত হ'য়েছে। আমিই তোর ঘরে আগুন দিয়াছিলাম। কিন্তু ভাই, সে আগুন তোর ঘরে লাগে নাই, সে তখনই নিবেছিল—সে আগুন আমারই প্রাণে লেগেছে। মা উমা, তুমি বল মা, এ পাষণ্ডকে, এ—"

রাখাল বাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। নিশীথ-নীরবতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। পৃথিবীতে পাপের জন্য অনুতাপের ন্যায় পবিত্র সুন্দর জিনিষ কিছুই নাই। অনুতাপের অশ্রুজলে সেই রোগিগৃহের রুদ্ধ আকাশ নির্ম্মল দেবপ্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(৮)

ঈশ্বরেচ্ছায় রাখাল বাবু রোগ মুক্ত হইয়াছেন। তিনি এখন নূতন প্রাণী। রোগের অগ্নি-পরীক্ষায় তাঁহার হৃদয়ের মলিন সোনা শ্যামিকা-পরিশূন্য হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই নাম দেবকৃপা।

এখন তিনি সদা সর্ব্বদা চারুর বাড়ীতে আসেন। চারু ও উর্ম্মিলাকে যথার্থই তিনি ভক্তি করেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পরিষদ্‌বর্গের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। চারু এখন তাঁহার সকল কার্য্যে মন্ত্রণাদাতা। তাঁহার পরিবারবর্গকে তিনি অনেক সময় জোর করিয়া চারুদের বাড়ী পাঠাইয়া দেন।

অধিনায়ক রাখাল বাবুর যদি মতিগতি পরিবর্ত্তন হইল, তবে অন্যান্য অনুচরবর্গের না হইবে কেন? বিশেষতঃ তাহারা অনেকে পূর্ব্ব হইতেই চারু ও উর্ম্মিলার গুণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল রাখাল বাবুর খাতিরে প্রকাশ্য ভাবে মিশিতে পারিত না।

এখন পাড়ার ছোট বড় মেয়েরা অবাধে উর্ম্মিলার কাছে আসিত। কেহ লেখাপড়া শিখিত, কেহ শেলাই শিখিত। উর্ম্মিলার ক্ষুদ্র বাড়ীটী দুই প্রহরে রমণী কণ্ঠের কলকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত। প্রেম ও সহিষ্ণুতারই জয় হইল। এ দৃশ্য দেখিলে কাহার না চক্ষু জুড়ায়?

শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী।

৪

আমেরিকায় পৌছিয়া আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সমভিব্যাহারে প্রথমে নিউজরসী নগরে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে চারি মাস অবস্থান করিতে হয়। সেখানে বাসকালে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কার্পেণ্টার পরিবার ভুক্ত সকলেরই প্রীতি ভাজন হইয়াছিলেন। বালক বালিকারা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদিগের এই হিন্দু ভগিনীর সঙ্গ ত্যাগ করিত না। সঙ্গিনীগণ তাঁহার নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন। বিদেশে গিয়া উপহাসিত হইবার ভয়ে পরকীয় রীতিনীতির অবলম্বন দূরে থাকুক, তিনি স্বীয় ব্যবহারগুণে কার্পেণ্টার পরিবারে নানা বিষয়ে হিন্দু রীতিনীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে কখনও নাম ধরিয়া ডাকিতেন না। গুরুজনের নামোল্লেখ পূর্ব্বক আহ্বানের রীতি পাশ্চাত্য দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত; এমন কি পুত্রও পিতার নাম গ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। কিন্তু আনন্দী বাঈর আচরণে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের আত্মীয় স্বজনেরা এ বিষয়ে হিন্দু রীতির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিলেন। প্রাতঃকালীন "শেকহ্যাণ্ডের" পরিবর্ত্তে নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিবার প্রথা তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। আনন্দীবাঈ কার্পেণ্টার পরিবারের "হেলেনা," "স্টুয়ার্ট" এবং "এ্যামি" প্রভৃতি নামের স্থলে "তারা," "সগুণা," ও "প্রমীলা" নামের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি তাঁহার অনেক সঙ্গিনীকেই ভারতবর্ষীয় শাড়ীর পক্ষপাতিনী করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদিগের অনেকেই মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে

বেণীমুক্ত-কবরীবন্ধন ও সীমন্তদেশে সিন্দূরধারণে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের গৃহে শাড়ীর মাহাত্ম্য এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, বালকবালিকারা তাহাদের পুতুলগুলিকেও শাড়ী না পরাইয়া তৃপ্তি লাভ করিত না।

আনন্দী বাঈর ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর গোপালরাও একটী পত্রে তাঁহাকে আবশ্যক হইলে বৈদেশিক বেশ ভূষা ও মাংসাহার করিবারও অনুমতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দী বাঈর স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় প্রীতি ছিল যে, তিনি আমেরিকার ন্যায় শীতপ্রধান দেশে অবস্থান কালেও কখনও আমিষ স্পর্শ করেন নাই। সুস্থাবস্থায় তিনি সর্ব্বদা স্বহস্তে "ডালরুটি" প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতেন। ঐ প্রদেশের শৈত্যাধিক্য বশতঃ তাঁহাকে পোষাক পরিচ্ছদে সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে শাটী পরিধান করিলে পদযুগলের নিম্নভাগ কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত থাকে বলিয়া তিনি গুজরাটি ধরণে শাড়ী পরিতেন। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তিনি অর্ণবপোতে আরোহণ করিবামাত্র পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয় ধরণের শাড়ী পরিতে বিলম্ব করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদের জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ড, আয়ার্লণ্ড ও আমেরিকায় কয়েকবার দুষ্টজনের হস্তে কথঞ্চিৎ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের নিকট উপহাসভাজন হইতে হইবে বলিয়া প্রবাসকালে পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুবর্ত্তন এবং স্বদেশে আসিয়া অভ্যাস দোষের দোহাই দিয়া প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়েও সাহেবী খানায় অনুরাগ প্রকাশ ও উষ্ণ পরিচ্ছদে দেহকে আবৃত করিয়া সাহেবিআনার মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাঁহারা কি একবার আনন্দী বাঈর দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবেন?

আমেরিকায় অবস্থান কালে একদিনের জন্যও কোনও বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ পায় নাই, কেহই তাঁহাকে "আনাড়ী" বলিয়া ভাবিবার অবসর পায় নাই। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে দুই একদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্য গৃহকর্ম্মে যথোচিত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের গৃহে রন্ধন ভিন্ন তিনি যাবতীয় কার্য্যেই গৃহস্থদিগকে সহায়তা করিতেন। বাল্যাবধি তাঁহার ক্রীড়ানুরাগ প্রবল ছিল। একবার মাত্র দেখিয়া তিনি তত্রত্য বালকবালিকাগণের ক্রীড়া-পদ্ধতি এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার খেলিবার পর্য্যায় উপস্থিত হইলে তিনি প্রথমবারেই সকলের অগ্রস্থান অধিকার করিলেন। সঙ্গীতবিদ্যাও তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তিনি অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ক মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। সকলেই তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিত। কিন্তু সেই প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দী বাঈ কখনও গর্ব্বে স্ফীত হন নাই। এমন কি, তজ্জন্য আত্মপ্রসাদের কোনও লক্ষণ কখনও তাঁহার বদন মণ্ডলে প্রকাশ পাইত না।

কণ্ঠস্বরের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্যও আমেরিকাবাসীর প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীমতী কার্পেণ্টার বলেন, —"আনন্দী বাঈর স্বদেশীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইলে আমার নেত্র উদ্ভাসিত হইয়া যায়। মনে হয় যেন দেবলোক হইতে কোনও অপ্সরা ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" আনন্দী বাঈর রূপ যে অনিন্দ্য সুন্দর ছিল, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার দিব্যজ্যোতিঃ সকলকেই বিস্ময়ে আপ্লুত করিত। তাঁহার বিবিধ অবস্থার চিত্র দর্শন করিলে অনেক সময়ে তাঁহাকে কামরূপধারিণী বলিয়াই সন্দেহ জন্মে। চিত্রের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ বশতঃ তিনি আমেরিকায় অবস্থান কালে আপনার বহুসংখ্যক ফটোগ্রাফ তুলাইয়া ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রত্যেক চিত্রেই তাঁহার ভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশমান! এমন কি, তাঁহার কোনও দুইখানি ফটোগ্রাফ একরূপ নহে। তাঁহার একই দিবসে গৃহীত দুইখানি ফটোগ্রাফেও তাঁহার রূপের এতদূর বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় যে, কোনও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই সে দুটিকে এক ব্যক্তির চিত্র বলিয়া সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার এই নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যভঙ্গীর জন্যই বোধ হয় তিনি

শ্রীমতী কার্পেণ্টারের চক্ষে দেবকন্যার ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তাঁহার সদানন্দভাবও ইহার অন্যতর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কি পাঠাভ্যাসের সময়, কি গৃহস্থালীর কার্য্যে, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সদা প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া শ্রীমতী কার্পেণ্টার এতদূর মুগ্ধ হইয়া ছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে "আনন্দ-নির্ঝরিণী" আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন।

কিন্তু এই দেবকন্যারূপিণী আনন্দ-নির্ঝরিণীও সময়ে সময়ে শোকের আবিল তরঙ্গে বিক্ষোভিত হইত। ভারত-বর্ষের ডাক আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে অথবা গোপালরাওয়ের পত্র পাইতে বিলম্ব ঘটিলে আনন্দীবাঈর মুখে উদ্বেগ ও উদাসীনতার ছায়া পরিদৃষ্ট হইত। তিনি একটি পত্রে গোপাল রাওকে লিখিয়াছেন,—"অন্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও একটী বিষয়েই আমার মন সংযুক্ত থাকে। আপনার চিন্তায় (ধ্যানে) আমি অধিকংশ সময় আনন্দ উল্লাসে যাপন করি; কিন্তু যখন আমাদের উভয়ের দূরত্বের বিষয় মনে উদিত হয়, তখন হৃদয় নিরাশা সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। আমি যথাসাধ্য নিজের মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা করি, তথাপি মুখে বিষাদের ছায়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে বলিয়া আমার মনে হয়। প্রথমে প্রথমে আমার বড় কান্না পাইত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এপর্য্যন্ত কাহাকেও আমার অশ্রু দেখিতে দিই নাই। এখন আর প্রায় চক্ষে জল আসে না, দুঃখবেগ অসহ্য হইলে কেবল জিহ্বা ও কণ্ঠ শুষ্ক হয়, হৃদয় অব্যক্ত যন্ত্রণার ভারে মথিত হইয়া যায়। কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিবার অবসর সকল সময়ে পাই না।" এরূপ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আনন্দীবাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের নিকট আনন্দ-নির্ঝরিণী-রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, ইহা কি সামান্য ধৈর্য্যশীলতার পরিচায়ক?

আনন্দীবাঈয়ের আমেরিকায় অবস্থান কালে এদেশ হইতে কয়েক জন শিক্ষার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে, আনন্দীবাঈর পত্রে কেবল বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। অপর কয়েক জনের সম্বন্ধে তিনি পুণার কোনও বান্ধবীকে লিখিয়াছেন—"আমেরিকায় আগমন করিলে যে ভারতবাসীর দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, একথা ইহাদের অনেকে বুঝেন না। এখানে আসিলে স্বর্গ হাতে পাইয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের সংখ্যা কম হইলেও আমেরিকার লোকেরা ইঁহাদিগের আচরণ দেখিয়াই সমগ্র ভারতবাসীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এই কারণে জনক জননীর ও স্বদেশের সুনামের জন্যও ইঁহাদিগের এদেশে অবস্থান কালে সদাচরণে অনুরাগ প্রকাশ কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন আমাকে থিয়েটারে দেখাইতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিলাম। ইনি বোধ হয় ভাবেন যে, তাঁহার ন্যায় সকলেই শিক্ষা উপলক্ষে এদেশে বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে আসিয়াছে। ইঁহার ন্যায় কয়েক জনের ব্যবহারে মার্কিনবাসীর চক্ষে ভারতবাসীর মর্য্যাদা লাঘব হইয়াছে দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। একেই এদেশের লোকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রকার কুসংস্কার আছে। তাহার উপর আবার খৃষ্টীয় ভট্টাচার্য্য-গণের অনুগ্রহে তাহা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক ভারতবাসী এদেশে বাসকালে সতর্কতার সহিত সদাচরণ না করিলে ভারতমাতার মর্য্যাদার হানি ঘটিবে।"

আনন্দী বাঈ আমেরিকায় গমন করিলে ফিলাডেল-ফিয়া ও নিউইয়র্ক হইতে তিনি শিক্ষালাভের জন্য আহূত হন। ফিলাডেলফিয়ার ওল্ড-স্কুল নামক বিদ্যালয়ে চিকিৎসা-পারদর্শিনী রমণীগণের দ্বারা শিক্ষাদান কার্য্য সমাচিত হইয়া থাকে বলিয়া সেখানে গমন করাই আনন্দী-বাঈ সঙ্গত মনে করিলেন। প্রথমে, তথায় একবৎসর কাল শিক্ষালাভ করিয়া পরে নিউইয়র্কে গমন পূর্ব্বক হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিবার তাঁহার সংকল্প ছিল; কিন্তু পরে সে সংকল্প তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এদিকে ফিলাডেলফিয়ার স্কুলের প্রধান অধ্যাপিকা মিস্

বাডেল মহোদয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দীবাঈকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে তিন বৎসর শিক্ষার জন্য ছয়শত ডলার বৃত্তিদানের অঙ্গীকার করিলেন। ঐ কলেজের নিয়মানুসারে বিংশ হইতে ত্রিংশৎবর্ষীয়া ছাত্রী-রাই বৃত্তিলাভের অধিকারিণী হইয়া থাকে। আনন্দী বাঈ ইহা অবগত হইয়াও আপনার বয়স গোপন করেন নাই। তিনি যে অল্প দিনমাত্র অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, এ কথা তিনি মিস বাডেলকে স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছিলেন। তথাপি মিস্ বাডেল তাঁহাকে বৃত্তি দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। বোষ্টন কলেজ হইতেও তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার কলেজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ এবং সার্জ্জরি বা অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষারও বিশেষ সুবিধা তথায় ছিল বলিয়া আনন্দীবাঈ সেইখানে গমনেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

নিউজরসী পরিত্যাগের পূর্ব্বে আনন্দীবাঈ তাঁহার আমেরিকান সঙ্গিনীদিগকে একদিন মারাঠি ধরণের ভোজ দিলেন। ১৮ জন মার্কিন মহিলা সে দিন মহারাষ্ট্রীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া চেয়ার, টেবিল, বা কাঁটা চামচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দুরীতিক্রমে ভোজন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে আনন্দীবাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সহিত ফিলাডেলফিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরদিন কলেজকর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সমারোহসহকারে আনন্দীবাঈকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। আনন্দীবাঈর অভিনন্দনের জন্য সে দিন পঞ্চশত মহিলা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলেজের নিকটেই আনন্দীবাঈর জন্য একটি ঘর ভাড়া করা হইয়াছিল। শ্রীমতী কার্পেণ্টার তাঁহাকে তথায় রাখিয়া দুই একদিন পরে স্বগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগের সময় আনন্দী বাঈর মনে যেরূপ কষ্ট হইয়াছিল, শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে বিদায় দিবার সময়েও তিনি সেইরূপ মনঃকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পানাহারাদি কিছুই সুখকর বোধ হয় নাই। ফলতঃ যাঁহার মাতৃতুল্য যত্নে তিনি চারিমাসকাল নিউজরসী নগরে বাস করিয়া একদিনের জন্যও বিদেশের দুঃখ বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার বিচ্ছেদ এরূপ দুঃসহ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের ন্যায় রমণীরত্ন সকল দেশেই বিরল।

ফিলাডেলফিয়ায় গিয়া অল্প দিনের মধ্যেই আনন্দী বাঈর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তিনি প্রত্যহ ১০।১১ ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতেন। তদ্ভিন্ন সমস্ত গৃহকার্য্যও একাকী তাঁহাকেই করিতে হইত। তাঁহার বাসগৃহটি তাদৃশ স্বাস্থ্যকর ছিল না। চুল্লীর দোষে সকল দিন শীঘ্র আগুণ ধরিত না। কাজেই কোনও কোনও দিন অনাহারে, কোনও দিন বা অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন ভোজন পূর্ব্বক তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইত। এই সকল কারণে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। আমেরিকার জল বায়ুর ও শীতোষ্ণাদির এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে যে, সুস্থ ব্যক্তিকেও সর্ব্বদা সাবধান না থাকিলে সহসা পীড়িত হইতে হয়। এক একদিন তথায় গ্রীষ্মাধিক্যে ৪।৫ শত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আবার তৎপর দিবসেই তুষারশীতল সমীরণে অনেকেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এরূপ অবস্থায় আনন্দীবাঈকে যেরূপ কষ্টে দিন পাত করিতে হইত, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ না হওয়াই বিচিত্র ছিল।

ফেব্রুওয়ারি মাসের প্রারম্ভে আনন্দীবাঈ "ডিপথিরীয়া" রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠনালীতে স্ফোটক হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। তাহার উপর জ্বর ও শিরঃপীড়া। সুতরাং দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সে যাত্রা তাঁহার বাঁচিবার আদৌ আশা ছিল না। কিন্তু তাঁহার সহপাঠিকা-গণের যত্নে ও শুশ্রূষায় তিনি বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেন। এই সময়ে তিনি গোপাল রাওয়ের ও শ্রীমতী কার্পেণ্টারের নিকট হইতে যে আশ্বাসপূর্ণ পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক কষ্টের বহু উপশম হইয়াছিল।

ফিলাডেলফিয়ায় গমনের পর পীড়া ভিন্ন আরও নানা

প্রকারে তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কঠিন পীড় হইতে আরোগ্য লাভের পর তিনি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্কুলের বোর্ডিং গৃহে গিয়া নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। এই ভোজনালয় কলেজের প্রধান অধ্যাপিকা মিস্ বাডেলের তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার ব্যবস্থাদোষে ভোজনার্থিনী-দিগের নানা প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হইত। ছাত্রীদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তিনি প্রায়ই দৃষ্টি রাখিতেন না। সেই ভোজনালয়ের কদন্ন ভক্ষণ করায় আনন্দী বাঈ কিছুতেই শীঘ্র স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিলেন না। তদ্ভিন্ন মিস্ বাডেলের হস্তে তাঁহাকে অন্য প্রকারেও নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এই অধ্যাপিকা অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে বিফলকাম হওয়ায় আনন্দী বাঈর প্রতি তিনি নানা প্রকারে বিরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেজন্য সময়ে সময়ে আনন্দী বাঈকে উপবাসেও দিনপাত করিতে হইয়াছিল।

এই সকল কষ্ট সহ্য করিয়াও আনন্দী বাঈ প্রাণপণে কলেজের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে কোনও নরপশু তাঁহাকে অতি কুৎসিৎ ভাষায় এক পত্র লিখিয়া মর্ম্মপীড়া প্রদান করে। ঐ পত্র পাঠ করিয়া আনন্দী বাঈ এরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, দশদিন পর্য্যন্ত আহার নিদ্রায় তিনি কোনওরূপে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পরি-শেষে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটী দিব্যরূপ ধারিণী রমণী আসিয়া তাঁহাকে এই পত্রের জন্য দুঃখ বোধ করিতে নিষেধ পূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন। তদবধি তাঁহার বিষণ্ণতা দূরীভূত হইল।

এ সকল পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে গোপালরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। প্রথমে আনন্দী বাঈ স্বামীকে প্রতি সপ্তাহে যথা নিয়মে বিস্তারিত পত্র লিখিতেন। ফিলাডেলফিয়ায় গমনের পর হইতে অনবসর বশতঃ তাঁহার স্বামীকে পত্র লিখিতে প্রায়ই বিলম্ব ঘটিত। তদ্ভিন্ন গোপালরাও কখনও তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া কার্ড লিখিতে বলিতেন; আবার কখনও বলিতেন,—"মাসে চারিবার সংক্ষিপ্ত পত্র না লিখিয়া একবার বিস্তারিত পত্র লিখিও।" এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় কি করিলে তাঁহার সন্তোষ জন্মিবে, আনন্দী বাঈ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। কাজেই পত্র সংক্রান্ত গোলযোগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ইহাতে গোপালরাও প্রথমে ভাবিলেন যে, আনন্দী বাঈর আলস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে! পরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অহঙ্কার-বশে তাঁহাকে পত্র লিখিতে তিনি ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন আনন্দী বাঈ গুজরাটী বেশ গ্রহণের পূর্ব্বে গোপালরাওয়ের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া গোপালরাও তাঁহার প্রতি অতীব বিরক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য সেরূপ অনুমতি লইবার কোনও আবশ্যকতাই ছিল না। কারণ, তিনি নিজেই তাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে আবশ্যক হইলে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারণ ও "আমিষ পর্য্যন্ত ভোজন করিবার" অনুমতি দিয়া-ছিলেন। কিন্তু এ সময়ে তাঁহার সে কথা মনে রহিল না। তিনি আনন্দী বাঈকে গর্ব্বিতা ও অবাধ্য বলিয়া অতি কঠোর তিরস্কার পূর্ব্বক এক পত্র লিখিলেন। (১৮৮৪ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী) কিন্তু গোপালরাওয়ের নিষ্ঠুরতার এই খানেই শেষ হয় নাই। তিনি একটি পত্রে তাঁহাকে "বিশ্বাস ঘাতিনী" পর্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই! বলা বাহুল্য, এই সকল পত্র পাঠ করিয়া আনন্দী বাঈর মর্ম্মপীড়ার অবধি রহিল না। সুখের বিষয়, ইহার পর সহধর্ম্মিণীর ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষোভপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া গোপালরাওয়ের পূর্ব্বভাব দূরীভূত হইল। জ্ঞানলাভবিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি ইহার পর তাঁহাকে "সরস্বতী" নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন! অব্য-বস্থিত চিত্ত ব্যক্তিগণ এইরূপেই ক্ষণে রুষ্ট ও ক্ষণে তুষ্ট হইয়া থাকেন।

বাল্যকালে আনন্দী বাঈর উদ্যানরচনার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল, একথা ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি উদ্যান সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার কোনও অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ফিলাডেলফিয়ায়

আসিয়া তিনি সে বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। কালেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া তিনি যে সামান্য অবকাশ পাইতেন, তাহা উদ্ভিদ বিদ্যার (বোটানির) আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। বনপুষ্পাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাঁহার বহু সময় অতীত হইত। তিনি জার্ম্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষার অনুশীলনও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে পরিশেষে তাঁহাকে সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, বিদেশে গিয়াও তাহার লাঘব হয় নাই। গোপালরাও তাঁহাকে সময়ে সময়ে এদেশ হইতে সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠাইয়া দিতেন।

একটী পত্রে আনন্দীবাঈ বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কিনবাসীরা নিতান্ত অজ্ঞ। "হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুআচার ব্যবহারের মর্ম্ম মার্কিনবাসীকে বুঝাইবার জন্যই আমি সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেছি," এই মর্ম্মে তিনি একবার ভারতবর্ষ হইতে শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠিকাবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। ফিলেডেলফিয়ায় গিয়া আনন্দীবাঈ সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছিলেন। ভারতপ্রত্যাগত মিশনারী রমণীগণ হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যদৃচ্ছা মতামত প্রকাশ করিলে তিনি প্রায়ই তাঁহাদিগের ভ্রান্তি খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইতেন। একবার হিন্দু বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে একজন বক্তৃকারিণীর মতের প্রতিবাদ করিয়া তিনি একটি স্ত্রীসভায় জয়লাভ করেন এবং সে জন্য দশ ডলার পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সেই সভায় প্রায় দুই সহস্র রমণী উপস্থিত ছিলেন। "হিন্দুরমণী" সম্বন্ধেও তিনি একবার বক্তৃতা করিয়া মার্কিনবাসীর কুসংস্কার দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অবসরের অভাবে তাঁহাকে অনেক স্থলেই বক্তৃতার নিমন্ত্রণে প্রত্যাখ্যান করিতে হইত।

কিসে মার্কিনবাসীর চক্ষে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহার চিন্তাই আনন্দীবাঈর চিত্তক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। তিনি একটী পত্রে তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আমাদিগের জাতীয় পতাকা কি? তাহার বর্ণ ও আকৃতি কি প্রকার? •মহারাজ শিবাজীর বিজয়-পতাকা কিরূপ ছিল? মহারাষ্ট্রীয় হইয়া একথা না জানা লজ্জার বিষয় বটে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এ সকল তত্ত্ব জানাইবেন। যদি পারেন, তাহার চিত্র বা অনুকৃতি পাঠাইবেন। তাহা হইলে এখানে কলেজের সহপাঠিকাদিগকে এবং প্রধান অধ্যাপিকা ও মাসিমাকে (শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে) তাহার এক একটী প্রতিলিপি বা প্রতিকৃতি প্রদান করিব। এবং নিজের কাছে আসল নিশানটি রাখিব!"

ফিলাডেলফিয়ায় কিছুদিন অবস্থানের পর গোপাল রাওর বিচ্ছেদ আনন্দীবাঈর পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। একারণে তিনি স্বামীকে আমেরিকায় আহ্বান করিয়া পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের একাংশ এইরূপ,—"আপনার নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া আজ ঠিক এক বৎসর, দুই মাস কুড়ি দিন হইল। এখন আপনার বিচ্ছেদ আমার কষ্টকর বোধ হইতেছে। আমি যথাসাধ্য গ্রন্থালোচনায় চিত্ত সমাহিত করিয়া সে কষ্ট ভুলিবার চেষ্টা করি। * * * যে প্রকারে পারেন, আপনি এখানে আসিবার চেষ্টা করিবেন। কারণ, আর অধিক দিন আপনার নিকট হইতে দূরে থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আপনার কাছে পয়সা কড়ির অভাব থাকিলে, আমি আমার অলঙ্কারগুলি পাঠাইয়া দিতে পারি। তাহা বিক্রয় করিলে ভাড়ার টাকার যোগাড় হইবে। যদি বলেন, আমিই এখানে সেগুলি বিক্রয় করিয়া আপনাকে টাকা পাঠাইয়া দিতে পারি।" দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আনন্দী বাঈর এইরূপ পত্র পাইবার পরেও গোপালরাও সামান্য কারণে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে "গর্ব্বিতা ও বিশ্বাসঘাতিনী" প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত করিয়াছিলেন!

গোপালরাও-ও আমেরিকা যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। আনন্দীবাঈর ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর তিনি নানা কারণে স্বদেশের ও স্বসমাজের প্রতি

নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া আমেরিকায় গিয়া স্থায়িরূপে বাস করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। আনন্দীবাঈ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে যে পত্র লিখিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

"ইদানীং আপনার ভাবান্তর দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন, "হিন্দুদিগের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে।" হিন্দুজাতির সম্বন্ধে আপনার এরূপ মতান্তর হইল কেন? ভাল মন্দ সকল দেশে ও সকল সমাজেই থাকে। * * * "হিন্দু" বলিয়া আমি বিশেষ গর্ব্বানুভব করি। * * * আমি স্বদেশপরিত্যাগের পক্ষাপাতিনী নহি। এখানে যদিও আমায় সকলেই স্নেহ করে, এমন কি, ধোপাও অল্প পয়সায় আমার কাপড় কাচিয়া দেয়, কোনও বিষয়ে আমার কষ্ট নাই, তথাপি আমার দ্বারা যদি কোনও দেশের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে তাহা ভারতবর্ষেরই হয়, ইহাই আমার একান্ত কামনা। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি বিষয়ে যাহাতে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা জন্মে, সে বিষয়ে স্বীয় সময় ও শক্তিব্যয় করা আমি স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। এ বিষয়ে কেহ আমার প্রতিকূলতাচরণ করিলেও আমি কর্ত্তব্যপথচ্যুত হইব না। * * * পৃথিবীর কোনও দেশকে আমি ঘৃণা করিনা। কিন্তু ভারতবর্ষের অভাবও যেমন অধিক, এবং সেখানকার রমণীকুলের রীতিনীতি ও স্বভাবাদির বিষয়ে আমার যেরূপ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেরই দাবি আমার উপর অধিক বলিয়া আমার মনে হয়। এবং আমার দ্বারায় সেখানকার মঙ্গলই অধিকতর সাধিত হইতে পারে। * * * আপনি যদি আমেরিকায় স্থায়িভাবে বাস করিবার সংকল্প না পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে বিপরীত ঘটিবে। আমি স্বদেশে ফিরিয়া যাইব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনি আমাকে ছাড়িয়া একাকী আমেরিকাবাসে কি সুখ পাইবেন জানি না। (অথবা আমি কি পাগল! আমার অভাবে আপনার সুখে কেন অন্তরায় ঘটিবে?) একবার আমেরিকায় আসিয়া যদি আর স্বদেশে ফিরিয়া না যাইবারই আপনার সংকল্প থাকে, তাহা হইলে আপনার আসিয়া কাজ নাই। আমি কোনওরূপে কষ্টে স্বষ্টে চারি বৎসর এখানে অতিবাহিত করিব। আমার ধৈর্য্যের আদৌ লাঘব হয় নাই। আমার জন্য আপনার কোন চিন্তারও কারণ নাই।

"আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এদেশে স্থায়িরূপে বসতি করিয়া আপনি স্বদেশবাসীকে কি শিক্ষা দিবেন? স্বার্থপরতাই নহে কি? আপনি ত স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করেন; আমিও তাহাই করি। * * * সাধারণের অনুকরণ যোগ্য আচরণ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ভারতবর্ষ, আমেরিকা নহে।"

আর একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "আচার ব্যবহারে হিন্দু থাকিয়া আমাদিগকে সংস্কার ও উন্নতি করিতে হইবে"—আপনার পত্রে এই বাক্যটি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। এই নীতি অতি উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয়। * * * আমাদের কলেজে একটী রমণী ঘোর নাস্তিক ছিল; অনেক মিশনারী বহু উপদেশেও তাহাকে আস্তিক করিতে পারেন নাই। সে জন্য অনেকে তাহাকে ভয় করিত, কিন্তু আমার সহিত তিন দিন ধর্ম্ম বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া সে এক্ষণে সম্পূর্ণ ঈশ্বর-বিশ্বাসিনী হইয়াছে। * * * হিন্দু রমণী অপেক্ষা এ দেশীয় রমণীগণের অধিক পরিমাণে স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমরা (হিন্দু রমণীরা) যতই অশিক্ষিত ও অসভ্য হই, ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতা ও নীতি বিষয়ে এদেশের রমণীগণের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠা। পৃথিবীর সকল রাজ্যের লোকেরই হিন্দু রমণীর এ গুণের অনুকরণ করা উচিত। * * * আমি খৃষ্টান হইব বলিয়া আপনার ভয় হইতেছে; কিন্তু আনন্দী বাঈ রমাবাঈ নহে, রমাবাঈও আনন্দী বাঈ নহে! বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করা অপেক্ষা আমি মৃত্যু শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করি। রমাবাঈ আমার অপেক্ষা বিংশতি গুণ পণ্ডিতা। কিন্তু

আমার প্রতিজ্ঞা যে, "ভাঙ্গিব, কিন্তু মচকাইব না।" আমি খৃষ্টান হইব, একথা লিখিয়া আর আমায় কষ্ট দিবেন না।"

আনন্দী বাঈর পত্র পাঠ করিয়া গোপালরাও আমেরিকায় ঘর বাড়ী করিয়া বসতি করিবার সংকল্প বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু সে সময়ে সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আর আমেরিকায় যাওয়া হইল না। অর্থাভাবই যে তাহার প্রধান কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য। আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহের জন্য আনন্দী বাঈ গোপালরাওকে ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে লিখিয়াছিলেন। আমেরিকার সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিলে তাহা কিরূপ লাভজনক হইতে পারে এবং সে বিষয়ে হিন্দু সমাজের পথপ্রদর্শক হইতে পারিলে দেশের কিরূপ মহদুপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে কয়েকটি পত্রে তিনি বহুল আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে গোপালরাও তাঁহার কতিপয় ব্যবসায়ী বন্ধুর পরামর্শপ্রার্থী হইলে তাঁহারা কেহই এ বিষয়ে মূলধনের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। তখন আনন্দী বাঈ লিখিলেন—"আমাকে অতঃপর মাসে ৫০৲ টাকার অধিক পাঠাইবার আবশ্যক নাই। মণি-অর্ডার করিবার ব্যয় সহ ৫০৲ টাকার বেশী আপনি আর আমার জন্য খরচ করিবেন না। তাহাতেই আমি কোনরূপে চালাইব। আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া ৫০৲ টাকার বেশী এক পাই আর পাঠাইবেন না। এরূপে যাহা বাঁচিবে, তাহা ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিবেন। তাহা হইলে কিছু দিনে আপনার আমেরিকায় আসিবার ব্যয় সংগৃহীত হইবে।"

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

আমার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী।

(২)

আমি কতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম, বলিতে পারি না; যখন জ্ঞান হইল, তখন চাহিয়া দেখি, আমি সমুদ্র-সৈকতে পড়িয়া আছি এবং আমার মাথার কাছে বসিয়া এক সুন্দরী তরুণ-বয়স্কা বালিকা আমার সেবা করিতেছে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে নৌকা কোথায়, মাঝিরা কোথায়, এইখানে আমি কেমন করিয়া আসিলাম, এ বালিকাই বা কে, এ কেন আমার সেবা করিতেছে, এ সব কথা যুগপৎ আমার চিত্তে আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমার শুশ্রূষাকারিণীকে বালিকা বলিব কি যুবতী বলিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। বালিকা নয়, যুবতীও নয়। শিশিরসিক্ত রবিকরোদ্ভাসিত আধ ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় যৌবন-সৌন্দর্য্য

তাহার মুখে চোখে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। আমি বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বালিকা কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জিত হইয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল। আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কে তুমি?" বালিকা করুণ কণ্ঠে বলিল—

"আপনি আমায় চিনিবেন না, আমার নাম ভবানী।" "আমি তোমায় চিনিব না সত্য, তুমি কি আমায় চেন?"

'না'

"তবে অপরিচিতের জন্য এত যত্ন ও সেবা কেন?" ভবানী সসঙ্কোচে উত্তর করিল—

"আমরা এই বনের ভিতর থাকি। আমি প্রায়ই সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে আসি। আজ বেড়াইতে আসিয়া দেখিলাম, আপনি অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, আপনার প্রাণ আছে, তবে অতিরিক্ত জল খাইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াছেন মাত্র। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপনাকে টানিয়া তটের উপর তুলিলাম। জলে ডুবার দুই, একটী ঔষধও জানিতাম। তাহা নিকটবর্ত্তী বন হইতে আনিয়া আপনার নাক ও কাণের ভিতর পূরিয়া দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার নাক মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল—তারপর আপনি চৈতন্য লাভ করিলেন।"

আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, আমার পৃষ্ঠদেশে পূর্ব্ববৎ পিস্তল বাধা আছে। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মাথা ঘুরিতে লাগিল—বসিয়া পড়িলাম। বালিকা বলিল—"আপনি এখনও দুর্ব্বল, দাঁড়াইতে পারিবেন না। একটু স্থির হউন, আপনাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইব।"

"তোমাদের "বাড়ী"! এখানে কি কোন গ্রাম আছে?" আমি অতি বিস্ময়ের সহিত তাহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল—"না, এখানে কোন গ্রাম নাই! আমরা একাকী এখানে থাকি।"

"তোমরা কে কে?"

"আমি আর আমার বাবা ও জন কয়েক চাকর।"

"কে তোমার বাবা?"

ভবানী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—

"আমার বাবার নাম মুলুক চাঁদ। আমরা জাতিতে সাঁপুড়িয়া। সাপ নাচাইয়া আমরা জীবিকা উপার্জ্জন করি। বছরের মধ্যে ছয় সাত মাস দেশে দেশে সাপ নাচাই। বাকি চা'র পাঁচ মাস সুন্দরবনে থাকিয়া সাপ ধরি। এখন আমাদের সাপ ধরিবার সময়, তাই সুন্দরবনে আসিয়াছি।"

আমি বুঝিলাম সম্মুখস্থ বিপুল অরণ্যরাজি সুন্দরবনেরই অংশ বিশেষ। মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, ইহাদের সাহায্যে অবশ্যই আমি কোন প্রকারে কর্ম্মস্থলে পঁহুছিতে পারিব। কিন্তু বালিকার সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলাম। সাপুড়িয়ার মেয়ে কি এত সুন্দর হয়! আমি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

বালিকা কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—"এবার বোধ হয় আপনি কতকটা স্থির হইয়াছেন, আমার সঙ্গে গৃহে চলুন।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ তখনও আমার শরীর কাঁপিতেছিল। আমাকে কাঁপিতে দেখিয়া বালিকা বলিল—"আপনি এখনও দুর্ব্বল, আমার হাত ধরুন, নতুবা পড়িয়া যাইবেন।" আমি আগ্রহ সহকারে বালিকার হস্ত অবলম্বন করিলাম। বলা বাহুল্য তাহার সুকোমল সুগঠিত দেহ-স্পর্শে আমার দেহের কম্পন বাড়িয়াছিল। তখন আমার পূর্ণ যৌবন, তাহাতে আমি অবিবাহিত। তাহার সুকোমল স্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চিত, মস্তক ঘূর্ণিত, ও দেহের শিরায় শিরায় খরতর বেগে রক্ত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। আর সামলাইতে পারিলাম না, আমি সেই স্থানে নিরবলম্ব ভাবে পড়িয়া গেলাম, কিন্তু সংজ্ঞা হারাইলাম না। আমার এই অবস্থা দেখিয়া বালিকা দ্রুতবেগে ছুটিয়া গেল। এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম, বালিকার মুখ আশঙ্কা ও উদ্বেগে 'ভিক্টোরিয়া গোলাপের' ন্যায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে, আমাকে তুলিয়া লইবার জন্য

সে তাহার পিতাকে ব্যস্ততার সহিত অনুরোধ করিতেছে এবং তাহার অঞ্চল দ্বারা আমার চোখে মুখে বাতাস করিতেছে; কিন্তু তাহার অঞ্চলপ্রবাহিত বায়ুতে আমার স্থৈর্য্য যে অধিকতর হ্রাস হইতেছিল, এ কথা জানিলে বোধ হয় সে তাহা হইতে বিরত হইত।

মুলুকচাঁদ দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুল মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে স্কন্ধে লইয়া অবিলম্বে তাহার কুটিরে পহুঁছিল। ঘন অরণ্যানীর মধ্যে কুটির খানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। যেন অনন্ত জলরাশির মধ্যে একটী সুন্দর উৎপল। তাহারই একপাশে একটী খাটিয়ার উপর আমাকে শুয়াইয়া দিল। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

সমস্ত দিন, সমস্ত রাত নিঝুম হইয়া ঘুমাইলাম। কিন্তু গভীর নিদ্রা হইল না। কেবলই স্বপ্ন দেখিলাম। কত প্রকারের যে স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একবার দেখিলাম, আমি স্বর্গে গিয়াছি। দেবতারা আমার কাছে বসিয়া বীণা বাজাইয়া গান করিতেছেন। পারিজাত পুষ্পের সুমধুর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে; এবং অপ্সরাদের সুমধুর নূপুর নিক্কণে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কখনও বা দেখিলাম, আমি সমুদ্রজলে ভাসিয়া যাইতেছি। চারিদিকে কত লোক, কত নৌকা, কত জাহাজ সীমা নাই। রক্ষা করিবার জন্য সকলের কাছে কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি—কিন্তু কেহই অগ্রসর হইতেছে না। আমার কাতরতা দেখিয়া সাপুড়িয়া বালিকা যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিল, এবং আমাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কত যত্নে তাহার শূন্যগামী রথে তুলিয়া লইয়া গেল। কখনও বা দেখিলাম, সাপুড়িয়া বালিকার হস্তস্পর্শে সুন্দরবনের সমস্ত অরণ্য গোলাপ গাছে পরিণত হইয়াছে। এবং লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুটিয়া চারিদিক মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। সাপুড়িয়া বালিকা যেন একটী বৃহদাকার গোলাপের উপর দাঁড়াইয়া বীণা বাজাইতেছে এবং অনিমেষ লোচনে আমি তাহা নিরীক্ষণ করিতেছি। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত, আমি এই প্রকার স্বপ্ন দেখিলাম। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখি, অনেক বেলা হইয়াছে, সূর্য্যকিরণ ঘরের ভিতরে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে,

বন্য জন্তুর চীৎকারে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রাভাতিক মৃদু মন্দ সমীরণভরে বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কাহাকেও কাছে দেখিলাম না। সেই সাপুড়িয়া বালিকাই বা কোথায়? তাহার পিতাই বা কোথায়? কাহারও কথা বার্ত্তা শুনা যায় না। আমি বিস্মিত হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, আমার বিছানার পার্শ্বে একটা ঢাকা দেওয়া ধামা রহিয়াছে, ইহাতে কোন প্রকার খাদ্য থাকিলেও থাকিতে পারে, মনে করিয়া পরম আগ্রহে তাহা উদ্ঘাটন করিলাম। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! খুলিয়া দেখি, তাহাতে চা'র পাঁচটি ভীষণ সর্প ফণা ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া তাহারা ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া ধামা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এবং দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শরীর দুর্ব্বল, উঠিবার শক্তি নাই, কাছে কোন অস্ত্র শস্ত্র নাই যে, আত্মরক্ষা করিতে পারি। উপস্থিত বিপদ দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, সমুদ্র হইতে বাঁচিয়া এখন সাপের হাতে মরিব! আমার কপালে কি বিধাতা-পুরুষ অপমৃত্যুই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন! আমি ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"তোমরা কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সাপুড়িয়া বালিকা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল এবং অবিলম্বে সাপগুলিকে সুকৌশলে ধামার ভিতর পুরিয়া বলিল—"ভয় কি? ভয় কি? এই দেখুন, সাপগুলিকে আমি ধামার ভিতর পুরিয়া রাখিয়া দিয়াছি। বাবা চাকরদের নিয়া সাপ ধরিতে গিয়াছেন, আমি কাজ করিতে ছিলাম। আপনার বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খাবেন?" আমি কাতর কণ্ঠে বলিলাম—"তুমি মানবী না দেবী আমি জানি না, ক্রমাগত দুইবার তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ, তোমাদের ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না।" ভবানী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—"আপনার বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে, আমি খাবার নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া বালিকা কতকগুলি সুমিষ্ট ফল মূল লইয়া আসিল। আমি পরিতোষ পূর্ব্বক গ্রাস করিলাম। জল চাহিলে ভবানী বলিল—ঐ পাতকুয়ায় জল আছে, তুলিয়া পান করুন, আমাদের ছোঁয়া জল ত খাবেন না!"

আমি বলিলাম—"তুমি আমার প্রাণ-দায়িনী, তোমার কাছে আবার জাতির বিচার কি? তুমি জল দেও, আমি পান করিব।" আমার এই উক্তিতে ভবানী যেন বড়ই প্রসন্ন হইল। সে প্রসন্ন চিত্তে পরিষ্কৃত ঘটিতে জল আনিয়া দিল, আমি পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

ক্রমশঃ—

কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
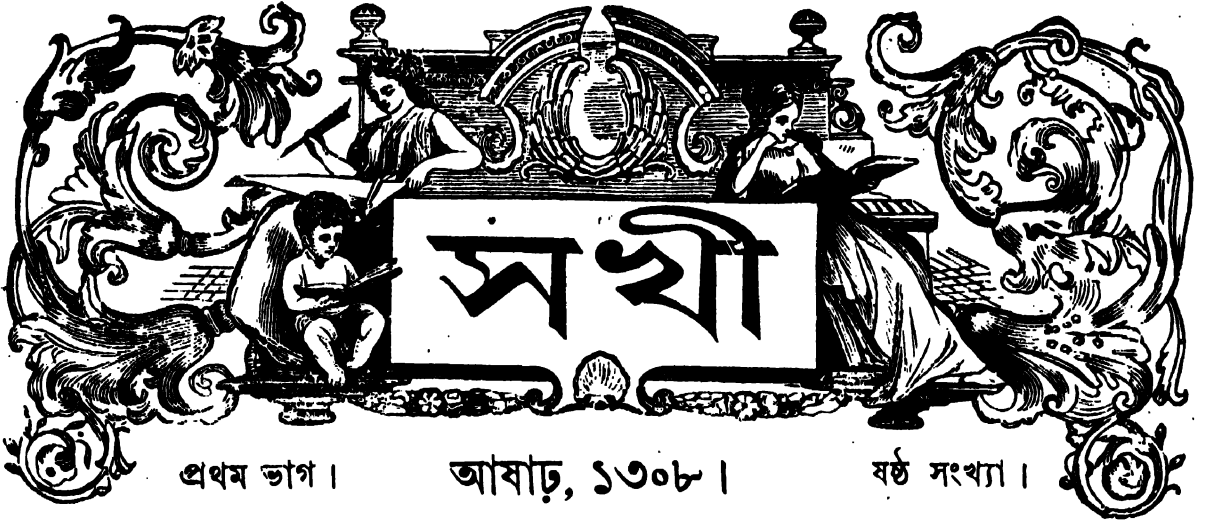
প্রথম ভাগ। আষাঢ়, ১৩০৮। ষষ্ঠ সংখ্যা।

শেষ দেখা।

১

সেই গেলে তুমি চলে,
আর না ফিরিলে, হায় ;
সেই হ'ল শেষ দেখা,
তব সনে এ ধরায়।

২

সরিল না মন মম
তোমায় ছাড়িয়া দিতে ;
"তোমারে হারা'ব বুঝি"
এই হল মম চিতে।

৩

কতবার আসিয়াছ,
কতবার গেছ চ'লে ;
তব অমঙ্গল-কথা,
ভাবি নাই কভু ভুলে।

৪

কিন্তু এই শেষবার,
কিবা যে গো হ'ল মনে,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ
তোমার গমন শুনে।

৫

মনে হ'ল, বলি তোমা
"যেও নাকো, প্রাণনাথ ;
যাবে যদি ল'য়ে চল,
অভাগীরে তব সাথ।"

৬

বলি বলি ক'রে তাহা,
হ'ল নাকো আর বলা—
কে যেন ভিতর হ'তে
চাপিয়া ধরিল গলা।

৭

গুমরি' গুমরি', হায়,
কাঁদিল যে কত প্রাণ।
মনে হ'ল আজ বুঝি,
সুখ-দিবা অবসান।

৮

যাবার-সময় হ'লে,
এলে তুমি মম পাশে ;
বলিলে "চলিনু, প্রিয়ে,
কিছুকাল পরবাসে।

৯

"এই মম অনুরোধ,
ভেবো নাকো মোর তরে।

বছরের শেষ হ'লে
আবার আসিব ঘরে।

১০

"বহু দুঃখে থাকি, প্রিয়ে,
সেই দূর পরবাসে;
সদাই তৃষিত প্রাণ,
তোমার মিলন আশে।

১১

"কিন্তু কি করিব, বল,
হতভাগা পরাধীন—
জগতে কোথায় সুখী,
আমা সম দীন হীন?

১২

"সুখচিন্তা আপনার
স্বপনেও করি নাই,
কেমনে তোমারে সুখী
করিব গো, ভাবি তাই।

১৩

"সোণার কমল তুমি,
পড়েছ পাষাণ-বুকে,
যাও পাছে শুকাইয়া
এই কথা ভাবি দুখে।"

১৪

শুনিতে শুনিতে কথা,
ঝরিল চোখের জল;
কত কি যে হ'ল মনে,
ব'লে আর কিবা ফল?

১৫

মনে হ'ল বলি তোমা
"ছি ছি ছি, এমন কথা,
অভাগীরে ব'ল নাকো;
দিও না মনেতে ব্যথা।

১৬

"অভাগীর সুখ তরে
সহ তুমি এত দুখ?
শুনিলে, লাজেতে মরি;
ভাবিলে, বিদরে বুক।

১৭

"জান না পুরুষ, তুমি,
নারীর মরম-কথা;
বুঝিতে পার না, হায়,
নারীর হৃদয়-ব্যথা।

১৮

"তোমারে কি চোখে দেখি,
কেমনে বুঝাব আমি?
বুঝানো না যায় কথা—
'নারীর দেবতা স্বামী।'

১৯

"তব তরে ধরি প্রাণ,
তব সুখে হই সুখী।
তোমার বিরহে, নাথ,
জগৎ আঁধার দেখি।

২০

"অভাগীর সুখতরে,
যেও নাকো বনবাসে।
অনশন—সেও ভাল,
যদি থাক মোর পাশে।

২১

"ভুলেও করি না, নাথ,
বসন-ভূষণ আশ।
সুখী, তোমা রাখি যদি
চোখে চোখে বারমাস।"

২২

ভাবিতে ভাবিতে কথা
আকুল হইল মন,
অঝুরে ঝুরিল আঁখি,
প্রাণ হ'ল উচাটন।

২৩

বিহ্বল হেরিয়া মোরে,
মম করে কর দিয়ে,

বলিলে "ভেবো না, যাই,
সময় হ'য়েছে, প্রিয়ে।"

২৪

"সময় হ'য়েছে"! হায়,
কি কাল বচন ব'লে,
অভাগীরে রেখে হেথা,
চিরতরে গেলে চ'লে।

২৫

শুনি সে বিদায়বাণী,
চমকি' উঠিল প্রাণ,
কাঁপিয়া উঠিল দেহ,
লুপ্তপ্রায় হ'ল জ্ঞান।

২৬

টিক্‌টিকি গৃহ-কোণে
সহসা উঠিল ডাকি'।
অবশ হইল তনু,
নাচিয়া উঠিল আঁখি।

২৭

আঁখিতে ভরিল জল,
কণ্ঠ গেল শুকাইয়া—
দেখিনু তোমারে যেন
ঘিরিয়াছে কাল-ছায়া!

২৮

বসিয়া পড়িনু আমি,
সহসা গো ভূমিতলে;
বুক মোর গেল ভেসে
অনিবার অশ্রুজলে।

২৯

তব বিদায়ের বাণী
শুনিয়াছি কতবার,
কিন্তু হেন দশা মোর
হয় নাই কভু আর।

৩০

আশ্বাসি' আমারে তুমি
সহসা চলিয়া গেলে।
মনের আবেগে, পদে
প্রণমিতে গেনু ভুলে!

৩১

তাড়াতাড়ি উঠে যাই
গৃহ হ'তে বাহিরিনু,
সহসা উঁচুট্ খেয়ে
ভূমিতলে প'ড়ে গেনু।

৩২

হাতের ভূষণ মোর,
হ'য়ে গেল চুরমার—
কপালে লাগিল চোট্
বহিল রুধির-ধার।

৩৩

ভয়েতে বিহ্বল হ'য়ে,
চাহিনু পথের পানে।
কিন্তু তব ছবি আর
হেরিনু না কোন খানে।

৩৪

সেই গেলে তুমি চ'লে,
আর না হেরিনু, হায়,
সেই হ'ল শেষ দেখা
তব সনে এ ধরায়।

৩৫

শুভ সমাচার তব,
পাইবার আশা ক'রে;
ব'সেছিনু দিনরাত
পরমেশ নাম স্ম'রে।

৩৬

কিন্তু সে আশার মুখে
সহসা পড়িল ছাই।
দারুণ সংবাদ এল
"এ জগতে তুমি নাই!"

৩৭

এ জগতে তুমি নাই!
হয় না বিশ্বাস মম—

যেথানে গিয়াছ তুমি,
যাব তথা ছায়া সম।

৩৮

পীড়িত শয্যায় শু'য়ে,
অভাগীর নাম ধ'রে ;
চেয়েছিলে তুমি জল
হৃদয়বিদারী স্বরে।

৩৯

ছি ছি, ছি ছি, এ জীবনে—"
আর না সরিল কথা—
মূরছি পড়িল বালা,
ছিন্নমূল যেন লতা।

৪০

সহসা আঁধার ঘোর
ঢাকিল সে দেহখানি—
কি হ'ল আঁধার মাঝে
দেখিল না কোন প্রাণী।

৪১

বিকালে পাড়ার লোক
দেখিল আসিয়া ঘরে—
সোণার প্রতিমা মরি,
ঘুমায়েছে চিরতরে।

৪২

নিদারুণ লিপিখানি
প'ড়ে আছে তার পাশে—
প্রসারিত দুই বাহু,
যেন গো মিলন-আশে।

৪৩

হেরি তার মুখে হাসি,
বলে সবে অশ্রু ফেলে,
"ধন্য পতিব্রতা তুমি,
থাক নাথ সহ মিলে।"

* * *

৪৪

উভয়ের চিতাভস্ম
মিলাইয়া, তদুপরে,
গঠিল মন্দির এক
সকলে যতন ক'রে।

৪৫

"সতীর দেউল" নামে
খ্যাত হ'ল সে মন্দির।
এখনো মহিমা কেহ
ভুলে নাই সে সতীর।

৪৬

যে দিনে সে সতী নারী
গিয়াছিলা স্বর্গধামে।
এখনো সে দিনে সবে
পূজা দেয় তাঁর নামে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

দেবকন্যা।

সুখ ভাল, কি দুঃখ ভাল ? প্রত্যেকে যদি নিজ জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, দুঃখই ভাল। আমরা সকলেই অনন্তের পথে চলিতেছি, জীবন-নদী বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রবাহিত হইয়া অনন্তেরই দিকে ছুটিতেছে। এই অতি দুর্গম পথে যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারি, অতীব অসহনীয় হইলেও, তাহাই প্রকৃত মঙ্গল। দুঃখের ন্যায় শিক্ষক কে ? মানবের বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিয়া, তাহাকে সত্যের সেবায় ও জগতের দুঃখহরণে নিয়োগ করিতে এমন আর কি আছে ? যাঁহার সরল, সুশীল, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, নিঃস্বার্থ, ও পরহিতব্রতাচারী হইতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তিনি অসঙ্কোচে ও প্রসন্নমনে দুঃখের সুপবিত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করুন, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন।

অতি পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড দেশে এড্‌মণ্ড্ নামে এক রাজা ছিলেন। ক্যানিউট্ নামে একজন ডেন্‌মার্ক দেশীয়

বীরপুরুষ আসিয়া, এড্‌মণ্ডকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া, তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। এড্‌মণ্ডের দুই পুত্র, অনন্যগতি হইয়া, জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, হাঙ্গেরীর রাজা ষ্টিভেনের প্রাসাদভবনে আশ্রয় লইলেন। ষ্টিভেন্ অতি সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নির্ব্বাসিত রাজপুত্রদ্বয়কে সাদরে গ্রহণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র অল্পবয়সেই পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ, এডওয়ার্ড, রাণীর কোন আত্মীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ক্রমে তাহার এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মিল। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠার নাম মার্‌গারেট্।

এই সময়ে ইংলণ্ডে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। ডেন্‌স্‌গণ ইংলণ্ড হইতে তাড়িত হইল। সেই সুযোগে এড্‌মণ্ডের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এড্‌ওয়ার্ড অনায়াসে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিলেন।

মার্‌গারেট্, দুঃখে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়া, পিতার সঙ্গে হাঙ্গেরীতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। দুঃখ, ক্লেশ ধীরে ধীরে তাঁহার চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সাধুসঙ্গ-লাভও হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং অতি সাধুচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সভাসদ্‌গণও তাঁহাকে দেখিয়া দুঃখীর প্রতি দয়া, পীড়িতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা অতি ধর্ম্মশীল ছিলেন, ঈশ্বরের উপাসনা তাঁহার জীবনের সম্বল ছিল। তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার রাজ্যে যাহাতে ধর্ম্মজ্ঞান সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহা করাই তাঁহার জীবনের কার্য্য। ঈদৃশ ব্যক্তির জীবনের প্রভাব কি চারিদিকে বিস্তৃত না হইয়া পারে? মাগারেট্ এইস্থানে ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও মহজ্জীবনের উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

ইংলণ্ডের রাজা এড্‌ওয়ার্ড এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার জীবনপ্রদীপ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। তাঁহার পুত্র কন্যা নাই, কাহাকে রাজ্য দিবেন, এই চিন্তা মনে প্রবল হইয়াছে। তখন ভ্রাতুষ্পুত্র এডওয়ার্ডের কথা তাঁহার মনে পড়িল, তিনি অবিলম্বে পুত্রকন্যাসহ তাঁহাকে ইংলণ্ডে আনয়ন করিলেন। কিন্তু স্বদেশে আসিয়া অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল, সুতরাং তাঁহার পুত্র এড্‌গারই যুবরাজ হইলেন। অল্পকাল পরে রাজা এডমণ্ডও পরলোক গমন করিলেন। সে সময়ের প্রচলিত বিধি অনুসারে এড্‌গারেরই রাজা হইবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। সুপ্রসিদ্ধ হেষ্টিংসের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হেরাল্ডকে নিহত করিয়া উইলিয়াম্ দেশ অধিকার করিলেন। দুঃখের ঘনমেঘ আসিয়া মারগারেট্ ও তাঁহার আত্মীয়গণের জীবন-আকাশকে পুনরায় আচ্ছন্ন করিল। সকলে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আবার হাঙ্গেরীর অভিমুখে চলিলেন। বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। পথিমধ্যে বাত্যাঘাতে জাহাজ স্কট্‌লণ্ডের তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা মাল্‌কম্ তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে আনয়ন করিলেন। মার্‌গারেট্ রাজার দয়া দাক্ষিণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই হৃদয় মন অর্পণ করিলেন।

এই সময় হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ডের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল, অসভ্য-দেশ দিন দিন সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিতে লাগিল। রাণীর সৌজন্য ও সাধুতা দেখিয়া স্কট্‌গণ সভ্যতার মূল্য বুঝিতে লাগিল। রাণী স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রজাবৃন্দকে উন্নত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন, ঈশ্বরকে সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যের সহায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই জন্য স্বয়ং পবিত্র হইয়া জনগণকে পবিত্র ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মোন্নতির জন্য তিনি ধর্ম্মাচার্য্যগণের শরণাপন্ন হইলেন। টারগট্ নামে একজন ভক্তিমান্ ব্যক্তি তাঁহার উপদেষ্টা হইলেন। ইঁহারই উপদেশ অনুসারে তিনি ধর্ম্মসাধনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য-সাধন ও প্রাণপণে জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের নাম তাঁহার নিকট এত মিষ্ট ছিল যে, রাত্রিতে নিদ্রায় বৃথা সময় যাইত বলিয়া তিনি অতিশয় আক্ষেপ করিতেন। তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অনেক পুস্তক আনাইয়া দিতেন। স্ত্রীর ধর্ম্মভাব দেখিয়া মাল্‌কম্ দিন দিন দয়ালু, কোমল-

স্বভাব ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পত্নীর প্রতি তাঁহার এত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মিল যে, তাঁহার চক্ষে সমস্ত জিনিষ প্রিয় হইয়া গেল। তাঁহার পঠিত পুস্তক দেখিতে পাইলেই তিনি প্রেমভরে ও শ্রদ্ধাসহকারে তাহা চুম্বন করিতেন। তিনি রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া পত্নীর সর্ব্বপ্রকার শুভানুষ্ঠানে ও দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর সাহায্য তাঁহার নিকট স্বর্গতুল্য মনে হইত।

বৈরাগ্যের সঙ্গে অনেক সময়ে কঠোরতা মিশ্রিত থাকে। মারগারেটের চরিত্রে কিন্তু এই অবৈধ কঠোরতার সংযোগ দৃষ্ট হইত না। তিনি একদিকে যেমন আত্মনিগ্রহ করিতেন, অপরদিকে তেমন বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে সরস রাখিতেন। তিনি প্রতিদিন দুঃখী গরীবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে পরিবেশনপূর্ব্বক আহার করাইতেন, তাহাদের পা ধুইয়া দিতেন, ও আহারান্তে যথেষ্ট অর্থদানে তাহাদিগকে বিদায় করিতেন। অনাথা বিধবা ও নিঃসহায় বালকবালিকাদিগের প্রতিই তাঁহার বিশেষ দয়া ছিল। গরীবদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা, নিজে তাহাদিগের শুশ্রূষা করা, তাঁহার পক্ষে অতীব আনন্দের ব্যাপার ছিল। ইষ্টদেবতার প্রীত্যর্থে তিনি এই সকল শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। রাজকোষ হইতে তিনি যে অর্থ পাইতেন, তাহাতে তাঁহার এই সকল দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না; সুতরাং স্বীয় অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে অর্থের অভাবমোচন করিতে হইত। রাজাও তাঁহকে সময়ে সময়ে অর্থ দিতেন। এইরূপে সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় হওয়াতে, কখনও কখনও রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া যাইত।

সেই অসভ্যতার সময়ে প্রজাগণ সর্ব্বদা ন্যায্য বিচার প্রাপ্ত হইত না; রাণী ইহার সংশোধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কোন এক প্রকাশ্য স্থানে উপবেশন করিয়া স্বয়ং প্রজাগণের অভিযোগ শ্রবণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি রাজাকে ঐ সকল অভিযোগের বিষয় জানাইতেন। এইরূপে তাঁহার প্রযত্নে রাজ্যমধ্যে ক্রমে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি আর এক প্রকারে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিতেন। তখন স্কট্ল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে সময়ে সময়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইত। অনেক ইংরাজ যুদ্ধে বন্দী হইয়া স্কট্লণ্ডে আসিত ও তাহারা ক্রীতদাসের ন্যায় বাস করিত। এই ক্রীত দাসদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য রাণী লোক নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। যদি তাহারা আসিয়া বলিত যে, বন্দীদিগের উপর বিষম অত্যাচার হইতেছে, তাহা হইলে তিনি অর্থ দিয়া বা তাহাদিগকে ক্রয় পূর্ব্বক মুক্তিদান করিতেন।

মারগারেট্ ধর্ম্মার্থে অকাতরে অর্থ দান করিতেন। সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন। উদ্দেশ্য—যে দরিদ্র প্রজাগণ, নিরন্তর সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিত, তাহারা আসিয়া, অল্পকালের জন্যও একটা ভাল জায়গায় বসিয়া, কিঞ্চিৎ আরাম পাইবে, এবং দেখিতে পাইবে যে, জগতে অন্ততঃ এমন একটি স্থানও আছে, যেখানে ধনী ও দরিদ্রের ভেদ নাই। বলা বাহুল্য, শতশত লোক এই সকল মন্দিরে আসিত ও রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইত।

স্বামীর উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল বলিয়াই তিনি এত সাধুকার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার স্বামীর জীবন উন্নত করিলেন। রাজা, স্ত্রীর সাহায্যে ক্রমেক্রমে ন্যায়পরতা, পবিত্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণে বিভূষিত হইলেন। মারগারেট্ স্বামীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে রাজা কখনও ক্ষুণ্ণ হইতেন না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইত।

তিনি স্বামীকে সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া চিত্তকে নির্ম্মল রাখিতে শিক্ষা দিলেন। তাহার পর জীবে দয়া ও প্রার্থনার মাহাত্ম্য তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। রাণী রাত্রে উঠিয়া ঈশ্বরের নাম করিতেন, এবং স্বামীকে তাঁহার সহিত যোগ দিতে অনুরোধ করিতেন।

তিনি সভাসদ্‌গণেরও জীবন উন্নত করিলেন। উচ্চ বংশীয়া ও সচ্চরিত্রা রমণী ভিন্ন তিনি কাহাকেও সহচরী

করিতেন না। তাঁহার সম্মুখে কোন প্রকার অভদ্র ব্যবহার করিবার কোন ব্যক্তির সাধ্য ছিল না। তাঁহার ব্যবহার অতি কোমল ও মধুর ছিল, সুতরাং সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে পারিত; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল যে, কেহই তাঁহার সহিত অতিশয় ঘনিষ্টতা করিতে সাহসী হইত না। ক্রমে তাঁহার চরিত্রগুণে রাজ-সভার সকলেই ভদ্র, সভ্য ও বিশুদ্ধস্বভাব হইয়া উঠিল।

মারগারেট্ স্কচ্দিগকে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়েও উৎ-সাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাহায্যে তাহারা অন্যান্য দেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আনয়ন করিতে লাগিল ও স্বদেশীয় দ্রব্যাদি অন্য দেশে পাঠাইতে লাগিল। এত-দ্বারা দেশ ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

মারগারেট্ তাঁহার বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যের মধ্যে আপনার পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষার কথা ভুলিয়া যান নাই। তাহাদের শিক্ষাতেই তাঁহার অধিক সময় অতিবাহিত হইত। কিরূপে তাহাদিগকে সচ্চরিত্র, সুশীল, ও ঈশ্বরপরায়ণ করিবেন, তজ্জন্য তিনি সদাই চিন্তা করিতেন, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য তিনি নিয়ত সজলনেত্রে ঈশ্বরের কৃপাভিক্ষা করিতেন। তাহাদের শিক্ষার জন্য তিনি কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলে সকলকেই বিনা আপত্তিতে সর্ব্ববিষয়ে পিতামাতার উপদেশ অনুসারে চলিতে হইত, এবং কনিষ্ঠদিগকে জ্যেষ্ঠদিগের অনুবর্ত্তী হইতে হইত। তাঁহার শিক্ষা যে আশানু-রূপ সুফলপ্রসব করিয়াছিল, তাহা তাঁহার সন্তানগণের ভবিষ্যজ্জীবন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এড্ওয়ার্ড যুবা বয়সে যুদ্ধে নিহত হন; কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রেরও অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া এমন ভাবে জীবন যাপন করিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সন্ন্যাসিগণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নাম উচ্চারণ করিত। তাঁহার তৃতীয় পুত্রও অতিশয় ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র ছিলেন। চতুর্থ পুত্র পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। তিনি অতি ধীর ও শান্তভাবে, ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিয়া ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের দ্বারা বংশকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারদর্শনে সকলেরই তাঁহার দেবপ্রকৃতিসম্পন্না জননীর কথা স্মরণ হইত। তাঁহার পঞ্চম পুত্রও অতিশয় ন্যায়বান্, দয়াশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র ডেবিড্ মাতার পথ অনুসরণ করিয়া স্বদেশকে সভ্যতার সোপানে উন্নত করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাদ্বয়ও অতিশয় দয়াশীলা, শুদ্ধচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

মারগারেট শেষ জীবনে দেশের ধর্ম্ম-সংস্কারে মনো-নিবেশ করিলেন। সমাজসংস্কারেও তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তখন স্কটলণ্ডে বিমাতার সহিত ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত বিবাহ প্রচলিত ছিল। রাণী আইন করিয়া সে কুপ্রথা রহিত করিয়া দিলেন। এইরূপে নর-সেবায়, স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে নিরন্তর পরিশ্রম করিতে করিতে রাণীর জীবন শেষ হইয়া আসিল। তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের সহিত আবার যুদ্ধ বাধিল। তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র সেই যুদ্ধে গমন করিলেন। মৃত্যুর চারিদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে অতিশয় বিষণ্ণ দেখা গেল। তিনি অনুচরদিগকে বলিলেন, আমার ভাগ্যে যেন কি মহাবিপদ্ ঘটিবে বলিয়া মনে হইতেছে।" ইহার দুই দিন পরেই সংবাদ আসিল যে রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। চতুর্থ দিনে তিনি কথঞ্চিৎ অসুস্থ হইলেন। তিনি একবার উপাসনা করিলেন। তাহার পর তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হইল, সুতরাং তাঁহাকে শয্যা অবলম্বন করিতে হইল। সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত। এমন সময়ে এড্গার্ সমরক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মাতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া গেল। রাণী কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এড্গার্, তোমার পিতা কোথায়?" এড্গার্ মাতাকে মৃত্যুশয্যায় সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ দিতে সঙ্কুচিত হইলেন। রাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এড্গার্,

আমি সব জানিতে পারিয়াছি, সত্য সংবাদ বল।” রাজপুত্র তখন কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিলেন। রাণী তখন ঊর্দ্ধ দিকে চক্ষু ও হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “হে সর্ব্বশক্তিমন্, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যে তুমি আমাকে এত বড় দুঃখ দিলে তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ; তুমি যাহা কর, তাহাই ভাল। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।”

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণপক্ষী নশ্বর দেহ-পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া শান্তিধামে উড়িয়া গেল! দেবকন্যা মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিলেন! স্কট্‌লণ্ড জ্যোতির্হীন হইল! কিন্তু সেই জ্যোতির কয়েকটি রশ্মি জাতীয় চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া ইহলোকেই পড়িয়া রহিল!

আমার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী।

(৩)

ভবানীর সদ্ব্যবহারে ও রূপে আমি ক্রমে ক্রমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। কেবলই তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। তাহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনিতে ইচ্ছা হয়—দিন রাত তাহারই কাছে থাকিতে ভাল লাগে। সে যে অস্পৃশ্যা সাপুড়িয়া জাতিয়া—আমি তাহা ভুলিয়া গেলাম। প্রেমের কাছে জাতি কুল মান কিছুই থাকে না। ভবানীর প্রেমে পড়িয়া আমি আমার বংশ-মর্য্যাদা, শিক্ষা, জ্ঞান ও সভ্যতার কথা ভুলিয়া গেলাম। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দিন রাত্রি তাহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম।

এইরূপে এক পক্ষ কাল অতীত হইয়া গেল। কর্ম্মস্থল ব্রহ্ম দেশে যাইবার কথাটিও ভুলিয়া গেলাম। ভবানীর সহিত বেড়াইয়া সাপের খেলা দেখিয়া—সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেলাভূমিতে বসিয়া—সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করিয়া—ভবানীর পিতার সহিত শিকারে যাইয়া—সাপ ধরিয়া—আমার প্রাত্যহিক জীবন কাটাইয়া দিতে লাগিলাম।

একদিন ভবানীর পিতা মুলুকচাঁদের সহিত শিকার করিয়া আমি কুটিরে ফিরিতেছি। আজ তিন চারিটা হরিণ মারিয়াছি—মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছে। হরিণগুলি দেখিয়া যে ভবানী বড়ই আনন্দিত হইবে—একথা স্মরণ করিয়া আমার প্রাণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিতেছে। কুটীরের কাছাকাছি আসিয়াছি—এমন সময় মুলুকচাঁদ বলিল—“একটা কথা আছে—খানিক অপেক্ষা কর।” আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম—“কি কথা মুলুকচাঁদ?”

মুলুকচাঁদ বলিল—“তোমায় গুটিকয়েক কথা বলিবার আছে। চল ঐ গাছতলায় বসি।”

আমরা হরিণগুলি একপার্শ্বে রাখিয়া একটা গাছের তলায় বসিলাম। মুলুকচাঁদ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“বাবু, তুমি কি আমার মেয়েকে ভাল বাস?”

“আজ এ প্রশ্ন কেন মুলুকচাঁদ? আমি যে তাহাকে ভালবাসি, তাহার সন্দেহ আছে কি?”

“না, সন্দেহ নাই। নাই বলিয়াই আজ তোমাকে একটি কথা বলিব। যদি তাহাকে ভাল বাস, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে?”

আমি বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া বলিলাম—“বিবাহ!”

“কেন, বিবাহ কি করিতে পার না?”

“তুমি জান আমি কায়স্থ—”

“জানি। তুমিও ত তাহা জানিতে। তবে জানিয়া শুনিয়া তাহাকে ভাল বাসিলে কেন? তাহার হস্তে অন্ন জল গ্রহণ করিলে কেন? তাহাকে এই প্রকারে লুব্ধ ও মুগ্ধ করিলে কেন? যদি তোমার মনে এই প্রকার দ্বিধা ছিল—তবে আগেই সরিয়া গেলে না কেন?”

কি আর বলিব? মুলুকচাঁদ সত্য কথাই বলিতেছে। যদি তাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ নাই করিব, তবে তাহাকে এত ভাল বাসিলাম কেন? সরল বনবালা বনে বনে সরল মনে ঘুড়িয়া বেড়াইত—আমি তাহাকে প্রেমের ফাঁদে নিপাতিত করিলাম কেন? দোষত আমারই—সে যে সাপুড়িয়া, তাহা ত সে প্রথমেই বলিয়াছিল। জানিয়া শুনিয়া কেন আমি তাহার সম্মুখে এ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলাম?

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ মুলুকচাঁদ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—“শুন বাছা! তাহাকে বিবাহ করিতে

যদি তোমার কণিকা পরিমাণেও সংশয় থাকে—তবে এই মুহূর্ত্ত হইতে আমার কুটীরে আর প্রবেশ করিও না। তুমি তাহার সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়াছ, যদি এখন তুমি বিবাহ না কর, তাহাকে আমি কিছুতেই বাঁচাইতে পারিব না। আর একটী কথা তোমাকে দৃঢ়তার সহিত বলি—জাতিতে নিকৃষ্ট হইলেও আমরা দুর্নীতিকে কখনও প্রশ্রয় দেই না। অবৈধ ভাবে যদি তুমি ভবানীকে ভাল বাসিয়া থাক—তবে তোমার সে ভালবাসায় আমি পদাঘাত করি। মুলুকচাঁদের কন্যার কখনও এমন অধঃপতন হইতে পারে না। তুমি ভাল মানুষের ছেলে, বিপদে পড়িয়াছিলে—আমাদের যাহা সাধ্য তাহা করিয়াছি। এখন তুমি মানে মানে আপনার পথ দেখ। এ দীনের কুটীরে আর পদক্ষেপ করিও না।"

আমি একাগ্র মনে মুলুকচাঁদের কথাগুলি শুনিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, তাহার প্রতি অক্ষরই সত্য। ইহার উপর কিছু বলিবার নাই। তার পর আমি বলিলাম—"মুলুকচাঁদ, তোমার প্রতি কথাই সত্য। আমি ভবানীকে বিবাহ করিব।'

মুলুকচাঁদ আমার কথা শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইল। এবং আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে তখনই গৃহে আসিয়া এ শুভ সংবাদ ভবানী ও তাহার অন্যান্য ভৃত্যবর্গকে জানাইল।

* * * *

বলা বাহুল্য, কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। সাপুড়িয়াদের বোধ হয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই, মুলুকচাঁদই কন্যা সম্প্রদান করিল। মেঘের ঘর্ঘর ধ্বনি ও বিহঙ্গমের কলকণ্ঠ, আমাদের বিবাহকালে গীতবাদ্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। বাসর ঘর সম্মিলিত নারীকণ্ঠের হাস্যকোলাহলে প্রতিধ্বনিত না হইলেও কোকিলের কুহু-রবে আমরা বঞ্চিত হই নাই।

এখন আমি সাপুড়িয়া। সাপ ধরি, শিকার করি, আর ভবানীর হাত ধরিয়া বনে বনে মুক্ত কুরঙ্গ-কুরঙ্গিণীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াই। ভবানীর ভালবাসায় আমি সকল দুঃখ ভুলিলাম। সে আমাকে মায়ের ন্যায় স্নেহ করিত, বন্ধুর ন্যায় ভাল বাসিত, মন্ত্রীর ন্যায় পরামর্শ দিত—শোকে দুঃখে প্রেমধারা বর্ষণ করিয়া আমার শুষ্ক হৃদয়কে রসসিক্ত করিত। * *

একদিন আমি, ভবানী ও মুলুকচাঁদ বনের ভিতর সাপ ধরিতে গিয়াছি। সে দিন কাহার মুখ দেখিয়া গিয়াছিলাম—বলিতে পারি না। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক গুলি সাপ ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার অধিকাংশ কেউটে ও বোয়া। মুলুকচাঁদ বলিল, "তোমরা ঘরে চলিয়া যাও, আমি পাশের বন হইতে ভৃত্যদিগকে লইয়া অন্য পথে যাইতেছি।" আমরা সমুদ্রের কাছে বেড়াইতে ভাল বাসিতাম। আমি ও ভবানী সমুদ্রের তীর দিয়া গৃহে চলিলাম। কিন্তু সমুদ্রের ধারে আসিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের উভয়ের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, এক ভীষণকায় ব্যাঘ্র আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এত বড় বাঘ আমি কখনও দেখি নাই। আমাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। ভবানী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিলাম—তুমি আস্তে আস্তে আমার পশ্চাৎ দিক দিয়া পলায়ন কর। আমি দাঁড়াইয়া থাকি। উভয়ে পলাইলে কেহই বাঁচিব না। আমায় বিদায় দিয়া তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। কিন্তু ভবানী কিছুতেই আমার এই প্রস্তাবে রাজী হইল না। বলিল, "মরিতে হয় উভয়ে এক সঙ্গে মরিব। আমি কোন্ মুখে গৃহে ফিরিব?" ভবানী এক পাও নড়িল না। এদিকে ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে সৈকতভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমরা পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলাম। ব্যাঘ্রের সম্মুখ হইতে পালান কিছুতেই নিরাপদ নহে। বরং সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাই অপেক্ষাকৃত ভাল। আমরা নিরুপায় হইয়া ইষ্ট দেবতার নাম করিতেছি, এমন সময় চাহিয়া দেখি বাঘ মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে! দেখিলাম, অনেকগুলি বিষধর সাপ তাহাকে 'নাগপাশে' বন্ধন করিয়াছে, এবং হতভাগ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। অপর দিকে মুলুকচাঁদ বলিতেছে—"আর ভয় নাই। তোমাদের বিপদ দেখিয়া আমি পেটারার

সাপগুলি ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহারা পেছন হইতে বেশ কায়দা করিয়া বাঘটাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তোমরা শীঘ্র পলাও।" আমরা উভয়ে ছুটিয়া গিয়া দুইটা বর্শা ও পিস্তল লইয়া আসিলাম। পিস্তল ও বর্শার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে বাঘটাকে মারিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

বেহারে মুসলমান বিবাহ।

দেশকাল ও সাময়িক রাজার ভেদে সামাজিক আচার ও রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু সে জন্য যে, তাহাদিগের মূল ভিত্তিও একেবারে বদলাইয়া যায়, তাহা নহে। দেশভেদে যে পার্থক্য হয়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তবে একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, এবং আবার সেই একই জাতির ভিন্ন ভিন্ন অংশবিশেষের অথবা বর্ণবিশেষের মধ্যে সামাজিক এবং পারিবারিক আচার নিয়মের ভিতরও অনেক অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পারিবারিক আচার ব্যবহার আবার বহুল পরিমাণে সামাজিক আচার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

হিন্দু বাঙ্গালীদিগের বিবাহে যেমন স্ত্রীআচার একটী প্রধান অঙ্গ এবং সেই স্ত্রীআচার যেমন কন্যার গৃহে হয়, বেহারেও ঠিক তদ্রূপ নিয়ম আছে। সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। একটু বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, হিন্দুর স্ত্রীআচার এবং বেহারী মুসলমানদিগের স্ত্রীআচার এতদুভয়ের ভিতর একটা মিল আছে।

মুসলমানদিগের ভিতর দুই রকমের বিবাহ প্রচলিত—(১) শরাই এবং (২) উরফী। শিক্ষিত এবং উন্নত মুসলমান সম্প্রদায় আজকাল প্রথমোক্ত নিয়ম অনুসারেই বিবাহিত হইয়া থাকেন। "শরাই" বিবাহ সম্পূর্ণরূপে লৌকিক ক্রিয়াকলাপবর্জ্জিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী। এই বিবাহে 'মহর' বা যৌতুক সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট চুক্তি

হয় না। উভয় পক্ষের আর্থিক অবস্থার উপরেই তাহা নির্ভর করে। কিন্তু "উর্ফী" বিবাহে সেরূপ হয় না। অবস্থা যতই কেন হীন হউক না, একটা নির্দ্দিষ্ট 'মহর' দিবার জন্য বরের পিতাকে স্বীকৃত হইতেই হইবে। গ্রামে এবং নগরে আবার এই মহরের তারতম্য আছে। নগরে এক লক্ষ টাকা (!) এবং গ্রামে ৪১ হাজার টাকা ও একটী দিনার (!)। এইরূপ মহরের ব্যবস্থা শুনিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে, উহা প্রকৃতই দিতে হয়! শুধু দিতে স্বীকার করাই বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট।

"উর্ফী" বিবাহেই লৌকিক ক্রিয়াকলাপ বড় বেশী। হিসাব করিতে গেলে, ইহাতে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০।৪০টী সামাজিক আচার প্রতিপালন করিতে হয়।

সর্ব্বপ্রথমে উভয় পক্ষের আর্থিক অবস্থাসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। তাহার পর বর দেখা। অবস্থা ও বর মনোমত হইলে একজন রমণী বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির করিতে আরম্ভ করে। আমরা যেমন প্রজাপতির সেই পাথ্‌নাকে 'ঘটক' বলি—বেহারবাসী নিম্নশ্রেণীস্থ মুসলমানগণ তেমনি উক্ত রমণীকে "সুশাতা" কহে। বিবাহের গোড়া পত্তন হইয়া গেলে পুত্রের অভিভাবক কন্যার অভিভাবকের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠায়। পত্রবাহক কন্যার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে সরবত্‌ দিতে হয়। এই সময় হইতেই উভয় পক্ষের ভিতর উপঢৌকনের আদান প্রদান আরম্ভ হয়। পুত্রের পিতাই অবশ্য সকল সময়েই অগ্রণী হইয়া থাকে। ইহাকেই "নিস্‌বত্‌" কহে। তারপর "মংগ্‌নী"। পুত্রের অভিভাবক কন্যা পক্ষীয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাদিগকে মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দেয়। বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত বড় বড় মৃৎভাণ্ড পরিপূর্ণ নানারকমের মিষ্টান্ন মাথায় করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পরিচারিকারা কন্যার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেখানে পৌছিলেও গান সমানভাবে চলিতে থাকে। এই সময়ে উহাদিগের অশ্লীল গান করিবারও রীতি আছে, এবং তাহা করাও হইয়া থাকে। গান সমাপ্ত হইলে উহাদিগকে আহার করাইয়া এবং কিছু কিছু "বখ্‌শিশ্‌" দিয়া বিদায় করিতে হয়। কেহ কেহবা সেই সময়েই বরের জন্য একটী সাদা অঙ্গুরীয়ক, একখানি লাল রুমাল এবং কিছু মিষ্টান্ন উপহার পাঠাইয়া দেয়।

বিবাহের দিন প্রায় নিকট হইয়া আসিলে লগ্নপত্র করিবার রীতি এদেশেও প্রচলিত আছে। কিন্তু উহাদের লগ্নপত্র লাল কাগজে লিখিত হইয়া থাকে—ইহাকেই "ওয়াদা কা রোকা" বলে। যাহারা দরিদ্র, তাহারা লাল কাপড় অথবা সামান্য মূল্যের লাল রঙের মকমলের থলিয়ার ভিতরে দিয়া ঐ পত্র পাঠাইয়া থাকে। অবস্থা ভাল হইলে স্বর্ণ অথবা রজত কৌটা ব্যবহৃত হয়। কাপড়ের থলিই হউক আর স্বর্ণ কৌটাই হউক, তাহার ভিতর দুইটী গোটা পান, দুইটী শুপারি, হরিদ্রা এবং ধান ও দুর্ব্বা দিতে হয়। এই সবই ইহাদের মাঙ্গলিক চিহ্ন। নাপিতেই এই পত্র বাহন করিয়া থাকে। কন্যাকর্ত্তা অর্থ এবং বস্ত্র দানে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। পত্র পাইবার পরই কন্যাপক্ষ হইতে বরের পোষাকের মাপ লইবার জন্য একজন দর্জ্জি প্রেরিত হয়। লগ্নপত্র স্থির হইবার পর, যে উপায়েই হউক, দুই মাসের ভিতর বিবাহ সম্পন্ন করিতেই হইবে, তাহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। এই সময় হইতেই "মাঁঝা" বসিতে হয়, হিন্দুদিগের ভিতর এমন কোন দেশাচার দেখিতে পাওয়া যায় না। লগ্নপত্র স্থির হইবার পর পাত্রীকে কুসুমফুলের রঙে রঞ্জিত বসন পরিধান করান হয়। পাড়ার এবং বাড়ীর রমণীগণ একত্র হইয়া তাহার গাত্রে তৈল ও হরিদ্রা দিয়া থাকে। সেই সময় হইতেই তাহাকে একটি পৃথক্‌ ঘরে রাখা হয়। বিশেষ আবশ্যকতা ভিন্ন তাঁহার কক্ষ পরিত্যাগ করা বিধি নাহে। কোনও পুরুষের মুখাবলোকন এই সময়ে একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি পিতা বা ভ্রাতার মুখও দেখিতে নাই। এই সময়ে কেবল দুগ্ধ এবং ফলমূল খাইয়াই বালিকাকে জীবন ধারণ করিতে হয়। প্রতিদিন নাপিতানী আসিয়া তাহার পা দুখানি অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া থাকে। শুধু যে পাত্রীকেই এইরূপে "মাঁঝা" বসিতে হয় তাহা নহে—বরকেও ঐরূপ করিতে

হয়। তবে তাহাকেও নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে হয় কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না। দক্ষিণ মুঙ্গেরে নির্জ্জন-বাসের কোন ব্যবস্থা নাই। আমার বিশ্বাস যে, লগ্নপত্র এইরূপভাবে করা হয়, যেন দুই এক দিনের অধিক আর বর কন্যাকে "মাঁঝা" বসিতে হয় না।

বিবাহের দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে একদিন কন্যার বাটির কোন সুপরিষ্কৃত, সম্মার্জ্জিত কক্ষে একটি জাঁতা বসান হয়। পরদিন একদল সধবা রমণী গান গাহিতে গাহিতে নিকটস্থ নদী অথবা কূপের নিকট যাইয়া মুগকলাই ধুইয়া লইয়া আইসে। ইহাদিগকে "সোহাগিনী" বলে। রৌদ্রে শুকাইয়া এবং সেই নির্দ্দিষ্ট জাঁতায় পিশিয়া উক্ত মুগের বড়ি প্রস্তুত করা হয়। সচ্চরিত্রা সধবা ভিন্ন আর কেহ "সোহাগিনী" হইতে পারে না।

হিন্দুর বিবাহে 'জাগর' -গাইবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বেহারেও মুসলমানদিগের মধ্যে "রাতজাগা" আছে। গৃহপ্রাঙ্গনের একটি সুপ্রসর পরিচ্ছন্ন স্থান ধৌত করিয়া সেখানে একটি ছোট চৌকী রাখা হয়। মুখাবৃত একটি নূতন মৃণ্ময় ঘট একখানি লাল রুমাল দিয়া ঢাকিয়া সেই চৌকীর উপর স্থাপিত হয়। সুন্দর সুগন্ধ কুসুমের মালা দিয়া সেই ঘটের গলদেশ সুশোভিত হইয়া থাকে। তারপর বর কন্যার মঙ্গলের জন্য সমবেত রমণীগণ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পরমেশ্বরের স্তুতিগান গাহিয়া থাকে। এই সময়ে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীও রন্ধন করা হয়। রমণীদিগের ইচ্ছা যে, স্বয়ং পরমেশ্বরও সে দিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া তাঁহার পুত্রকন্যার মঙ্গল-বিধানে নিযুক্ত হউন।

"রাতজাগার" একদিবস পরেই "সারাবন্দী" বা "মঁড়ওয়া"। অন্দরের প্রাঙ্গনে চারিটী বংশদণ্ডের সাহায্যে একটী চন্দ্রাতপ বিলম্বিত হয়। মহানুভব সাকরগঞ্জের নামে মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হইলে পর উক্ত বংশদণ্ডে ফুলের মালা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কার্য্য শেষ হইলে সেই শুভচন্দ্রাতপবন্ধনে ব্যাপৃত আত্মীয়বন্ধুদিগের মুখে চন্দন লেপিয়া দিতে হয়। কোন কোন স্থলে সেই চন্দ্রাতপের নিম্নে, সেখ আবদুল কাদির জিলানিকে স্মরণ করিয়া ছাগল অথবা গো কুর্ব্বানি হইয়া থাকে। সেই স্থানেই উক্ত মাংস রাঁধিতে হয়। সেই রাত্রিতেই হস্ত্যাশ্বচিত্রিত একটি বড় ঘট ("কল্‌সী") প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার মুখ মাটির সরা দিয়া বন্ধ করা হয়। সেই সরার উপর ধান্যশীর্ষ এবং আম্র পল্লব থাকে। একটি প্রজ্জলিত চতুর্মুখী দীপ প্রতি রাত্রিতেই তাহার উপর স্থাপিত হয়। বিবাহ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ঘট খোলা বা স্থানচ্যুত করা হয় না। রমণীদিগের বিশ্বাস যে, তাহারা উক্ত ঘটের ভিতর সকল প্রকার বিপদ আপদ এবং "সাপ পোকা মাকড়" আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ঘটস্থাপনের সময় উক্ত মর্ম্মে গানও গাওয়া হইয়া থাকে।

পরদিন যখন নিমন্ত্রিতা প্রতিবেশিনীদিগের হাস্য কোলাহলে বিবাহ-ভবন মুখরিত হইয়া উঠে, তখন সেই পূর্ব্ব কথিত চন্দ্রাতপের নিম্নে বারিবিধৌত একটি নির্ম্মল স্থানে একখানি সপত্র আম্রশাখাও প্রোথিত হয়। কখনও কখনও আবার এমনও দেখা যায় যে, আম্রশাখার পরিবর্ত্তে দুই কি আড়াই হস্ত পরিমিত দীর্ঘ একখানি লাঠি পুঁতিয়াও কাজ চালান হয়। কুসুমরাগরঞ্জিত লোহিত বস্ত্রের একখানি রুমাল উক্ত আম্রশাখা বা লাঠির মাথার উপর রক্ষিত হয়। কেহ কেহ রুমাল দিয়া ঐ আম্রপল্লব অথবা লাঠি একেবারে ঢাকিয়া ফেলে। তাহার পর সমবেতা রমণীগণ সুললিত স্বরে বালৈ মিঞার গান গাহিয়া থাকে। সেই সময়েই নূতন ঘটের ভিতর "আঁখিয়া" রাখিয়া উহা দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। "আঁখিয়া" জলে সিদ্ধ গমের ময়দা এবং চাউলের গুঁড়া দিয়া প্রস্তুত এক প্রকার পিষ্টক। আঁখির মত করিয়া গঠিত হয় বলিয়াই এই পিষ্টক গুলিকে "আঁখিয়া" বলে। সেই প্রসাদ সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করে। ইহাকেই বলে "পীরকা নয়জা"।

হিন্দুদিগের ভিতরে যেমন বিবাহের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ আছে, ইহাদেরও ঠিক তেমনি একটা ক্রিয়া আছে। তাহাকে "বান্দুরী" বা "বিবিকা সনক" বলে। 'পীরকা-নয়জা' যে রাত্রে হয়, সেই রাত্রিতেই "বিবিকাসনকও"

হয়। মাটীর একটী "চূলা" (উনুন) তৈয়ার করিয়া সেই চন্দ্রাতপের নিম্নে রাখা হয়। কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্র হইয়া গান গাহিতে গাহিতে জল আনিতে যায়। আমাদের "সোহাগ জল" তুলিবার কথা বোধ হয় কোন বঙ্গীয় পাঠিকাকে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। যাহা হউক, ইহাদের সেই জলের কলসীগুলি লোহিত বস্ত্রে আবৃত থাকে। যাহারা জল আনিতে যাইবে, তাহাদের সধবা ও সচ্চরিত্রা হওয়া একান্ত আবশ্যক—সেই সঙ্গে স্বামী-সোহাগিনী হইলে ত কথাই নাই। সেই জলে অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করা হয়। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে এই সকল দ্রব্য পরিবেশন করে, এবং তাহার প্রত্যেকের উপরে একটী করিয়া ফোটা, পান এবং এক ছড়া করিয়া ফুলের মালা রাখে। কোন কোনও স্থলে শুধু অন্ন, মাখন ও চিনি পরিবেশন করা হয়। ইহাকেই "মিঠি কন্দুরি" বলে। সর্ব্বপ্রথমে মহম্মদের নামে এই সকল খাদ্য সামগ্রী উৎসর্গ করিয়া তাহার পর উহারই এক এক খানি থালা ফতেমা বিবি এবং অন্যান্য মহাত্মাগণ ও সেই পরিবারের প্রত্যেক মৃতব্যক্তির নামে, যতদূর নাম মনে পড়ে, উৎসর্গ করা হয়। তাহার পর বিবি ফতেমার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে নিমন্ত্রিতা রমণীগণ উহার সদ্ব্যবহার করেন। যে সকল স্ত্রীলোকের দুইবার বিবাহ হইয়াছে বা যাহারা অসচ্চরিত্রা, তাহারা মহম্মদ এবং বিবি ফতেমার প্রসাদ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতে পারে না।

যেদিন "পীরকা নয়জা" হয়, তাহার পরদিন সাতজন "সোহাগিনী" মিলিয়া বর-কন্যার গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিয়া দেয়। বর ও কন্যার আপন আপন বাড়ীতেই ইহা হইয়া থাকে। বর কন্যাকে তাহাদিগের নিজ বাটীতে এক একখানি ছোট চৌকীর উপর বসাইয়া পীত বসন দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর সাতজন বিবাহিতা "সোহাগিনী" একত্র হইয়া কিঞ্চিৎ সর্ষপ ক্ষুদ্র একখণ্ড পীত বসনে বাঁধিয়া পাত্র ও কন্যার হস্তে বাঁধিয়া দেয়। ইহাকেই 'কঙ্কণ বাঁধা' বলিয়া থাকে। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের হস্তে সর্ষপ বাঁধিবার রীতি না থাকিলেও বরের দক্ষিণ হস্তে ও কন্যার বামপদে সুতা বাঁধিবার নিয়ম আছে।

বিবাহ করিতে আসিবার পূর্ব্বে বর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃত মহাত্মাদিগের 'কবর' এবং গ্রাম্য "ইমাম বাড়া" দর্শন করিতে যায়। বেহারে প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, ইমাম্ হোসেনের পুণ্যময় নাম এবং পবিত্র আত্মদান স্মরণ করিয়া প্রত্যেক গ্রামেই এক একটি মন্দির প্রস্তুত করা হয়। ইহাকেই "ইমাম্‌বাড়া" বলে। শ্বশুরালয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াও বরকে সেই গ্রামের মহাত্মাদিগের গোরস্থান এবং "ইমামবাড়া" দর্শন করিতে হয়। ইহারই নাম "বরিয়াৎ"।

বরিয়াত্ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কন্যার জন্য "বরী" পাঠাইবার রীতি আছে। ইহাকে "সাচক" বলে। "বরী" আর কিছুই নহে—পাত্রীর জন্য কতকগুলি উপঢৌকন মাত্র। তাহার ভিতর নানা রকমের দ্রব্য থাকে। নিম্নে তাহার কতক গুলির নাম দেওয়া গেল—

(১) কন্যার পোষাক (২) কুসুমরঙে রঞ্জিত সুতা। ইহাকে "নাড়া" বলে। (৩) আতর অথবা তদ্রূপ কোন দ্রব্য। ইহাকে "সোহাগ্‌কা আতর" বলে। (৪) গন্ধ তৈল (৫) পিরামিডাকৃতি (pyramid) বংশনির্ম্মিত একটী ঝাঁপি (basket)—ইহাকেই বলে "সোহাগপুরা"। কতকটা আমাদের দেশের নন্দ পুঁটুলির মত। ছল্‌ছবেলা, নগরমোথা, বাল্‌ছড়, দারুচিনি, চন্দন প্রভৃতি অনেক রকমের দ্রব্য দিয়া এই ঝাঁপি পরিপূর্ণ করা হয়। (৬) সন্দেশ (৭) পানমসল্লা (৮) ৫২টি মৃণ্ময় ঘট; এই ঘটগুলি আকৃতিতে খুবই ছোট, কিন্তু বড় সুন্দর রং করা। প্রত্যেক ঘটের ভিতর চাউল, গুপারি এবং আম্রপল্লব থাকে। খুব বাজনা বাজাইয়া, রোশনাই করিয়া এই সকল দ্রব্য কন্যার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হয়। এদিকে কন্যাপক্ষ হইতে একজন নরসুন্দর বরের পোষাক লইয়া তাহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয়। বর পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া তাহার পুরাতন পোষাক সেই নরসুন্দরকে দান করে। নরসুন্দর সানন্দচিত্তে বরের মস্তকের উপর প্রকাণ্ড রকমের একটী ছত্র ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সহিত আসিতে থাকে। ইহার পরই মুসলমানের ধর্ম্ম-বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বর অশ্বে আরোহণ করিয়া মহাধুমধামে কন্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাড়ীতে পৌঁছিলে, বাড়ীর পুরুষগুলি বাহিরে দণ্ডায়মান থাকে—একা বর অশ্ব-পৃষ্ঠেই হউক, আর পায়ে হাঁটিয়াই হউক, অন্দরের ভিতর প্রবেশ করে। সেখানে একখানি নবকাষ্ঠাসনে তাহাকে বসিতে দেওয়া হয়। কন্যার মাতা অথবা অভাবপক্ষে কন্যার অপরা আত্মীয়া একটী প্রদীপ লইয়া আসিয়া জামাইকে বরণ করে। বরণ করিবার পদ্ধতি হিন্দুদিগেরই মত। যখন এইরূপে বরণ করা হয়, তখন একজন আসিয়া বরের কানে কানে বলে—

"সোনে মে সোহাগা, সুঁই মে তাগা।

ঔ দুল্‌হা কা মন দুলহিন মে লাগা॥" *

তাহার পর শ্বশ্রূ এবং সোহাগিনীগণ মিলিয়া পর্য্যায়-ক্রমে বরকে বরণ করিয়া থাকে। বরণ করা সমাপ্ত হইলে তাহাকে সরবৎ দেওয়া হয়। এই সরবৎ নানা রকমে প্রস্তুত করা হয়। কখনও কন্যার সিক্তকেশ সরবতের ভিতর ডুবান হয়, কখনও বা তাহার হস্তে কিঞ্চিৎ চিনি দেওয়া হয়। হাত ঘামিয়া ঐ চিনি গলিয়া গেলে তাহাই সরবতের ভিতর দেওয়া হয়; কখনও বা কন্যার চর্ব্বিত মিছরির সরবৎ প্রস্তুত করা হয়। সরবৎ পানের পর, বর সেই কাষ্ঠাসনের উপর দণ্ডায়মান হয়; এবং একজন দাসী কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া আনিয়া বরের পৃষ্ঠের সহিত কন্যার পাদদেশের সুকোমল সংস্পর্শ করাইয়া দিয়া কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করে। বর বেচারী তখন নিতান্ত ভগ্নমনে আপনার বাসাবাটীতে ফিরিয়া আইসে।

"বরিয়াৎ" পৌঁছিবার পরদিবস কন্যাকর্ত্তাকে বরের বাসাবাটীতে সন্দেশ ও খাদ্য সামগ্রী পাঠাইতে হয়। সেই সঙ্গে আবার সরবৎও থাকে। সেইদিন সন্ধ্যার সময় বরিয়াতের ছত্র কন্যার বাড়ীতে লইয়া যায় এবং তাহারই নিম্নে বসিয়া "সোহাগপুরার" মসলা গুঁড়া করিয়া তাহাই দিয়া কন্যার চুল ঘসিয়া দেয়, এবং গন্ধতৈলে তাহার কেশদাম নিষিক্ত করিয়া "নাড়া" দিয়া তাহার বেণীবন্ধন করিয়া দেয়।

মিশি দাঁতে সেই লজ্জাশীলা বালিকার বেশ ভূষা পরিপাটী মত হইলে পর একজন দাসী বরকে লইয়া আসে। বর অগ্রে অগ্রে, দাসী পশ্চাতে। দাসীর হস্তে একখানি থালার উপর একটী প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। সুবিধা হইলে প্রদীপটী এমন করিয়া রাখা হয় যে, তাহার ধোঁয়া বরের নাকে যাইয়া লাগে! অন্দরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর তাহার শ্বশ্রূই হউক অথবা অপর কেহই হউক, বরকে বাটির ভিতর আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। নানা স্থানে নানা রকম করিয়া আহ্বানের রীতি আছে। কখনও দেখা যায় যে আহ্বানকারিণীর হস্তে একখানি থালার উপর একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ থাকে। দীপের সলিতা লাল কাপড়ের। এবং সেই সঙ্গে খানিকটা "নাড়া"ও থাকে। আহ্বানকারিণী বরের দিকে সম্মুখ করিয়া একবার পশ্চাতে একবার সম্মুখে হাঁটিতে থাকে এবং প্রতি পাদবিক্ষেপে সেই সুতা ("নাড়া") ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। বর বেচারীকে তাহা আবার তুলিয়া সেই থালার উপর রাখিতে হয়! কোথাও বা বরকে পান খাইতে দেওয়া হয়। সে উহা মুখে করিয়া কেবল দাঁত দিয়া কাটিয়াই ফেলিয়া দিতে থাকে। ইহার পর পুর্ব্বোল্লিখিত সেই চন্দ্রাতপতলে বর আনীত হয়। সেই স্থানে একটি শয্যা রচিত থাকে এবং তাহারই পার্শ্বে একখানি চৌকী থাকে। বর সেই কাষ্ঠাসনে উপবেশন করে। তখন "সুশাতা" (ঘটকী রমণী) উক্ত আসন ও শয্যার মধ্যে কাপড়ের একখানি পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিয়া কন্যাকে সেই শয্যার উপর দাঁড়াইতে বলে। পর্দ্দাটি এরূপভাবে থাকে যে, বর ও বধূ পরস্পর পরস্পরের মুখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। 'সুশাতা' তখন কন্যার হাত দুখানি তুলিয়া তাহার (কন্যার) আপন কপালের উপর স্থাপিত করিয়া, তাহার মস্তক ধরিয়া একবার দক্ষিণে একবার বামে নাড়িতে থাকে। একখানি রঞ্জিত রুমালে চাউল এবং হরিদ্রা বাঁধিয়া বরের হস্তে প্রদান করা হয়।

* দুল্‌হা—বর। দুলহীন—কন্যা।

বর তখন কন্যার গাত্রে উহা নিক্ষেপ করে। বর যতবার এইরূপ করে, তত বারই তাহাকে একটি করিয়া পান দিতে হয়। সেই পানের ভিতর "চির্‌চিরা" লতার ছোট ছোট এক রকম বড়ি থাকে। এমনি করিয়া ৭ বার পান দিবার রীতি আছে। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে বর কন্যার শুভদৃষ্টি করান হয়। কখনও কখনও এমন দেখা যায় যে, শুভদৃষ্টির পর বরের হস্তে একটি রৌপ্য অথবা স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক এবং একটি বাটিতে করিয়া চন্দন তৈল দেওয়া হয়। অঙ্গুরীয়কটি এই-রূপে প্রস্তুত যে, তাহার যে স্থানে লোকে সচরাচর পাথর বসাইয়া থাকে, সেই স্থানে পাথর না দিয়া কেবল একটি গোলাকার ছিদ্র রাখা হয়। বর সেই অঙ্গুরীয়ক চন্দন-তৈলে ডুবাইয়া তাহা দিয়া কন্যার মস্তক স্পর্শ করে (ফোটা দেয়)। কোনও স্থানে বা চন্দন-তৈলের পরিবর্ত্তে সিন্দূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তখন একজন পরিচারিকা আসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করে—বর তাহার অঞ্চল অথবা কোন একটি অঙ্গুলী ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

তাহার পর বর কন্যাকে অন্য একটি ঘরে লইয়া একত্রে দাঁড় করাইয়া উভয়ের হস্তেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাউল দিতে হয়। কন্যার হস্ত তাহার পশ্চাৎ দিকে থাকে। এইরূপ অবস্থায়, অপর কেহ তাহাদিগের হস্ত ধরিয়া চাউলগুলি শূন্যে নিক্ষেপ করে। সেই সময় কন্যা বলে—"আমি আমার বাপের ঘর ভরিলাম," আর বর বলে "আমি আমার পিতার ও শ্বশুরের ঘর ভরিলাম।" সেই নব দম্পতীকে তখন একটি অপেক্ষাকৃত সজ্জিত কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে যাইয়া সেই নবীন পতি, নবীনা পত্নীর ক্ষুদ্র চরণ হইতে পাদুকা খুলিয়া লয়।

তাহার পরই বিদায়ের পালা। ইহাকেই "রুথ্‌সতি" বলে (অর্থাৎ—বরিয়াতের প্রতিগমন)। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের তিন দিবস পরেই বর আপন স্ত্রীকে লইয়া গৃহমুখে যাত্রা করে। কিন্তু যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাকে অন্দরের ভিতর আনিয়া কিছু আহার করাইতে হয়। আহার সমাপ্ত হইলে নবীন দম্পতিকে একত্র দাঁড় করাইয়া একখণ্ড পানের উপর একটু চিনি লইয়া—উহা প্রথমে বধূর মস্তকের উপর, তারপর স্কন্ধে, তারপর হস্তের তালুদেশে এবং সর্ব্বশেষে পায়ের উপর রাখা হয় এবং বরকে দাঁত দিয়া ঐ পান তুলিয়া লইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করা হয়। সে যদি নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে তাহাকে হাত দিয়া উহা তুলিয়া লইতে হয়।

বরের বাড়ীতে আসিয়া বর কন্যা ৭টি চিতিকড়ি লইয়া জুয়া খেলিতে বসে। সেই কড়ি এবং একখানি অলঙ্কার একত্র করিয়া শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বর এবং কন্যার ভিতর যে কেহ মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বে সেই অলঙ্কারখানি ধরিতে পারে, উহা তাহারই প্রাপ্য হয়। বলা বাহুল্য যে, সকল স্থলেই উহা স্ত্রীরই হইয়া থাকে। প্রথমবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া বধূ দশদিন মাত্র সেখানে থাকে। তাহার পর তাহার আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী।

পঞ্চম প্রস্তাব।

আমেরিকায় অবস্থানকালে সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা আনন্দীবাঈকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি কোনও স্থানে গমন করিলেই তাহারা তাঁহার অনুসরণ করিত। অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিত। কিন্তু আনন্দী বাঈর যশোলিপ্সা প্রবল না থাকায় তিনি সংক্ষেপে কথোপকথনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিতেন। এক এক সময় এই রিপোর্টারেরা তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশ করিত যে, তাহা পাঠ করিয়া হাস্যসংবরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সারাটোগা নামক স্থানের এক সংবাদ পত্রে একবার তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ প্রকাশিত হয় যে,—"একটি হিন্দুমহিলা উৎস দেখিবার জন্য এদেশে আসিয়াছেন; তিনি প্রত্যেক

যন্ত্রণায় এত জলপান করিয়াছেন যে, সেজন্য তাঁহার অসুখ হইয়াছে এবং ডাক্তারেরা তাঁহাকে ঔষধ দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন!"* আর দুই একখানি পত্রেও তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞানতাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদপত্রই তাঁহার প্রশংসায় তৎপর থাকিত। একদা গোপালরাও আনন্দীবাঈর চিঠিপত্র ও তৎসম্বন্ধে মার্কিন সম্পাদকগণের অভিমতসমূহ একত্র করিয়া প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু যশাকাঙ্খাপরিশূন্যা আনন্দীবাঈ তাহাতে বিশেষরূপে বাধা দান করায় তাঁহাকে সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়।

প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের সময় আনন্দীবাঈ তাঁহার মাসীর নিকট রোশেল-নিউজরসি গ্রামে গমন করিতেন। কখনও কখনও দুই এক জন সঙ্গিনীর নিতান্ত অনুরোধে তাঁহাদিগের বাসস্থানে যাইতেন। এতদুপলক্ষে ওয়াশিংটন বোষ্টন প্রভৃতি কতিপয় স্থান তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার দীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে তিনি সঙ্গিনীদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে একবার মাত্র থিয়েটার ও সারকাস দেখিতে গিয়াছিলেন। আমেরিকায় তাঁহার বিলাসিতা বা কৌতুকদর্শনেচ্ছা কখনও প্রকটিত হয় নাই। তিনি যেরূপ তপস্বিনীর ন্যায় নিরাড়ম্বরভাবে জ্ঞান-পিপাসু হইয়া আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন, তেমনিই সেখানে গিয়া স্বীয় চিত্তসংযম একদিনের জন্যও হারান নাই। তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন,—"ভারতবাসীর জন্য কিছু করা কর্ত্তব্য বলিয়া যদি আমার মনে না হইত, তাহা হইলে আমি এত দূরদেশে কখনই আসিতাম না। * * ভারতে ফিরিয়া গিয়া হিন্দুমহিলাদিগের জন্য একটি কালেজ স্থাপনই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে।" এই লক্ষ্য হইতে তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু ভগবানের বিধান অন্যরূপ ছিল।

আনন্দী বাঈর এরূপ স্বদেশনিষ্ঠা ও চিত্তের দৃঢ়তা সন্দর্শনে আমেরিকার এপিস্কোপেলিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত এক পাদরি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, মিসেস্ জোশী যে দিন আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেন, সেদিন যেমন ছিলেন, অদ্যাপি অবিকল সেইরূপ আছেন। তাঁহার আচার ব্যবহারে অণুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু তিনি যদি এইরূপ অবিকৃত অবস্থায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে, তাহা আমাদিগের ও খৃষ্টধর্ম্মের পক্ষে ঘোরতর লজ্জার বিষয় হইবে!

এদিকে গোপালরাওয়ের মনে বহুদিন হইতে পৃথিবী পরিক্রমণের ইচ্ছা ছিল। আনন্দীবাঈর বিরহেও তিনি আমেরিকা গমনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালের মধ্যভাগে তিনি ছয় মাসের ছুটি (ফর্লো) লইয়া আমেরিকা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল আনন্দীবাঈকে প্রেরণের জন্য তাঁহাকে ১৪০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন। তাহাতে কিছুদিন পর্য্যন্ত আনন্দীবাঈর ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে ভাবিয়া তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণে প্রারম্ভ করিলেন। এই প্রবাসব্যাপারে ভারতবর্ষের এক কপর্দ্দক ব্যয় করা হইবে না, তিনি যাত্রাকালে এইরূপ স্থির করিয়া গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসীর বেশে নানা স্থানে বক্তৃতার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই।

গোপালরাও প্রথমতঃ ব্রহ্মদেশ, পরে শ্যাম, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। চীনে অবস্থান কালে তিনি একবার বিষম পীড়িত হইয়াছিলেন। নানা ঔষধ সেবনে বিরক্ত হইয়া তিনি উপকার-লাভের আশায় একদিন শর্করাযোগে এক বাটি কেরোসিন তৈল পান করিয়া ফেলিলেন! বলা বাহুল্য, এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ফল তাঁহাকে সে যাত্রা ভয়ানক ভুগিতে হয়। সে যাহা হউক, তিনি আরোগ্য লাভের পর নানা স্থানে বক্তৃতা দ্বারা তত্তদেশবাসিগণের আচার ব্যবহারের নিন্দা ও ভারতীয় রীতি নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক বক্তৃতা করিতে করিতে বহুদিন পরে আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন।

আনন্দীবাঈ স্বামীর আগমনের বার্ত্তা শ্রবণে অতীব উৎফুল্লা হইলেন। কিরূপে তিনি স্বামীর অভ্যর্থনা করিবেন, তদ্বিষয়ে বহু প্রকারের প্রস্তাব উপতস্থি

করিয়া তিনি গোপালরাওয়ের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। তিনি তত্রত্য কলেজে তাঁহার জন্য একটি সংস্কৃত শিক্ষকের পদও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিচিত্র-প্রকৃতি গোপালরাওয়ের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি আনন্দীবাঈর পত্রোল্লিখিত অভ্যর্থনা বিষয়ক প্রস্তাবের বিপরীত অর্থ বুঝিয়া তাঁহাকে একটী পত্রে অতি কঠোর তিরস্কার করিলেন। আনন্দীবাঈ ইহাতে কুপিতা হইয়া তাঁহাকে অভিমানপূর্ণ এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু গোপালরাও আর তাঁহার উত্তর দান করিলেন না। তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বেচারী আনন্দীবাঈ তাহার দর্শনলাভের জন্য যতই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, গোপালরাও ততই সে বিষয়ে অমোনযোগিতা দেখাইতে লাগিলেন। এমন কি, তিনি একবার তাঁহাকে জানাইলেন যে, আনন্দীবাঈর পরীক্ষা শেষ না হইলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

একদিন আনন্দীবাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের কন্যা অ্যামির সহিত কোনও বান্ধবীর গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, গোপালরাও তাঁহার প্রকোষ্ঠে একটা টেবিলের সম্মুখে পুস্তক পাঠে নিমগ্ন রহিয়াছেন! বলা বাহুল্য, গোপালরাও আগমনের পূর্ব্বে কাহাকেও কোনও সংবাদ প্রেরণ করেন নাই। আনন্দীবাঈ গৃহে প্রত্যাগত হইলেও কেহ তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করে নাই। এরূপ অবস্থায় দীর্ঘ বিরহ ও আশাতীত প্রতীক্ষার পর হঠাৎ স্বামিসন্দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার মনে কিরূপ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বহুদিনের প্রবাসজনিত কষ্টে গোপাল রাওয়ের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। আনন্দী বাঈয়ের যত্নে তিনি শীঘ্রই স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। অতঃপর কিছুদিন উভয়ের একত্র বাসে পরমসুখে কাল যাপিত হইল। তখন গোপাল রাও আর ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া স্ত্রীর শিক্ষা সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত আমেরিকাতেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বক্তৃতা দ্বারা বেশ অর্থ লাভ হইয়া থাকে। গোপাল রাওয়ের বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল। এই কারণে তিনি সেই ব্যবসায় অবলম্বনই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। আনন্দীবাঈ বলিলেন,—"দুষ্টপ্রকৃতি মিশনারিরা অন্য দেশের বিষয়ে নানা প্রকার অলীক কথার রটনা করিতে ভাল বাসে। এরূপ অবস্থায় আপনি যদি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া এদেশবাসীর ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূর করিবার যত্ন করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।" গোপাল রাও এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। একেই তিনি একটু পরছিদ্রান্বেষী ছিলেন, তাহাতে আবার স্ত্রীর উপদেশে ও স্বদেশ-ভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া তিনি যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন উহা একশ্রেণীর শ্রোতৃবর্গের বিশেষ চিত্তাকর্ষণ করিল, এইরূপে তিনি নগরে নগরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আনন্দীবাঈ স্বীয় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন।

পরীক্ষার দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আনন্দীবাঈ ততই কঠোর পরিশ্রম করিয়া শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার আর একবার ডিপ্‌থেরিয়া রোগের সূচনা হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেবার তিনি উহার ভীষণ আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিলেন না।

যথাকালে আনন্দীবাঈ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। ১৮৮৬ সালের ১১ই মার্চ্চ ফিলাডেলফিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও তত্রত্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া মহাসমারোহের সহিত তাঁহাকে এম্ ডি উপাধির সনন্দ প্রদান করিলেন। এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ও ব্যয়ে পণ্ডিতা রমাবাঈ ইংলণ্ড হইতে ফিলেডেলফিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উপাধিলাভ উপলক্ষে আনন্দীবাঈ তাঁহার অনেক সঙ্গিনীর ও হিতৈষী সদাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে উপঢৌকন ও পুরস্কারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর দুই তিন সপ্তাহকাল তাঁহার সখীজন-

পরিবৃতা হইয়া ভ্রমণ ও বনভোজন প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়।

পূর্ব্ব হইতেই আনন্দীবাঈর স্বাস্থ্য হানি হইয়াছিল। পরীক্ষা দান কালেই তিনি অতীব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি লাভের পরই পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের কন্যা মনোরমার ভয়ানক অসুখ হয়। আনন্দীবাঈ সেজন্য কয়েক রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করেন। ইহাতে তাহার অসুস্থতা বৃদ্ধি হয়। এই অসুস্থতাকে অতিশ্রম-জনিত মনে করিয়া তিনি অতঃপর বিশ্রামলাভের জন্য স্বামীর সহিত রোশেল নগরে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে না হইতেই তাঁহাকে নিউইংল্যাণ্ড হাঁসপাতালে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কার্য্যমূলক (practical) জ্ঞানলাভের জন্য গমন করিতে হয়। সেখানে সমস্ত দিবারাত্রি রোগীদিগের পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হওয়ায় অতি শ্রমে আবার তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটিল। পূর্ব্বাবধি তাঁহার শিরঃপীড়া ছিল। এক্ষণে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং দুর্ব্বলতার সহিত কাশি দেখা দিল। ইহা যে কোনও ভয়ঙ্কর রোগের পূর্ব্বলক্ষণ, তাহা সে সময়ে কেহই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বায়ু পরিবর্ত্তন ও বিশ্রাম করিলেই উহা নিরাকৃত হইবে ভাবিয়া সকলেই সেই ব্যবস্থা করিলেন। আনন্দীবাঈ কখনও তাঁহার স্বামীর সহিত কখনও বা অন্য সঙ্গিনীর সহিত নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে কয়েক মাস করিয়া বাস করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পীড়ার বিশেষ কোনও উপকার হইল না।

এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের কোহ্লাপুর নামক দেশীয় রাজ্যের অধিপতি স্বীয় রাজধানীতে একটি হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। আনন্দীবাঈ ঐ হাঁসপাতালের স্ত্রী-চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। বহুদিন বিদেশে একাকিনী বাস করিয়া তাঁহারও স্বদেশে গিয়া আত্মীয় স্বজনগণের সহবাসে কালযাপন করিবার বাসনা অতীব প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু গোপালরাও সে প্রস্তাবের বিরোধী হইলেন। তাঁহার রুশিয়া ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গমনপূর্ব্বক ভারতীয় সামাজিক রীতিনীতির শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপক বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা ছিল। কাজেই আনন্দীবাঈ একাকিনী স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, স্থির করিলেন। পরিশেষে আনন্দীবাঈর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও স্বদেশগমনে তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া গোপাল রাওকে স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সময়ে আনন্দীবাঈ তাঁহার শ্বশ্রূকে যে কতিপয় পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি শাশুড়ীকে কোহ্লাপুরে আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শাশুড়ীর স্নেহলাভের ও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার সুখী করিবার জন্য তাঁহার মনে যে এই সময়ে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল, তাহা এই সকল পত্রে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আমেরিকা-ত্যাগের পূর্ব্বে আনন্দীবাঈকে ডাক্তারদিগের পরামর্শক্রমে কিছুদিন পার্ব্বত্য প্রদেশে রাখা হইয়াছিল। কাশির সঙ্গে ক্রমশঃ তাঁহার জ্বর হইল। এইরূপ অসুস্থ অবস্থায় তিনি একদিন সকলের নিষেধ অতিক্রম করিয়া একটি সঙ্কটাপন্না প্রসূতিকে প্রসব করাইবার জন্য তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দশঘণ্টা কাল পরিশ্রম করায় ও প্রত্যাবর্ত্তন কালে সহসা বৃষ্টির জলে সিক্ত হওয়ায় তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। পরোপকার-প্রণোদিত হইয়া তিনি সেই রমণী ও তাহার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে পরিশেষে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল। এই অত্যাচারে তাঁহার যে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই পরিশেষে তাঁহার জীবনান্ত হইল।

এইরূপে পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাকে কিছুদিন ফিলাডেলফিয়ার স্ত্রীচিকিৎসালয়ে রাখিয়া চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় না হওয়ায় তত্রত্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে স্বদেশে গমন করিতে উপদেশ দান করিলেন। ইহার পর তিনি স্বীয় ব্যবস্থানুসারে দিন কয়েক ঔষধ সেবন করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করেন, কিন্তু তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। তাঁহার ক্ষয় কাশ রোগ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গোপালরাও ও তাঁহার হিতৈষীরা অতীব চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশে

গিয়া কবিরাজী চিকিৎসায় তিনি নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন—এরূপ ভরসা আনন্দীবাঈর মনে বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

কোহ্লাপুর দরবার হইতে আনন্দীবাঈর জন্য পাথেয় আসিলে তিনি শ্রীমতী কার্পেণ্টার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমেরিকা-ত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাডলে তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। আনন্দী বাঈ তাঁহার উপদেশ ক্রমে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তিনি ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকে বহু নির্য্যাতন করিয়া ছিলেন। তাঁহার জন্য উপবাস ও কদন্নভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়া আনন্দীবাঈর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে কোহ্লাপুরের স্ত্রীচিকিৎসকের পদ যাহাতে আনন্দীবাঈ লাভ করিতে না পারেন, সে জন্য সেই আদর্শ (?) খৃষ্টীয় অধ্যাপিকা অতি গোপনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, দুষ্টার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে আনন্দীবাঈ বহুবার খৃষ্টান মিশনরিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে খৃষ্টান পাদরিদিগকে ক্রূর প্রকৃতি, বিশ্বাস-ঘাতক ও ভণ্ড বলিয়া আনন্দীবাঈর ধারণা জন্মিয়াছিল। স্বদেশে আসিয়া তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইলে তিনি অনেক সময়েই স্বপ্নে দেখিতেন যে, কোহ্লাপুরের স্ত্রী চিকিৎসালয়ে মিশনরি রমণীদিগের সহিত তাঁহার কলহ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া সে ব্যাপার মহারাজের দরবার পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর আনন্দীবাঈ ও গোপাল রাও সাশ্রুনয়নে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের শান্তি নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া বন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে তিনি তাঁহার বান্ধবীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অবসর লইয়া আবার কিছুদিনের জন্য আমেরিকা পরিদর্শন করিতে প্রত্যাগমন করিবেন। আমেরিকার অনেক সজ্জন ব্যক্তি তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃতই তৎপ্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাই তিনি আমেরিকার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু আনন্দীবাঈর অন্যান্য মনোরথের ন্যায় পুনর্ব্বার আমেরিকাদর্শনের কামনাও অপূর্ণ রহিয়া গেল।

শ্রীমতী কার্পেণ্টার তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া মনঃকষ্টে গৃহে ফিরিলেন। আনন্দীবাঈ তাঁহার বিরহে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হওয়ায় নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল। তাহার উপর অর্ণবপোতের আন্দোলন। রুগ্নদেহ আনন্দীবাঈ সামুদ্রপীড়ায় অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্বর, কাশি, অরুচি ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গেরই বৃদ্ধি হইল। ১৩ই অক্টোবর রাত্রিকালে তাঁহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, গোপালরাও তাঁহার জীবনের আশাপরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পরদিন তাঁহার স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হইল।

লণ্ডনে আসিয়া তাঁহাদিগকে জাহাজ পরিবর্ত্তন করিতে হইল। তাঁহারা অপর জাহাজের টিকিট খরিদ করিয়া উহাতে উঠিবার জন্য গমন করিলে জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে "নেটিভ" বা "কালা আদমি" দেখিয়া জাহাজে চড়িতে নিষেধ করিল। তাঁহারা ভাড়ার টাকা ফিরিয়া পাইলেন এবং অন্য জাহাজের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় নামা, উঠা ও ভ্রমণ করিতে বাধ্য হওয়ায় রুগ্না আনন্দীবাঈর বিশেষ কষ্ট হইল। কিন্তু উপায়াভাবে তাঁহাকে সমস্তই সহ্য করিতে হইল।

সৌভাগ্য ক্রমে শীঘ্রই অপর জাহাজে গমনের সুবিধা হইল। অর্থাভাব-বশতঃ গোপাল রাও আনন্দীবাঈর জন্য একটী প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আপনাকে তাঁহার ভৃত্যরূপে পরিচিত করিয়া নিজের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিলেন। লণ্ডন ত্যাগ করিবার পর আনন্দীবাঈ কয়েক দিন সুস্থ ছিলেন। তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন, স্বদেশের বায়ুসেবনে তিনি নিরাময় হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি কথঞ্চিৎ অযত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং আবার পীড়ার বৃদ্ধি হইল।

এইরূপ রুগ্ন অবস্থায় ১৬ই নবেম্বর তারিখে শ্রীমতী

আনন্দীবাঈ জোশী বোম্বাই নগরীতে উপস্থিত হইলেন। গোপাল রাওয়ের বন্ধুবর্গ তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমনের জন্য সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আনন্দীবাঈ স্বদেশীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহারা পুষ্পবৃষ্টি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায় নানা স্থানের লোকে সভা সমিতি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রেরণে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অনেকে তারযোগে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সংবাদপত্রের স্তম্ভসমূহ তাঁহার যশোগানে পরিপূর্ণ হইল।

কিন্তু যাঁহার জন্য এত আনন্দ প্রকাশ, তিনি রোগের আক্রমণে দিন দিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। একে একে বোম্বাইয়ের অনেক ডাক্তারই তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। কয়েকবার স্থান-পরিবর্ত্তনও করা হইল। কিন্তু কিছুতেই দুষ্ট ব্যাধির উপশম ঘটিল না। পরিশেষে আনন্দীবাঈ পুণায় আসিলেন। সেথানকার জল বায়ুর গুণে ও আত্মীয় স্বজন সহবাসে প্রথম কয়েকদিন তাঁহার কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিল। তাঁহার জননী ভগিনী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ও সেবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু গোপাল রাওয়ের ন্যায় কেহই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন নাই। সে সময়ে গোপালরাও আনন্দীবাঈর যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, অনেক জননীও বোধ হয় সন্তানের সেবায় সেরূপ যত্ন প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আনন্দীবাঈর নিকট হইতে দূরে থাকিতেন না। অধিকাংশ রজনীই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তিনি বিনিদ্র নয়নে অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিশ্রমের কোনও সার্থকতা হইল না; আনন্দীবাঈ দুরন্ত ব্যাধির পীড়নে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। অনেক প্রকার ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা হইল। কোনও ঔষধেই স্থায়ী উপকার হইল না। গোপালরাও একেশ্বর-বাদী হইলেও এসময় আনন্দীবাঈর জন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন, শান্তি শিব পূজা প্রভৃতি দৈব উপায়ের অবলম্বনেও বিরত হইলেন না। আনন্দীবাঈর অসুস্থতার বার্ত্তা অবগত হইয়া প্রত্যহ বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সংবাদ পত্রে তাঁহার শারীরিক অবস্থার সংবাদ প্রায় প্রত্যহই প্রকাশিত হইত। মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় এই দুঃসময়ে আনন্দীবাঈর চিকিৎসাদির জন্য স্বীয় শক্তির অধিক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

বহুদিন বিদেশে থাকায় স্বদেশীয় অন্নব্যঞ্জনাদির দর্শন লাভ আনন্দীবাঈর পক্ষে দুর্ঘট হইয়াছিল। তিনি আমেরিকায় অবস্থান কালেই তাঁহার দেশীয় অন্নব্যঞ্জন সেবনের প্রবল স্পৃহার বিষয় তাঁহার শাশুড়ীকে একটী পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। অসুস্থ হইবার পর হইতে তাঁহার সে স্পৃহা অতীব বলবতী হইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরও ডাক্তারদিগের নিষেধ-বশেও পথ্যানুরোধে আহারাদির বিষয়ে তিনি নিতান্ত সংযত ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার সে সংযম বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার জীবনের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়ায় তাঁহার জননী কয়েক দিবস তাঁহাকে মনোনীত অন্নব্যঞ্জনাদি সেবন করাইলেন। গোপালরাও বলেন, ইহাতেই আনন্দীবাঈর ব্যাধি অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। পরিশেষে একজন কবিরাজ তাঁহাকে যে ঔষধ সেবন করিতে দেন। তাহার পথ্যস্বরূপ জলপান নিষিদ্ধ করিয়াছিল। ঐ ঔষধ সেবন কালে একদিন আনন্দীবাঈ তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া ছট ফট্ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপরীত ফললাভের ভয়ে কেহই তাঁহাকে জল দিতে সাহসী হইল না। তিনি দ্বাদশঘণ্টা কাল তৃষ্ণার যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া নিতান্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোপাল রাও স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই হতাশ হইয়াছিলেন। আনন্দীবাঈ তাঁহাকে বাঁচিবেন বলিয়া বারবার আশ্বাস দান করিতেন। কিন্তু তাঁহার সে দিনকার অবস্থা দেখিয়া গোপালরাওয়ের মনে হইল যে, বুঝি জলাভাবেই শেষে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রাণান্ত ঘটিবে। এই ভাবিয়া ও আনন্দীবাঈর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলদান করিলেন। জল পান করিয়া রোগিনীর সুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাকুলতার সহিত শরীরের উত্তাপ হ্রাস পাইতে লাগিল।

কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম ভাগ। শ্রাবণ, ১৩০৮। সপ্তম সংখ্যা।

বালিকার ভুল।

সংসার বন্ধুর পথে দীর্ঘ পর্য্যটনে
হয়ে থাকে যদি গো কখন
চরণ স্খলিত ও'র, তা বলে কি ও'রে
তুলিবেনা ? রহিবে অমন ?

অস্ফুটন্ত কলিকাটি যাবে পায়ে দলে ?
একবার চাহিবেনা ফিরে ?
তোমাদের অবজ্ঞায় একটি জীবন
ভেসে যাবে অকূল পাথারে ?

আঁধার গুহায় ঘন বিষাদের ঘোরে,
সঙ্গে লয়ে ম্লান অশ্রুকণা,
কেমনে কাটিবে ওর দীর্ঘ নিশিথিনী,
দীর্ঘ দিবা আঁধারে মগনা ?

উহার আঁধার ক্ষুদ্র হৃদয় কুটীরে
কেহ দীপ জ্বালিবে না আর ?
ও'র লাগি এ নিখিলে নাহি প্রসারিতে
দুটি কর স্নেহ মমতার ?

ও'র তরে উঠিবেনা একটি নিশ্বাস,
আঁখি কোণে দুটি অশ্রুধার ?
শুধু নিমেষের ভুলে গিয়েছে ফুরায়ে
জীবনের সকলি উহার ?

ও'র সুখ-সাধ ওরে গিয়াছে ফেলিয়া
জ্বালাময়ী অশান্তির পাশ ;
রেখে গেছে ও'র তরে উপেক্ষা লাঞ্ছনা
মর্ম্মভেদী তীব্র উপহাস।

হায় ! মানুষের মন হ'তে পারে কভু
শিলা সম এত কি কঠিন ?
একটি বালিকা ক্ষুদ্র তার অপরাধে
হ'তে পারে এত ক্ষমাহীন ?

নাইবা ক্ষমিল, ও'র কিবা আসে যায় ?
এস মোরা ক্ষমিব উহারে ;
প্রদীপ জ্বালিয়া দিব পথ দেখাইয়া,
উঠাইব দুটি করে ধরে।

স্নেহের অঞ্চল দিয়ে দিব মুছাইয়া
অশ্রু-সিক্ত দুটি ম্লান আঁখি ;

পূত গঙ্গোদকে পাপ দিব ধুয়াইয়া,
এস মোরা ও'র কাছে থাকি।

আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে দেবো ও'রে স্থান,
দিব কত মমতা যতন।
ধরমের সমুজ্জল পূত শুভ্র বাসে
ম্লান দেহ হবে আবরণ।

তুচ্ছ সে দশের কথা কিবা আসে যায়?
সে তো ক্ষুদ্র, কোথা যাবে চলি।
তা'বলে কি স্রোতোমুখে যাইবে ভাসিয়া
বিধাতার স্নেহের পুতলি?

শ্রীসরোজিনী দেবী।

মহারাণীর নারীত্ব।

সুবিস্তীর্ণ বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৬৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া গত ২২এ জানুয়ারী সায়াংকালে বিধাতার বিধানে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার অগণ্য প্রজাপুঞ্জ শোকে অভিভূত হইয়াছিল। সেই মহাশোক বঙ্গান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কোমলপ্রাণা পাঠিকাগণের হৃদয়ও স্পর্শ করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কারণ মহারাণী ভিক্টোরিয়া আমাদের দেশের কেবল রাণী ছিলেন না, তিনি আমাদের জননী স্থানীয়া ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে আমাদের দেশের কত যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; আমাদের রমণীগণের অবস্থাও অনেক উন্নত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয় অতি কোমল ছিল। নারী-জাতির মধ্যে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। আজ তিনি নাই, কিন্তু চিরকাল লোকে তাঁহার শত শত গুণের কথা মনে করিবে, রমণীর আদর্শরূপে তিনি নারীর হৃদয়ে চিরদিন বিরাজ করিবেন। আমরা পাঠিকাদিগকে মহারাণীর কয়েকটি অসামান্য গুণের কথা শুনাইব। তাহা হইতেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, মহারাণী আমাদের দেশের অধিশ্বরী হইয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী ছিলেন, তাহা নহে। তিনি যদি সামান্য রমণীও হইতেন, তাহা হইলেও চরিত্র-গুণে তিনি সকলের সম্মান আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তাঁহার মহচ্চরিত্রে সাধারণের অনেক শিক্ষার বিষয় ছিল। সে চরিত্র সম্পূর্ণরূপে অনুকরণীয়। তাঁহার নারীত্ব অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাণীত্বকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

মহারাণীর মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। মাতৃত্ব তাঁহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এই মাতৃভাব রূপ-যৌবনের প্রতি অন্ধ অনুরাগ হইতে তাঁহার হৃদয়কে সাবধানে রক্ষা করিয়াছিল। ইংলণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রূপাভিমানিনী রমণী স্ব স্ব পুত্র কন্যাকে স্তন্য দানে বিরত থাকেন, ধাত্রী-ক্রোড়ে শিশু প্রতিপালিত হয়। রাজরাজেশ্বরীর সংসারে ধাত্রী বা পরিচারিকার অভাব ছিল না, কিন্তু রমণীকুলের শিরোভূষণ হইয়াও তিনি প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণকে কোন দিন তাঁহার স্তন্য-সুধা হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। সামান্য রমণীর ন্যায় তিনিও সযত্নে সন্তান পালন করিতেন।

ভারতেশ্বরীর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার সে দয়া, সে করুণা পৃথিবীর পদার্থ নহে, যেন তাহা স্বর্গের মন্দাকিনী-স্রোত,--স্বচ্ছ, পবিত্র, তৃপ্তিকর, কোন প্রকার নীচতা, হীনতা বা সঙ্কীর্ণতা তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না। যে তাঁহার ক্ষতির চেষ্টা করিয়াছে, মহারাণী তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। যে তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছে, তাহার প্রতিও মহারাণী বিন্দুমাত্র বিরাগ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার করুণার একটা গল্প আছে। গল্পটি পুরাতন, কিন্তু তাঁহার নারী হৃদয়ের মহত্ত্বের অবিনশ্বর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ রক্ষিত হইবার যোগ্য।

ইংলণ্ডের একজন সৈনিক যুবক সৈন্যদল ছাড়িয়া পলায়ন করে। উপর্য্যুপরি কয়েকবার এইরূপ পলায়ন করায় বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, এবং যথা সময়ে সেই আদেশ পত্র মহারাণীর স্বাক্ষরের জন্য তাহার প্রাসাদে প্রেরণ করা হয়। একজন লোকের

প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হইবে শুনিয়াই মহারাণীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, হৃদয়ে তিনি গভীর বেদনা পাইলেন, কাগজখানি হাতে লইয়া কত কথা ভাবিলেন, কিন্তু কিছুতেই সে কঠিন কথা লিখিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি তাঁহার একজন প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহা, এই হতভাগ্যের পক্ষে কি কিছুই বলিবার নাই?" কর্ম্মচারী বলিলেন, "লোকটা বড় অবাধ্য, বার বার সেনাবারিকের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, মৃত্যুই উহার উপযুক্ত দণ্ড।"—মহারাণী আবার গদ-গদকণ্ঠে বলিলেন, "ইহার কি কোনই সদ্গুণ নাই?"—কর্ম্মচারী অনেক চিন্তার পর বলিলেন, "শুনিয়াছি সে তাহার পত্নীকে অত্যন্ত ভালবাসে, গৃহ-ধর্ম্মে তাহার অনুরাগ আছে।"—স্নেহ, করুণা ও সহানুভূতিতে মহারাণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে, আনন্দমনে, সেই আদেশ পত্রের উপর লিখিলেন, 'ইহার অপরাধ ক্ষমা করিলাম।" এইরূপে মহারাণী কত অপরাধীর প্রাণ দান করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

এই মধুর নারীভাব শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া চিরজীবন তাঁহার চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। যখন তিনি পাঁচ বৎসরের বালিকা মাত্র, সে সময়েও তাঁহার হৃদয় অনাথা দুঃখিনীগণের দুঃখে বিগলিত হইত। এই বয়সে তিনি কত অনাথাকে সাহায্য দান করিয়াছেন! কিন্তু তিনি সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, যাহাকে দান করিতেন, সে ভিন্ন অন্যে তাহা জানিতে পারিত না। তাঁহার দান স্বর্গের সুনির্ম্মল শিশির বিন্দুর ন্যায় বর্ষিত হইত, কেহ সে বর্ষণ দেখিতে পাইত না, কিন্তু অনাহারে কাতর দরিদ্রগণ হেমন্তের নৈশ-শিশির-পুষ্ট লতা-পত্রের ন্যায় তদ্দ্বারা উপকৃত হইত।

মহারাণী কাহারও চরিত্রে কোন মহৎ গুণ দেখিলে তাহা ভুলিতে পারিতেন না, এবং সাধ্যানুসারে সেই সদ্গুণের পুরস্কার করিতেন। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। বস্ত্রালঙ্কারের প্রতি সকল দেশের রমণীই কিছু অধিক পক্ষপাতী। 'সখী'র সহৃদয়া পাঠিকাগণ আমাদের উপর রাগ করিবেন না। আমরা জানি, কি এদেশ কি বিলাত, সর্ব্বত্রই সধবা রমণীগণ অনেক স্থলে বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীর প্রতি এক আধটু পীড়াপীড়ি করেন। অবশ্য তাঁহাদের সে অধিকার আছে বলিয়াই করেন। সাধ্য হইলে স্বামী কখনও স্ত্রীর সঙ্গত আব্দার অগ্রাহ্য করেন না, কিন্তু অসঙ্গতি নিবন্ধন তাহা পূর্ণ করা কঠিন হইলে স্বামী হৃদয়ে বেদনা পান মাত্র। ইহাতে স্বামী কি স্ত্রী কাহারও মনে সুখ থাকে না। যাহা হউক, আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীর নিকট "অমুক জিনিষটা চাই" এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, কিন্তু বিলাত পূর্ণ স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, সেখানে স্ত্রী স্বামীর কাছে প্রার্থনা না করিয়াও, পছন্দমত জিনিষ স্বামীর নামে খরচ লিখাইয়া স্বয়ং দোকান হইতে কিনিয়া আনিতে পারেন, অনেকে আনেনও। স্বামীর অবস্থা মন্দ হইলে তাঁহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। বিলাতে অনেক মেয়ে দোকান হইতে এইভাবে বস্ত্র ও অলঙ্কার ক্রয় করেন।

মহারাণী একদিন কোন একটি দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য একজন হীরক ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়াছিলেন। অবশ্য প্রচ্ছন্ন বেশেই গিয়াছিলেন। দোকানে গিয়া দেখিলেন, একটি সুন্দরী ইংরাজ মহিলা একগাছি বহুমূল্য হার দর করিতেছেন। হারের দাম শুনিয়া রমণী তাহা দোকানের কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার স্বামী এত বড় লোক নহেন, যে আমি এই হার কিনিতে পারি।"—মহিলাটির সেই হার বড় পছন্দ হইয়াছিল, অন্য মেয়ে হইলে স্বামীর অবস্থার প্রতি দৃকপাত না করিয়া হার কিনিয়া ফেলিত, এবং স্বামীকে ঘোর বিপন্ন করিত, কিন্তু সেই রমণী তাহা করিলেন না দেখিয়া মহারাণীর মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঞ্চার হইল। মহারাণী স্বয়ং হার ক্রয় করিয়া, একখানি পত্র লিখিয়া সেই রমণীর নিকট উপহার পাঠাইলেন। মহারাণীর হৃদয় এত কোমল ছিল!

ভারতেশ্বরীর অনেকগুলি গৃহ-পালিত পশু পক্ষী ছিল। তাহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও যত্নের কথা শুনিলে, সরলতার ছবি, আশ্রম-পালিতা লাবণ্যময়ী শকুন্তলার কথা

মনে পড়ে। অভিষেকের আনন্দোৎসবের মধ্যে, রাজবেশ ও রাজমুকুটে পরিশোভিত থাকিয়াও, যেমনি তাঁহার ক্ষুদ্র কুকুর ড্যাস্‌কে কাতরভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে দেখিলেন, অমনই তাঁহার হৃদয়ের করুণা শত ধারায় উৎসারিত হইয়া তাহার দিকে প্রবাহিত হইল। তিনি বলিলেন, "ঐ আমার ড্যাস্, এখনও ও স্নান করে নাই, আমি ওকে স্নান করাইয়া দিব।"—সে স্বর মাতার কণ্ঠেরই উপযুক্ত। তাঁহার আশ্রয় হইতে কোন পশু পক্ষী কখন বিতাড়িত হয় নাই।

মহারাণীর অপত্য-স্নেহ অত্যন্ত অধিক থাকিলেও তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে কখনও অত্যধিক আদর দেন নাই। আমাদের বাঙ্গালাদেশের ধনীর গৃহে মহারাণীর এই ব্যবহার আদর্শরূপে বিরাজিত থাকিবার যোগ্য; কারণ এদেশের অনেক বড় লোকের ছেলে মেয়ে মা ও পিসিমার আদরেই নষ্ট হইয়া যায়। একদিন মহারাণীর দুই কন্যা দাসীর সহিত বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাহার মুখে ও কাপড়ে রং লাগাইয়া দেয়। দয়াবতী মহারাণী তৎক্ষণাৎ কন্যাদ্বয়কে আহ্বান করিয়া দাসীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বলিলেন। কেবল তাহাই নহে, নিজের টাকা দিয়া দাসীর পোষাক কিনিয়া দিবার জন্য কন্যাদ্বয়কে আদেশ করিলেন। একবার তাঁহার কোন পুত্র একটী গরিবের ছেলের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। ছেলেটি গরিব হইলেও দুর্ব্বল ছিল না। সে রাজপুত্রকে প্রহার করিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারিগণ বালকটিকে ধরিলে, মহারাণী তাহাকে মিষ্ট বাক্যে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ন্যায়ের প্রতি কি শ্রদ্ধা!

তাঁহার এক ভৃত্য কিছু আধিপত্যপ্রিয় ছিল, এমন কি সে কখন কখন মহারাণীর হুকুমের উপরও হুকুম চালাইত। রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু মহারাণী তাহাকে সর্ব্বদা স্নেহের আশ্রয়ে রাখিতেন। তাঁহার করুণা জাহ্নবী-স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত ছিল।

মহারাণী কত দিন কত আহত ও পীড়িত সৈনিকের নিকট উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। রোগ শয্যা-শায়িনীর নিরানন্দময় শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার মনে শান্তি দান করিতে কখন তিনি কুণ্ঠিত হন্ নাই।

আমাদের দেশের অনেক সম্রান্ত মহিলা দয়ার পাত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু মহারাণী, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়াও, দয়া প্রকাশে কখন কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি শীতার্ত্তদিগকে শীত বস্ত্র দান করিতেন, রোগার্ত্ত দরিদ্রদিগকে আশ্রয় দিতেন। পৃথিবীতে যাহার আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, অর্থ নাই, কেহ নাই, কিছু নাই, তাহারা স্বদেশের জননী-স্বরূপিণী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আশ্রয়ে আসিয়া ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, রোগের ঔষধ লাভ করিত।

আমরা পত্রান্তর (১) হইতে মহারাণীর সহৃদয়তা ও সমবেদনার একটি চিত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"কোন দরিদ্র ধর্ম্ম যাজকের কন্যা মহারাণীর পুত্রকন্যাগণের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্মপ্রাপ্তির কয়েক দিবস পরে শিক্ষয়িত্রীর জননী রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি পদ-ত্যাগ করিয়া মাতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। মহারাণী বলিলেন, 'যত দিন আবশ্যক, তুমি মাতার সেবা কর; তোমার পদত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার অনুপস্থিতি কালে আমি ও এলবার্ট তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।' কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে শিক্ষয়িত্রী মাতার সেবা করিতে গেলেন, মহারাণী ও তাঁহার স্বামী শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে লাগিলেন। এ করুণার তুলনা নাই।"

"এক বৎসর শিক্ষয়িত্রীর মাতার মৃতাহ উপস্থিত হইল। তিনি সেদিন রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে বাইবেল পড়াইতেছিলেন। পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার মাতৃশোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মাতৃহারা কন্যা উচ্চৈঃস্বরে 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নিকট মহারাণী এই সংবাদ অবগত

(১) প্রতিবাসী, ২২এ মাঘ—১৩০৭ সাল।

হইয়া শিক্ষয়িত্রীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'বৎসে! আজ তোমাকে অবকাশ দিব সঙ্কল্প করিয়াছি। যাও, আজ আমি তোমার কাজ করিব। আজ তোমার মাতার মৃতাহ। তোমাকে শোকচিহ্ন স্বরূপ এই বলয় ও তোমার মার কেশ রক্ষার জন্য এই লকেট উপহার দিতেছি।" এমন দেবোচিত সমবেদনায় কাহার হৃদয় বিগলিত না হয়?

মহারাণী এই সকল সদ্‌গুণের জন্য নারীজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের গুণে তিনি রমণীকুলের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকবার আমাদের মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই আমরা তাঁহার প্রতি এত শ্রদ্ধাবান্।

পতি-প্রেম তাঁহার হৃদয়ের অবলম্বন স্বরূপ ছিল। ঈশ্বর-ভক্তি তাঁহার জীবনকে পাপ প্রলোভনের উপরে রাখিয়াছিল। সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়াও তাঁহাকে সুদীর্ঘ জীবনের বহু শোকতাপ সহ্য করিতে হইয়াছে। করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গলেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তিনি সে সমস্তই নীরবে সহ্য করিয়াছেন। উপযুক্ত পুত্র, কন্যা, পৌত্র প্রভৃতি অনেকে তাঁহার স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কোন দিন শোকে অধীর ও আত্মহারা হন নাই, তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্যের প্রতি কোন দিন অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। ইহাই মহত্ব! অবলা নারী যে শোকে ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই শোককে তিনি জীবনের অবলম্বন ও বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান জ্ঞানে গ্রহণ করিলেন।

মহারাণীর পাতিব্রত্য অতুলনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্য যৌবনে তিনি প্রিয়তম স্বামী হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী দেবতার ন্যায় ছিলেন। সকলের অদৃষ্টে এমন স্বামী লাভ হয় না। রূপে গুণে তিনি মহারাণীর উপযুক্ত ছিলেন। সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র-বিদ্যা, বিজ্ঞান সকল বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। মহারাণী সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। একবিংশতি বর্ষকাল সুমধুর দাম্পত্য-জীবন সুখ-স্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া, যে দিন মহারাণীর হৃদয়ের আনন্দ ও চক্ষের আলোক সহসা কালের এক নিশ্বাসে নির্ব্বাণ হইয়া গেল, সে দিন তাঁহার সান্ত্বনা লাভের কি কোন উপায় ছিল?—তথাপি তিনি সে শোকে ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই, অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে হৃদয় সংযত করিয়া সুদীর্ঘকাল বিধবার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রাণাধিক প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুর দিন হইতে সকল সাজ সজ্জা, সকল বিলাস বাসনা, সমস্ত প্রমোদ উৎসব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামীর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ একটি অঙ্গুরী তাঁহার অঙ্গুলীতে ছিল। প্রাচীন বয়সে তাঁহার দেহ স্থূল হওয়ায় সেই অঙ্গুরী অঙ্গুলীতে অত্যন্ত আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছিল, তবুও তিনি তাহা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বৈধব্য জীবনের এমন একটি দিনও যায় নাই, যে দিন মহারাণী তাঁহার পরলোকগত পতির আত্মার মঙ্গল কামনায় করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়াছেন।

নারীর সমস্ত সদ্‌গুণ মহারাণীর পবিত্র জীবন অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার জীবনে নারীত্ব ও মাতৃত্ব যুগ্ম কমলের ন্যায় বিকশিত ছিল; কোটী কোটী প্রজার জননী হইবার যোগ্যতা তাহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

তাই আজ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমন-সংবাদে ভক্ত প্রজাপুঞ্জ গভীর শোকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে মানব সমাজ হইতে একটী আদর্শ নারী-চরিত্রের তিরোভাব হইয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অদ্ভুত কলসী।

(উপকথা)

একদিন একটী বালিকা ঘড়া লইয়া নদীতে জল আনিতে গিয়াছিল। বালিকাটীর নাম হেমলতা। হেম জল লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, যে এক বুড়ী গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া আছে। বুড়ীর পীঠে একটা প্রকাণ্ড বোঝা, এবং তাহাকে দেখ্‌লেই পরিশ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। বুড়ী বালিকা-

টীকে জল লইয়া যাইতে দেখিয়া বলিল,"হ্যাগা, মা, আমায় একটু জল দেবে? আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।" হেম বলিল,"আচ্ছা, তুমি হাত পাত, আমি জল ঢেলে দেই।" এই বলিয়া তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিল। বুড়ী জল খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বলিল, "যেমন তৃপ্ত কর্‌লে, মা, তেমনি তৃপ্ত থেক!" হেম জল লইয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছে, এমন সময় একটা কুকুর জল দেখিয়া তাহার চারিদিকে লাফালাফি করিতে লাগিল। হেম বুঝিতে পারিল যে, সে তৃষ্ণার্ত্ত। তাকেও জলদিল। হেম আবার আসিতেছে, এমন সময় দেখিল যে, কতকগুলি ছেলে রোদে লুকাচুরি খেলিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া হেম বলিল, "হ্যাঁরে তোরা জল খাবি? তোদের কি তেষ্টা পেয়েছে?" বালকেরা সকলেই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,"খাব, খাব, বড় তেষ্টা পেয়েছে।" হেম বলিল, "তোরা হাত পাত, আমি জল দেই।" এই বলিয়া সকলকেই জল খাওয়াইল। বালকেরা জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বলিল,"ভাই, আমাদের সেই ফুলের তোড়াটী ইহাকে দেই।" বলিতে না বলিতে একটী ছোট ছেলে দৌড়িয়া গিয়া একটী সুন্দর ফুলের তোড়া আনিয়া হেমলতার হাতে দিল। হেম তাহা লইয়া, ছেলেটীর গালে একটী চুমো দিয়া, পুনরায় নদীতে জল আনিতে গেল। যাইতে যাইতে দেখিল, এক স্থানে কয়েকটী বেলের গাছ জলাভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। হেম ঘড়ার অবশিষ্ট জলটুকু সেই গাছ গুলিতে ঢালিয়া দিল। তার পর নদীতে আসিয়া ঘড়াটী সবে ডুবাইয়াছে এমন সময় সে শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। চাহিয়া দেখিল, একটী দেবকন্যা! তিনি হেমকে বলিলেন,"হ্যাগা, তুমি যে আবার জল নিতে এলে? এইমাত্র যে জল নিয়ে গেলে?" হেম বলিল "আমি—" দেববালা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "তা আমি সব জানি, তোমার আর কিছু বল্‌তে হবে না, তোমার মত ভাল মেয়ে আমি কোথাও দেখি নাই। আমি তোমাকে কয়েকটী বর দিব।" এই বলিয়া তিনি কয়েকটী মন্ত্র পড়িয়া হেমকে বলিলেন, "তুমি যখন যে বস্তু ইচ্ছা করিবে এই কলসীটী তাহাতেই পূর্ণ হইবে।" এই কথা শুনিয়া হেম ভক্তিভরে দেবকন্যাকে প্রণাম করিল। পরে জল লইয়া কলসীটী কাঁকালে তুলিবে এমন সময় দেবকন্যা বলিলেন, "তোমার আর কলসীটী বয়ে নিয়ে যেতে হবে না, ও আপনিই তোমার ঘরে যাবে।" এই বলিয়া তিনি একটী আঙুল দিয়া কলসীটী
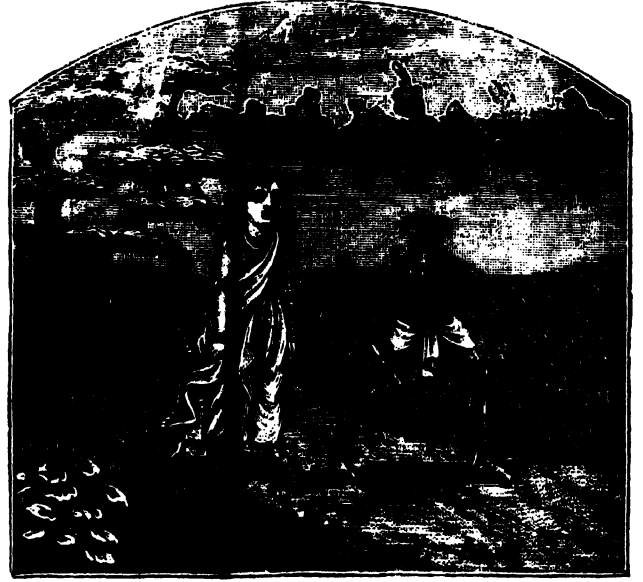
ছুঁইলেন, অমনি সহসা তাহার দুইখানি হাত ও দুইখানি পা বাহির হইল। তখন সে হেমকে বলিল, "দিদিঠাক্‌রুণ, বাড়ী চল, অনেকক্ষণ ঘাটে এসেছ!" হেম শুনিয়া অবাক! দেবকন্যা হাসিতে হাসিতে হেমকে বলিলেন, "যদি তুমি কখনও বিপদে পড়, তবে এই কলসীই তোমাকে উদ্ধার কর্‌বে।" এই বলিয়া তিনি সহসা অন্তর্দ্ধান হইলেন। হেম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল, কলসীও তার পিছে পিছে চলিল! রাস্তায় হেম ভাবিতে লাগিল,"পাড়ার লোকে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে নিশ্চয়ই ভয় পাবে। আমার মা বাপই বা কি ভাব্‌বেন? কলসী যেন তাহার মনের কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, "সে বিষয় তোমার ভাব্‌বার প্রয়োজন নাই, তাঁরা আমায় দেখে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন।" রাস্তায় হাত পা ওয়ালা কলসীকে দেখিয়া লোকে ভয়ে পলাইতে লাগিল। তখন বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছিল। গ্রামের জমীদার

বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি খুব সাহসী পুরুষ বলিয়া খ্যাত, কিন্তু এই অদ্ভুত কলসী দেখিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথার টুপি, হাতের ছড়ি—সব কোথায় পড়িয়া গেল। অবশেষে হেম বাড়ী আসিল। তাহাদের ঘরের মধ্যে যেখানে কলসী থাকে, দেখিতে দেখিতে কলসী আপনা হইতে সেখানে গিয়া বসিল, এবং হাত পা পেটের মধ্যে টানিয়া লইয়া যেমন কলসী তেমন হইল। সুতরাং জমীদারের মুখে কলসীর হাত পায়ের কথা শুনিয়া, যে সকল গ্রামের লোক তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা কিছুই অদ্ভুত দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল। রাত্রে হেম তার বাপ মার কাছে কলসী সম্বন্ধে সকল কথা বলিল। তাঁহারা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং দেবকন্যাকে উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

পরিদিন খুব ভোরে কোন একটা শব্দ শুনিয়া হেমের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার বোধ হইল, কে যেন ঘর পরিষ্কার করিতেছে। হেম তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া দেখে, কলসী ঝাঁটা লইয়া সমস্ত ঘর পরিষ্কার করিতেছে। হেমকে দেখিয়া সে বলিল, "একি! তুমি এখনই উঠে এলে কেন? যাও ঘুমাও গে। তোমার কোন কাজই কর্‌তে হবে না, ঘর সংসারের সমস্ত কাজই আমি কর্‌ব।" হেম ইহা শুনিয়া আনন্দে আবার ঘুমাইতে গেল। সমস্ত দিন গেল। রাত্রে হেমের সঙ্গে কলসীর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। হেম বলিল, "আমি পড়্‌তে বড় ভালবাসি, কিন্তু আমাদের সেরূপ অবস্থা নয় যে বই কিনে পড়ি।" ইহা শুনিয়া কলসী বলিল, "তার জন্য ভাবনা নাই, কাল সকালে অনেক ঘটি বাটি জোগাড় করিও, আমি তাহা দুধে পূরে দেব। তুমি সেই দুধ হতে মাখন তোয়ের করে বিক্রী করো, তা হলেই অনেক পয়সা হবে; সেই পয়সা দিয়ে তুমি বই কিনো।" প্রাতে হেম তাহাদের সমস্ত বাসন এবং অপর বাড়ী হইতেও কয়েকটী ঘটি আনিল। কলসী সেগুলি দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া দিল। তার পর হেম একজন কৃষকের ঘর হইতে একটী মাখন-তোলা চর্‌কি আনিয়া মাখন তুলিয়া বিক্রয় করিতে গেল। বাজারে যাইতে যাইতে তাহার সমস্ত মাখন উঠিয়া গেল। হেম হাতে অনেক পয়সা লইয়া বাড়ী ফিরিল। প্রতিদিন এইরূপে মাখন বিক্রী করিতে করিতে তাহারা বেশ ছোট খাট বড় মানুষ হইয়া উঠিল।

হেমের বয়স ১১ বৎসর। বিবাহের সময় হইয়াছে দেখিয়া তাহার পিতা একটী সুশ্রী যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের রাত্রে কলসীর কতই আমোদ, ধিনিক্ ধিনিক্ করিয়া কেবল নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর বরযাত্রিদিগের জন্য কত প্রকার সুখাদ্য তৈয়ার করিয়া দিতে লাগিল!

পরে হেম শ্বশুর বাড়ী গেল। কলসীও তাহার সঙ্গে চলিল। হেম শ্বশুর বাড়ী আসিয়া দেখে যে, তাহার স্বামী একজন রাজা। সেখানে কত দাস, দাসীতে তাহার সেবা করিতে লাগিল। হেমের কলসী প্রতিদিন সদর দরজায় দাঁড়াইয়া সমাগত ভিক্ষুকদিগকে সুখাদ্য দিতে লাগিল। লোকে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং হেমের নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তাহারা তাহার দয়া-গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। হেমের সুখ দেখিয়া তাহার বাপের বাড়ীর গ্রামের কতক গুলি কুলোকের অত্যন্ত হিংসা হইল। কিসে তাহার অনিষ্ট করিবে, সেই চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা হেমের নামে এক ভয়ঙ্কর কলঙ্ক রটনা করিল। নির্ব্বোধ রাজা তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া হেমকে কারাগারে দিলেন। দুঃখে হেম অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিল। রাত্রে যখন সকলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, সেই সময়ে কলসী চুপে চুপে কারাগৃহের দরজা খুলিয়া হেমকে বলিল, "এস আমরা পালাই।" হেম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কলসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। অনেকদূর গিয়া যেমন একটী ছোট নদী পার হইবে, অমনি দেখিল কয়েকজন সৈনিক পুরুষ তাহাদের ধরিতে আসিতেছে। তাহা দেখিয়া হেম ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেমের কান্না শুনিয়া কলসী বলিল, "ভয় কি, আমি ওদের তাড়া দিচ্ছি।" এই

বলিয়া সে নদীর ধারে গিয়া এমনই জল ঢালিতে লাগিল যে নদীতে অগাধ জল হইল। সৈনিকেরা নদী পার হইতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল। তারপর হেম তাহার বাপের বাড়ী গেল।

একদিন সকালে হেম ও কলসী তাহাদের ফুলবাগান পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় কলসী বলিয়া উঠিল, "আজ আমাদের বাড়ী একজন লোক আসিবে, আমি তার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি, তুমি আর একটু পরেই তাকে দেখ্‌তে পাবে।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন পুরুষ সেই বাগানে প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে হেমকে দেখিতে পাইয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই লোকটী আর কেহ নহে, হেমের স্বামী। হেমের পলায়নের পর তাহার নির্দ্দোষিতা বিষয়ে প্রমাণ পাইয়া, পাগলের মত হইয়া, হেমের অনুসন্ধানে নানাস্থানে ঘুরিয়া, অবশেষে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি হেমকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্বীয় দুর্ব্যবহারের জন্য বিস্তর পরিতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হেম স্বামীর হাত ধরিয়া গৃহে গেল।

তৎপরে কলসী হেমের নিকট যাইয়া বলিল, "দিদি-ঠাকুরুণ! আমার কাজ শেষ হয়েছে, তোমরা এখন সুখে সচ্ছন্দে ঘরকন্না কর, আমি যাই। যে দেবকন্যা আমাকে তোমার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি এখন আমায় ডাক্‌ছেন। কিন্তু আমি যাবার আগে একটি কাজ করে যাই।" এই কথা বলিয়া, মুখ দিয়া ফোয়ারার মত অনর্গল জল বাহির করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে একটা মস্ত নদী হইয়া গেল, তাহাতে কত সুন্দর সুন্দর নৌকা ভাসিতে লাগিল। তার পর কলসী অদৃশ্য হইল। হেম স্বামী, পুত্র লইয়া ঘরকন্না করিতে লাগিল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নারিকেলের পায়স।*

প্রফুল্ল ও মেজকাকা।

প্রফুল্ল। ও মেজকাকা, মেজকাকা! ঘুমিয়েছেন নাকি?

মেজকাকা। না মা লক্ষ্মী, কেন বল্ দেখি?

প্র। অনেক দিন আমায় নূতন কিছু রান্না শিখান নাই; আজ কিন্তু ছাড়্‌ছি নি!

মে, কা। তুই মা আসিস্ কই? আমার কি আর অবসর থাকে, যে ডেকে বোল্‌বো? তুই কেবল পুতুল খেল্‌বি, তা রান্না শিখ্‌বি কেমন করে?

প্র। হ্যাঁ, আমি আবার পুতুল খেল্‌বো! ইস্কুলের পড়া, সংসারের কাজকর্ম্ম, খোকা খুকীরা,—এদের নিয়েই আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত, অবসর পাই না! আপনিই পাড়ায় পাড়ায় কেবল ঘুরে বেড়ান, না হয় লেখাপড়া নিয়ে থাকেন! ঘুরে বেড়াতেই বা কত পারেন!

মে, কা। হা! হা! বটে! কাজকর্ম্ম নাই, কি করি বল্! যাক্, আজ কি শিখ্‌বি বল্ দেখি।

প্র। আজ একটা নূতন রান্না শিখ্‌বো। ওপাড়ার জামাই বাবুকে তারা নারকেলের পায়েস করে দিয়েছিল, সে খেতে বেশ! নার্‌কেলের আবার পায়েস কি রকম? নারিকেলের ত কেবল নাড়ু, সন্দেশ ও তক্তিই হয় জানি!

মে, কা। কর্‌তে জান্‌লে পায়েসও সেই রকমেই হয়! একই চাল থেকে যেমন ভাতও হয়, খিচুড়ীও হয়, পোলাও হয়, পিঠে পুলিও হয়, সেই রকম আর কি! তা বেশ, নার্‌কেলের পায়েসই আজ হোক্। নার্‌কেল ঘরে আছে?

প্র। হ্যাঁ; সে আমি ছোবড়া ছাড়িয়ে সব ঠিক করে রেখেছি। কুরুনিও একখান রেখেছি।

মে, কা। নার্‌কেলের উপরটা তো বেশ করে চেঁচে নিয়েছ? দুধ আছে ঘরে?

প্র। হ্যাঁ, তা সব ঠিক করা হয়েছে, দুধ আজ ঘরে যথেষ্ট আছে!

মে, কা। বটে, তবে চল্, সেখানেই যাই।

প্র। আসুন্ তবে।—ঐ দেখুন সব ঠিক করে রেখেছি।

---

* এই প্রবন্ধটি পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে নানা-স্থানে পরিবর্ত্তন, সংশোধন এবং পরিবর্দ্ধন করিয়া নূতনভাবে লিখিত হইল। লেখক।

মে, কা। নারকেলটা বেশ করে ধুয়ে ফেল্।—হ্যাঁ, ওই হয়েছে; এখন ওটা ভাঙ্‌তে হবে, তুই তা পারবি না। আমায় দে!

প্র। কত নারকেল ভাঙ্গি, আর এটা পারবো না? বলেন কি?

মে, কা। মা লক্ষ্মী, বুঝে কাজ করতে জানলে কত জিনিস কত দরকারে লাগান যায়; নারিকেল ভাঙ্‌লে তার মালাগুলি ফাটিয়ে তোমরা অকেজো করে ফেল। আর এই দেখ, এম্‌নি করে নারকেলটার ঠিক মাঝামাঝি সরু কোরে ঘুরিয়ে একটা জলের দাগ বেশ করে দিয়ে, পর পর সেই দাগে দাগে কাটারির ধারাল দিক দিয়ে এম্‌নি করে ঠুক্ ঠুক্ করে আস্তে আস্তে ঘা দিতে হয়। খুব আস্তেও নয়, আবার খুব জোরেও নয়; সঙ্গে সঙ্গে নারকেলটা হাতের উপর ঘুরোতে হয়, তা হলে ঐ দাগের উপর কাটারির কোপ্‌টা বেশ বসে' যায়। তারপর এম্‌নি করে দাগে দাগে ঘা দিতে দিতে—এই দেখ কেমন প্রায় সমান হয়ে ভেঙ্গে গেল। এখন চাই কি নারকেল তুলে নিয়ে মালাটা শিলে ঘসে' সমান করে নিয়ে কত জিনিস রাখা চলে।

প্র। তাইত! ক্রমে বেশ গোল হয়েই ভাঙ্‌লো! এ ফন্দি তো মন্দ নয়!

মে, কা। হ্যাঁ, এমনি করে ভাঙ্‌তে শিখিস্। এখন নারকেলগুলো বেশ করে কুরে ফেল্ দেখি। বেশ দুধের মত শাদা যেন হয়, মালার গায়ের কাল কাল গুলো যেন কুরিস্ না।

প্র। আচ্ছা তা করছি;—ওমা, কি হবে? এই তো কাল কাল শেষ কালে পড়্‌লো! এগুলো ফেলে দি?

মে, কা। বাপ্‌রে বড় মানুষী! ফেল্‌তে হবে না গো ফেল্‌তে হবে না। নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থ তো একেবারে অখাদ্য হয়ে যাওয়া নয়। দেখ্‌তে ভাল হয় না, কাল কাল থাকে বলে' অপরিষ্কার হয় তাই নিষেধ করেছিলাম। খাবার জিনিষ—পাথরটা একটু পরিষ্কার হওয়াটা দরকার। কথায় বলে "আগে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারি।" রান্নার বেলায় এটা বড় খাটে। যাহোক, এখন কাল কাল অংশগুলো খুঁটে ফেলে দে। তারপর ওগুলি শিলে করে বেশ করে পিসে ফেল্। বড়ি দেওয়ার ডাল বাটার মত খুব ভাল করে যেন পেশা হয়।

নারকেলগুলো না কুরে, আগে বড় বড় করে তুলে নিয়ে, পাতলা ছুরি দিয়ে ওর পিঠের কাল অংশটা বেশ করে চেঁচে ফেলে দিয়ে, তারপর বেঁটে নিলেও বেশ হয়।

প্র। এই দেখুন্ তো বেশ চন্দনের মত নির্ভাজ বাটা হয়েছে। আমার হাত তো ব্যথা হয়ে গেল! আরও বাঁট্‌বো?

মে, কা। হ্যাঁ। ২॥০ সের কি ৩ সের দুধ নিয়ে আয়, আর কড়াটা, খুন্তিখানা, ৪।৫ খান তেজপাত, তোলা পরিমাণ ঘি, ২।৪টা ছোট এলাচ, একটু দারুচিনি, একটু কর্পূর, এক ছটাক কি আধ পোয়া চিনি; ঘরে যদি পোস্তা কিস্‌মিস্ থাকে তাও কিছু কিছু নিয়ে আয়। পাথরের বাটী কি অন্য পাত্র, ঢাকা দেওয়ার পাত্র ইত্যাদি সব ঠিক করে রাখ্, রাঁধার আগে আবশ্যক মত সব দরকারি জিনিস ঠিক করে বস্‌তে হয়; নতুবা পরে ছুটোছুটি কর্‌তে গেলে রান্না হয় না।

প্র। হ্যাঁ, তাতো আপনি কত দিন বলেছেন। বাড়ীর সকলেও এখন ঠিক হয়েছে।—আমি তো সব আন্‌লাম। এখন কড়া চাপাই?

মে, কা। হ্যাঁ; চাপিয়ে দুধ্‌টা বেশ ঘন করে জাল দে দেখি! সর্ব্বদা তলায় খুন্তি দিয়ে নাড়িস্, যেন তলায় না ধরে কি সর না পড়ে। দুধ কতটা?

প্র। আড়াই সের! হবে না?

মে, কা। হবে না কেন? দুসেরেও হয়, তার কমেও যে হয় না তা নয়। যাহোক্, আড়াই সেরে মন্দ হবে না, ভালই হবে। দেখো দুধের দিকে যেন মন থাকে।

প্র। হ্যাঁ, তা খুব আছে।—দেখুন দুধ তো বেশ ঘন হয়ে এসেছে, মাটীতে ফেললে টোপরের মত দাঁড়িয়ে থাকে; হয়েছে কি?

মে, কা। দেখি?—হ্যাঁ ওই হয়েছে; দুধ কম বেশী অনুসারে জালেরও কম বেশী কর্ত্তে হয়, তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছ।

এখন নারকেল বাঁটাটা ওতে বেশ করে ছড়িয়ে ফেলে দাও; আর বেশ করে নেড়ে দুধের সঙ্গে নারকেল বাঁটাটা মিশিয়ে দাও। এ সময়টা খুব নাড়িও; নতুবা ভাল মিশ্‌বে না, তাল পাকিয়ে যাবে; আবার ধরে যেতেও পারে।

প্র। তা আমি খুব নেড়েছি।—এখন কি কর্ব্বো?

মে, কা। তেজপাতা কখানা ওতে ফেলে দে; পেস্তা, বাদাম, কিসমিসগুলি (যদি থাকে) ওতে ফেল্‌। এলাচ্‌গুলোর খোসা ছাড়াস্‌নি; দারুচিনি টুকু গুঁড়ো করিস্‌নি?—আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি। এই এলাচের দানা কয়টা ওতে ফেলে দে; একটা এলাচ আর দারুচিনিটুকু এখানে বেঁটে ঢেকে রাখ্‌লাম—নইলে গন্ধ উড়ে যাবে। কেমন হচ্ছে বল্‌ দেখি?

প্র। প্রায় থক্‌ থক্‌ কচ্ছে।

মে, কা। তবে ছটাক খানেক কি দেড় ছটাক মত মিষ্টি চিনি ওতে ফেলে নেড়ে দে। কেউ মিষ্টি কম খায়, কেউ বেশী খায়, ওটা ঠিক করা বড় কঠিন; তবে এই পরিমাণেই বেশ। চিনিটা বেশ পরিষ্কার বটে ত? হ্যাঁ, বেশ! চিনি দিয়ে বেশ করে নাড়্‌তে থাক্‌। আমি ঝাঁ করে দেখে আসি একটু আতর আছে কি না।

প্র। তা বেশ।—কাকা দেখুন, হোলো বুঝি। বেশ ফুট্‌তে আরম্ভ হয়েছে।

মে, কা। হ্যাঁ হয়েছে, এখন মশলাটুকু ঘিয়ে মিশিয়ে ওতে দিয়ে দে! অতি সামান্য পরিমাণ কর্পূর গুঁড়িয়ে দে; কর্পূর যেন বেশী পড়ে না, তেতো হয়ে যাবে। হ্যাঁ বেশ! আমি এই এক ফোঁটা আতর দিয়ে দিলাম। এখন ঝাঁ করে বাটীটাতে ঢেলে ফেলে পাথর কি থালা চাপা দিয়ে রাখ্‌!—বাঃ! বেশ চট্‌পটে মা আমার! ঠিক হয়েছে।

প্র। হোয়ে গেল নাকি? এ আবার কঠিন কি?

মে, কা। কঠিন কিছুই নয়! জান্‌লে সব সোজা, না জান্‌লে সবই কঠিন। এখন জুড়িয়ে গেলে খাওয়াই বাকি।

প্র। আচ্ছা, পেস্তা, বাদাম কিস্‌মিস্‌ তো সব সময় থাকে না? ওসব না হলে হয় না?

মে, কা। হবে না কেন মা? শুধু দুধ চিনি, নার্‌কেলেও হয়। একটু কর্পূর দিয়ে নামাইলেই হলো। গরম মসলাও দিলে ভাল, না দিলে ক্ষতি নাই। তাতে যে হয় না তা নয়, তবে আস্বাদের একটু তফাৎ হবে না?

প্র। তা তো হবেই! যাক্‌, শিখ্‌লাম তো!

মে, কা। হ্যাঁ, শিখ্‌লে কিনা বোঝা গেল না। রান্নার কাজ কেবল মনে মনে শিখ্‌লেই ত হয় না, নিজ হাতে করে করে পাকা হওয়া চাই!

প্র। তা তো বটেই। ৫।৭ দিন পর আমি আপনাকে বসিয়ে রেখে একবার রাঁধ্‌বো। তা হলেই ঠিক হবে। কেমন?

মে, কা। হ্যাঁ তা বেশ! দেখ দেখি কেমন হোলো!

প্র। বাঃ! বেশ গন্ধ বেরুচ্ছে গো কাকা! আমি মাদের ডেকে দেখাই গিয়ে।

মে, কা। হ্যাঁ, তা যাও; আমিও একবার ঘুরে আসি।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

দ্রষ্টব্য।—পাঠিকাগণ এই খাদ্যটি প্রস্তুত করিয়া আস্বাদন করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। তাঁহাদের ইহাতে আগ্রহ দেখিলে আমরা মধ্যে মধ্যে এইরূপ নূতন খাদ্য প্রস্তুত-প্রণালী তাঁহাদিগকে উপহার দিব। বলা বাহুল্য, লেখক নিজে এ সব প্রস্তুত ও আস্বাদন করিয়া পরে সাধারণের বিচার জন্য উপস্থিত করিতেছেন। —লেখক।

বীরাঙ্গনা।

আমাদের দেশে নারীর একটি নাম "অবলা"। দেহের সম্বন্ধে এই বিশেষণ প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই কোন দোষ হয় না, কারণ নারী-দেহ যে পুরুষ-দেহ অপেক্ষা অল্পবল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না; কিন্তু নারী-জাতির হৃদয় সম্বন্ধে এই বিশেষণ কদাপি প্রযুজ্য নহে। নারী-হৃদয় যে অতীব বলশালী তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের

ইতিহাসে বিদ্যমান। দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই, কর্ম্মদেবী, সরোজিনী, পদ্মিনী ও অহল্যার নাম কে না শুনিয়াছেন? যতদিন আমাদের প্রাণে বিন্দুমাত্রও বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকিবে, ততদিন আমরা ইঁহাদের নাম হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিব না; বরং সুশিক্ষার ফলে, চরিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ইঁহাদের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে। অদ্য আমরা পাঠিকাদিগকে একটি দূর-দেশবাসিনী অসামান্য-বলশালিনী ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর দিব্য চরিত উপহার দিব। আশা করি, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া অন্তরে অধিকতর বল লাভ করিবেন, এবং ধর্ম্ম হৃদয়ে যে কি মহতী শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে, তাহাও বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পুরাকালে স্পেনের পশ্চিম প্রান্তে ইমারিট্ নামে এক মনোহর নগর বিদ্যমান ছিল। এই নগরে ইউলালিয়া নামে একটি বালিকা ছিলেন। বালিকার যেমনি রূপ ছিল তেমনি গুণও ছিল। সংসারের ধনৈশ্বর্য্য, বিষয়-বিলাস কিছুই তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। বাল্যেই তাঁহার জীবন বৈরাগ্যে ভূষিত হইয়া উঠিল। সামান্য পান, সামান্য ভোজন, সামান্য বস্ত্র পরিধান—ইহাই তিনি ভাল বাসিতে লাগিলেন। আপনাকে স্বর্গধামের যাত্রী জানিয়া তিনি নিরন্তর তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা জীবনে সন্ন্যাসিনী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে স্পেন দেশে খ্রীষ্টানদিগের প্রতি লোমহর্ষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। অত্যাচারে ও নির্য্যাতনে বালিকার হৃদয়ের ধর্ম্মাগ্নি দিন দিন অধিকতররূপে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। অত্যাচার যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তিনি হৃদয়ের দ্বার সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ঈশ্বর সমীপে আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিসেন। শত্রুগণের ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল। পাছে তাহারা তাঁহাদের প্রাণসমা কন্যাকে ধরিয়া হত্যা করে, এই ভয়ে পিতামাতা তাঁহাকে নগর হইতে বহুদূরে আপনাদের পল্লীভবনে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু গোপন-বাস তাঁহার অসহনীয় হইল, প্রাণ দিয়া বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একদিন রজনীযোগে পিতার স্নেহ, মাতার যত্ন, আত্মীয়গণের ভালবাসা—সকলই পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ-গৃহ হইতে বাহির হইয়া, দুর্গম, বিপদসঙ্কুল, কণ্টকাকীর্ণ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, নগরে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কেন তোমরা অকারণে নির্লজ্জের ন্যায় মানবকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিতেছ? বিশ্বাসিগণ, তোমাদের অত্যাচারে ভীত হইয়া, কখনও কি ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করিবেন? কখনই নহে। তোমরা জান আমি কে? আমি একজন খ্রীষ্টান। আমি তোমাদের ধর্ম্ম স্বীকার করি না। এই লও, এই নশ্বর, অকিঞ্চিৎকর দেহকে বিনষ্ট কর। ইহাকে বিনাশ করা সহজ, কিন্তু এই নশ্বর দেহের অভ্যন্তরে যে নির্ম্মল, অবিনশ্বর আত্মা আছে, তোমরা তাহার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না।"

ইহা শুনিয়া বিচারক ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ঘাতককে বলিলেন, "ঘাতক! ইহাকে কেশে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইয়া অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান কর; ও দেখুক, যে দেবগণের ও আমাদের সম্রাটের কি শক্তি আছে!" তারপর ইউলালিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অয়ি অবোধ বালিকে! কেন তুমি বৃথা প্রাণ হারাইতেছ? দেখ, তোমার জন্য কত সুখ-সম্পদ্ রহিয়াছে! কেন তুমি নবীন বয়সে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছ? কেন আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সকলের মনে অসহনীয় ব্যথা দিতে প্রস্তুত হইয়াছ? একবার যদি তুমি দুইটি অঙ্গুলী দিয়া দেবোদ্দেশে কিঞ্চিৎ পূজোপহার অর্পণ কর, তাহা হইলেই আমরা তোমাকে ছাড়িয়া দি। আমাদের অনুরোধ রাখ, তোমার নব ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর।"

ইউলালিয়া, কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া, হঠাৎ সেই অত্যাচারী বিচারকের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন। ঘাতকগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া সবলে তাঁহার শরীরের গ্রন্থি সকল ছিঁড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল, ও বন্য জন্তুর নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া হাড় হইতে মাংস তুলিয়া ফেলিতে

লাগিল। এই দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে ইউলালিয়া এই বলিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন :—

"হে প্রেমময় ঈশ্বর, আমি কখনও তোমার মধুর প্রেমের আস্বাদন ভুলিব না! তোমার নামে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা কি আনন্দের ব্যাপার! তোমার আবির্ভাবে অন্তরে যে অনুপম সুখ সম্ভোগ করিতেছি, তাহার তুলনায়, এই দুর্বিষহ শারীরিক যন্ত্রণাও কিছুই নহে। আশীর্ব্বাদ কর, অনন্তকাল যেন তোমার প্রেমময় ক্রোড়ে স্থান পাই।"

এইরূপে ঈশ্বরের প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ইউলালিয়ার জীবনবায়ু বহির্গত হইল, তাঁহার অপ্রতিম প্রভাসম্পন্ন আত্মা দিব্যধামে চলিয়া গেল!

মানুষ যে ধর্ম্মই অবলম্বন করুক না কেন, যদি সে সরল চিত্তে তাহার বিশ্বাসভূমির উপর এই প্রকার দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হইতে পারে, সত্যের জন্য এই প্রকার আত্মত্যাগ দেখাইতে পারে, তবে সে নিশ্চয়ই এক সময়ে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া ঈশ্বরের করুণা উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

প্রকৃতির সম্বোধনে।

১

নাহি তারা নাহি শশী, আকাশে মেঘের রাশি,
চমকে চপলা থাকি উন্মাদিনী প্রায়।
বহে বায়ু স্বন্ স্বনে, মেঘ রাশি তার সনে,
উন্মত্ত হইয়া ছুটে আকাশের গায়।

২

চারিদিক্ অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে আর,
পড়ে বৃষ্টি অনিবার মুষল ধারায়।
আচম্বিতে অকস্মাৎ, ঘোর রবে বজ্রাঘাত,
জলন্ত অসনি পড়ে ধরণীর গায়।

৩

পশু পক্ষী আদি যত, পড়িছে মরিছে কত,
বড় বড় তরু পড়ে প্রচণ্ড বাতাসে।
বালক বালিকা আদি, উচ্চরোলে ভয়ে কাঁদি,
জননীর বুকে উঠে আকুল তরাসে।

৪

ঘর বাড়ী উড়ে চলে; পড়ে গিয়া নদী-জলে,
গভীর গর্জ্জনে মেঘ ছাড়ে হুহুঙ্কার।

মরিছে মনুষ্য কত, বৃদ্ধ যুবা শিশু যত,
চারিদিকে উচ্চরোলে উঠে হাহাকার।

৫

কেন মা প্রকৃতি আজ, পরেছ ভীষণ সাজ?
দেখে ভয়ে কাঁপে প্রাণ তব ও মূরতী।
দাও সতী রণে ভঙ্গ, থামাও চপলা রঙ্গ,
পবনের বেগ ত্বরা কর মৃদুগতি।

৬

দূর হোক্ অন্ধকার, কর দিক পরিষ্কার
ভাতুক জোছনা পুনঃ ভিরয়ে ভুবনে।
তারা-মালা পরি গলে, পুনঃ চাঁদ কুতূহলে,
হাসিয়ে ফুটুক ওই সুনীল গগনে।

৭

হেরিয়ে চাঁদের হাসি, ফুল্ল কুমুদিনী রাশি,
ধীরে ধীরে নাচিবেক মৃদুল বাতাসে।
সুখে চকোর চকোরী, শূন্য পথে যাবে উড়ি,
সুধা-পান-লোভে ওই সুদূর আকাশে।

৮

ফুটাও কুসুম কলি, হেরিয়ে আসিবে অলি,
মধুপান তরে করি মধুর ঝঙ্কার।
আনন্দে ধরিবে তান, পঞ্চমে কোকিল গান,
জগৎ হইবে মুগ্ধ শুনি সেই স্বর।

৯

তাই গো প্রকৃতি সতি! করি আজি এ মিনতি,
ছাড় মা ভীষণ সাজ নিবেদি চরণে।
কর গো অভয় দান, বাঁচুক সবার প্রাণ,
দেখায়ো না আর সতী মূরতী ভীষণে।

শ্রীসরলাসুন্দরী মিত্র।

শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী।

(শেষ প্রবন্ধ)

পরদিন (১৮৮৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে গোপালরাও তাঁহাকে স্বহস্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দীবাঈ বমি করিয়া সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য উদ্‌গিরণ করিয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু স্বামীর হস্তে দুগ্ধ পান করিয়া তিনি তাহা উদ্‌গিরণ করিলেন না। তাহার পর ঔষধ সেবন করিয়া আনন্দীবাঈ কথঞ্চিৎ সুস্থভাবে শয়ন করিলেন। গোপালরাও তিন দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার নিকট হইতে দূরে যান নাই, অথবা চক্ষু নিমীলিত করেন নাই। কিন্তু সে দিন সে সময়ে সহসা অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আনন্দীবাঈর জননীও কন্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। রাত্রি দশটার সময় তাঁহারও নেত্রদ্বয় নিদ্রাভরে অলস হইয়া আসিল। এমন সময় সহসা আনন্দীবাঈ বমি করিয়া "মা গো" শব্দে চীৎকার করিলেন, তাঁহার জননী তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। "আমার দ্বারা যতদূর হওয়া সম্ভব তাহা আমি করিলাম!" এই কয়টি শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ইহাই আনন্দীবাঈর শেষ! জননী দেখিলেন, তাঁহার কন্যার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে! স্ত্রীশিক্ষার যে বিজয় পতাকা এতদিন পাশ্চাত্য জনসমাজকেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছিল, তাহা এইরূপে দুরন্ত কাল কর্ত্তৃক অপহৃত হইল! ভারতবাসীর আশাবৃক্ষে মুকুলিত হইয়া ফল দানের পূর্ব্বেই অকস্মাৎ মৃত্যুর অশনি-সম্পাতে দগ্ধ হইয়া গেল! এই দুর্ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া গোপালরাও ২৮শে ফেব্রুয়ারি শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"মাসী! আজ আমি আপনাকে কি বলিয়া ডাকিব, বুঝিতে পারিতেছি না। আজ আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও শান্তির নিলয়স্বরূপিণী ডাঃ জোশী আজ কোথায়? * * * মৃত্যুর দিবসটা তাহার বেশ সুখেই গিয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়। * * * * সাধারণতঃ সামান্য শব্দেই আমার ঘুম ভাঙ্গে। কিন্তু সেদিন তাহার মৃত্যুকালে আমি এরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম যে,

আমার শ্বশ্রূ ও শ্যালক প্রভৃতি কয়েক জন পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়াও সহজে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারেন নাই! * * *"মরণের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে সে বড় কষ্ট ভোগ করিতেছিল; কিন্তু পাছে আমি হতাশ হই, এই ভয়ে একদিনের জন্যও স্বীয় যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে নাই, বরং সর্ব্বদা প্রফুল্লভাব দেখাইবারই চেষ্টা করিত। এখানে আসিবার পর হইতে সে অতীব ধর্ম্মশীলা হইয়াছিল। ইতর জাতীয় বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে সে আর পূর্ব্ববৎ স্পর্শ করিত না; কারণ হিন্দু সমাজে হিন্দুর ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য, তাহার এইরূপ মত ছিল। তাহার এইরূপ ব্যবহারের জন্য আমার পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে কেহই আমাদিগের সহিত অনাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে নাই। আমরা আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি নাই, তথাপি আমাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আমাদিগকে সহায়তা করিতে আমাদের স্বজাতীয়দিগের মধ্যে কেহই সঙ্কোচ প্রকাশ করেন নাই। অতি গোঁড়া হিন্দুরাও আমার স্ত্রীর সহিত নিতান্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। খৃষ্টান, স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট বা জাতিচ্যুত ব্যক্তির সহিত সাধারণতঃ লোকে যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার সহিত কেহই সেরূপ ব্যবহার করে নাই। তাহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকল ব্রাহ্মণই তাহার অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-ভোজন কার্য্যে উপস্থিত হইয়া নিঃসঙ্কোচে অন্ন গ্রহণ করিতেন। তদ্দর্শনে এদেশের সংস্কারকেরা বিস্মিত হইতেন। তাহার মনস্তুষ্টির জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক, লোকে তাহা সমস্তই করিয়াছিল। সে কিছুদিন বাঁচিলে এ সকলের সার্থকতা হইত! * * * এদেশে বড় লোকেরও যদি কোনও জাতি-বিষয়ক গোলযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহার শব তুলিবার জন্য সহজে লোক পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা মার্কিণ-ফেরৎ হইলেও তাহার শববাহনের জন্য প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল! যথাশাস্ত্র অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহাও নিরাকৃত হইল। যাহা যাহা আবশ্যক, সকলই নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হইল। সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবিত বিঘ্নকে আমরা জয় করিলাম। কিন্তু মৃত্যুর আকস্মিক আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিলাম না!"

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ময়ূরভঞ্জে ব্যাঘ্রের উৎপাত।

(১)

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বত এবং বন সমাকীর্ণ। বালেশ্বর হইতে যে সুবিস্তীর্ণ রাস্তা ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বেই নিবিড় বনভূমি। তাহা সুবৃহৎ শাল, শিশু, গাম্ভার, আবলুস, হরিতকী, আমলকী ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের বৃক্ষে পূর্ণ, আর অবশিষ্টাংশ ঘন-পল্লব-সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ-প্ররোহ-কুঞ্জে সুশোভিত। সুতরাং উভয় স্থলেই ব্যাঘ্র মহাশয়ের আবাস সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কোনও কারণ নাই। একবারকার ঘটনা একজন ভুক্তভোগীর কথায় ব্যক্ত করিতেছি।—ভুক্তভোগী একজন বিশিষ্ট এবং বিশ্বাস্য ব্যক্তি। তিনি বলিয়াছেন;—"একবার জলেশ্বর হইতে শীতকালে প্রাতে আটটার সময় গো-শকটে বারিপদায় রওনা হইলাম। সঙ্গে বস্তুজাত বড় কিছু ছিল না, একটা লাল ও শাদা কাচওয়ালা লণ্ঠন, কতকগুলি তরকারী, জলখাবার, এক ডজন দেশালাই, একটা পোর্টম্যাণ্টো, আর তামাকের আসবাব ছিল, আর ছেলেপিলেদের খেলিবার ভেঁপু বাঁশী একটা, তা ছাড়া শীতোপযোগী লেপ, তোষক, বালিশ ও একখানা ব্যাঘ্রচর্ম্মের মত বিলাতী কম্বল ছিল। আমার শকট চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া বনভূমিকে ঢাকিয়া ফেলিল। রাত্রির প্রথম ভাগে অন্ধকার। গাড়োয়ান গাড়ার তলদেশে কেরোসিনের প্রদীপ যুক্ত লণ্ঠন জালিয়া দিল, আমিও জলযোগ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, ঠিক জানি না, কিন্তু হঠাৎ শরীরের উপর গুরুতর ভার অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ব্যাপার কি? দেখিলাম আমার শকট-চালক তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার

শয্যায় আসিয়া আমার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এবং ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

আমি তখন উঠিয়া বসিয়াছি। জ্যোৎস্নালোকে পথ ও বনভূমি কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত। আমার গাড়ীর সম্মুখে একটা পর্দ্দা হিম বারণের জন্য দেওয়া ছিল। গাড়োয়ান উঠিয়া বসিল এবং জড়িতস্বরে বলিল, "বা-বা-আ-ঘ-অ"। তাহার যেন ধারণা, বড় করিয়া কথা বলিলেই বাঘ তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহার ভাব দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু যে জন্তুর নাম সে আমাকে জানাইল তাহাতে আমার হৃদয়ও যে কম্পিত হয় নাই তাহা নহে। "বাঘ! কি বাঘ? নেকড়ে?" গাড়োয়ান তদুত্তরে যাহা বলিল তাহাতে আমারও প্রায় তাহার অবস্থাই হইয়া পড়িল, কারণ সে বড় বাঘের কথা বলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায়!" গাড়োয়ান বলিল, "রাস্তার উপর!" বলা বাহুল্য গাড়ী তখন স্থির! আমি আস্তে আস্তে পর্দ্দা উঠাইয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলাম না, শেষে একটু বিশেষভাবে নজর করিয়া দেখিলাম, একটি কল্‌ভার্টের এক পার্শ্বে, আমাদের শকট হইতে ২০।৩০ হাত দূরে, একটা ভীষণকায় শার্দ্দুল থাবা পাতিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া আছে। আমাদিগের দিকেই তাহার সম্মুখ। তাহার দেহ ও লাঙ্গুলের পরিমাণ এবং বিশিষ্ট আকৃতি দর্শনে আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। এরূপ অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে মনের যে অবস্থা হইল তাহা আর কি বলিব। গাড়োয়ানকে বিশেষ সাহস ও ভরসা দিয়া গাড়ীখানি ধীরে ধীরে ফিরাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু সে তাহাতে অসম্মত হইল। আমি তাহাকে অধিক অর্থের প্রলোভন দিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। আর এদিকে পুনঃ পুনঃ ব্যাঘ্রের দিকে চাহিতেছি। ব্যাঘ্ররাজ কি ভাবিয়া ক্ষণেক পরে সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দিকেই লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলেন; আমি তো ভাবিলাম, এই বারেই গিয়াছি। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে ভগবান্ একটু বুদ্ধি দিলেন, মনে হইল চিত্র বিচিত্র বিলাতী কম্বলটা জড়াইয়া গায়ে দিয়া থাকি, আর ছোট লাল লণ্ঠনটা জ্বালিয়া কাছে রাখি। যেই চিন্তা, অমনি কার্য্যে পরিণত করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ভেঁপুটা আর দেশালাই এবং বাক্‌সগুলিও কাছে রাখিলাম। গাড়োয়ানের বুদ্ধি শক্তি একেবারে বিলুপ্ত, তাহাকে আমার তোষকটা গায়ে জড়াইয়া গাড়ীর পশ্চাদ-ভাগে বসিতে বলিলাম। সে তাহাই করিল। আমি জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া উদ্দেশে স্ত্রী, পুত্র, পরিজনাদির নিকট একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রেরণ করিয়া, মরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। ব্যাঘ্র হেলিতে দুলিতে আমাদের সমীপবর্ত্তী হইতেছে। কখনও রাস্তার এধারে, কখনও ওধারে, কখনও মধ্যে, এইরূপে দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেছে, কখনও বা দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে আমাদের শকটখানি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। তাহার ভাব গতিক দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ক্রমশই শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল; যা একটু সাহস ফন্দি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, যত ব্যাঘ্ররাজের গতি বিধি এবং ভাব ভঙ্গী দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার সে সব ভুল হইয়া যাইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, চুপ করিয়া এইভাবে নামিয়া পড়ি এবং ধীরে ধীরে বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করি; কিন্তু তাহাতে যে শার্দ্দুলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিব তাহার বিশ্বাস কি? আর বনের মধ্যে যে আমার মস্তক ভক্ষণের অপেক্ষায় দ্বিতীয় যম উপস্থিত নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? ব্যাঘ্ররাজ এক্ষণে ১০।১৫ হাতের মধ্যে আসিয়াছেন, এবং রাস্তার একপার্শ্ব হইতে থাবা পাতিয়া একদৃষ্টে আমাদের শকটের দিকে তাকাইয়া আছেন। আমি দেখিয়াই বুঝিলাম এইবারেই আক্রমণের আয়োজন, আর এক মুহূর্ত্ত পরেই আমার এ জীবনের কর্ম্মবন্ধন কাটিয়া যাইবে। উপায় কি? আমি দৃঢ়মুষ্টিতে লাল লণ্ঠনটি ধরিলাম, ভেঁপুটি সজোরে কামড়াইয়া ধরিলাম এবং শেষ অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম! ক্রমে দেখিলাম শার্দ্দুল সম্মুখের থাবা দুইটি দ্বারা সমীপস্থ মাটি আঁচড়াইতেছে। বুঝিলাম এইবারেই আক্রমণের পালা। দেখিতে দেখিতে তাহার লাঙ্গুল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল,

আমিও অমনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া হঠাৎ পর্দাটি অপসারিত করিয়া লম্ফ দিয়া টাপরের বাহিরে গাড়ীর উপরেই পড়িলাম। সর্ব্বাঙ্গ সেই কম্বলে ও লেপে আবৃত। কম্বল জড়িত, হস্তে উজ্জ্বল লাল লণ্ঠন, মুখে সেই ভেঁপু—অদ্ভুত এক জানোয়ার। বলা বাহুল্য পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এক অমানুষিক হুহুঙ্কার এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেঁপুর উচ্চ শব্দ করা হইয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে আমার এই কার্য্য ঠিক সময়েই হইয়াছিল। শার্দ্দূল হঠাৎ এরূপ অস্বাভাবিক চীৎকার, অপার্থিব মূর্ত্তি এবং অত বড় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চক্ষু একেবারেই প্রত্যাশা করে নাই, সুতরাং সে মধ্য পথে প্রতিহত হইয়া পড়িল, এবং পরক্ষণেই উচ্চ গর্জ্জনে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া একলম্ফে বনের মধ্যে ছুটিয়া গেল। বলদদ্বয় ব্যাঘ্র-গর্জ্জনে ভীত হইয়া ছুটিতে লাগিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে তাহারা গাড়ি লইয়াই ছুটিতে লাগিল, দৈবক্রমে গাড়ী হইতে ছুটিয়া যায় নাই। আমার আর বড় সংজ্ঞা নাই, কম্বল মুড়ি দিয়া লণ্ঠন ধরিয়া পড়িয়া আছি, কি একটা অবসাদ যেন আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। গাড়ী ছুটিয়াছে—কোথায় চলিয়াছে তাহাও দেখিবার অবকাশ আমার নাই। এইরূপে প্রায় এক মাইল পথ আসিলে আমি ধীরে ধীরে উঠিলাম, দেখিলাম, আর ব্যাঘ্রের কোনরূপ চিহ্ন দেখা যায় না, আর নিকটে কয়েকখানা কুটীরও দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ানের অবস্থাটা তখন একবার দেখা আবশ্যক বিবেচনায় ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলাম, কোন সাড়া শব্দ নাই, বেচারা একেবারে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বলদগুলিকে থামাইলাম। আমার তখন শীত মাত্রও নাই, গায়ের ঘামে জামা টামা ভিজিয়া গিয়াছে। নিকটের কুটীরবাসিদিগকে করুণ-স্বরে আহ্বান করিলাম। কিছুক্ষণ চীৎকারে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল, এবং আমার কাতর আহ্বানে তাহারা স্ত্রী পুরুষে বাহির হইয়া আসিল। আমি সংক্ষেপে আমার বিপদের কথা বলিয়া গাড়োয়ানের অচেতন অবস্থার কথা বলিলাম। তাহারা তাড়াতাড়ি একটা খাটিয়া আনিয়া গাড়োয়ানকে টাপর হইতে অনেক কষ্টে বাহির করিল। গাড়োয়ান তখন বোধ হয় ব্যাঘ্র-সংক্রান্ত স্বপ্ন দর্শনে ব্যাপৃত ছিল। সে হয়ত ভাবিল, এইবারই ব্যাঘ্র-কবলে পতিত হইয়া গাড়ী হইতে বনভূমিতে নীত হইতেছে, তাই সে অব্যক্ত চীৎকার দ্বারা এতক্ষণের পর যে সে প্রকৃতই মরিল তাহা প্রকাশ করিল। তাহার সেই চীৎকারে সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং ক্রমে তাহাকে সচেতন করিল। সে চেতনা লাভ করিয়াও কিছুতে চক্ষু খুলিবে না—চক্ষু খুলিলেই সেই ভীষণ যম কিঙ্করের মূর্ত্তি সে দেখিতে পাইবে, এই তার মহা আশঙ্কা।

যাহা হউক ক্রমে তাহার ভ্রম দূর হইলে, সে উঠিয়া বসিল, এবং আমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে নিজ অক্ষত অবস্থার বিষয় বিবৃত করিলে সে একেবারে ভূমিতে পতিত হইয়া আমাকে "অবধান" করিল এবং আমার বুদ্ধিতেই যে তাহার পৈত্রিক জীবন রক্ষা পাইয়াছে, সে কথা বিশেষরূপে বলিতে লাগিল। তবে সে নিজ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রমাণও দিতে ছাড়িল না। সে যে একা এক গাড়ী লইয়া বনপথে চলিতে সম্পূর্ণ অসম্মত ছিল, এবং তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে, ইহা যে পূর্ব্বেই সে আমাকে জ্ঞাত করাইয়া স্বীয় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা সে আমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল।

অসভ্য কুটীরবাসিগণও তাহার কথা সমর্থন করিয়া আমাকে এরূপ অতি সাহসের জন্য অনুযোগ দিতে ছাড়িল না। আমাকেও বাধ্য হইয়া তাহাদের নিকট নিজ দোষ স্বীকার করিতে হইল, কারণ প্রমাণ একেবারে প্রত্যক্ষ!

সেই হইতে আমার এখন শিক্ষা হইয়াছে যে আর ২।৩ খানা শকট সঙ্গে না থাকিলে আমি রাত্রিতে একা এক শকটে বনপথ চলি না।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম ভাগ। ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৮। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

পতিহারা।

প্রগাঢ় দুখের গভীর কালিমা
বদনে জড়িত তার,
নিবিড় জ্বালায় নয়ন দুইটি
জ্বলিতেছে অনিবার ;

কেহ যেন তার, নাহি আপনার
বুঝিতে মরম-ব্যথা,
তাইতে বালিকা, সদাই নীরব
নাহি কহে কোন কথা।

উপহাস ভরা জগৎ হইতে
নিরালয়ে গিয়া বালা,
চলদল মূলে, পাতিয়া আঁচল
জুড়ায় প্রাণের জ্বালা।

বাতাস হোথায়, খেলিয়া বেড়ায়
করুণা মাখিয়া গায়,
পর দুখে যেন হইয়া কাতর
পাপিয়া মধুরে গায় ;

নীরব বালার নীরব বেদনা
নীরবতা শ্রুতি পাতি,
নিখিল বনের, তরুরাজি যেন
শুনিতেছে দিবারাতি।

আকাশেতে ধায় শাদা ভাঙা মেঘ
রবির কিরণে ভাসি,
সে যেন বালায়, আয় আয় বলে
ডাকিয়া যেতেছে হাসি।

অমনি বালিকা ভাবে মনে মনে
মরণ হইত যদি ;
মনের আনন্দে শ্যামল সাগরে
ভাসিতাম নিরবধি।

যেতাম ছুটিয়া যে পথে আমার
গিয়াছে প্রাণের প্রাণ,
বুঝি বা হোথায় ভাসিতে পারিলে
শুনা যায় তাঁর গান।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

তুমি কাঁদিয়ো তখন।

সখা! পবিত্র জাহ্নবী-জল
চিতাভূমি হেরে মোর
ধীরে ধীরে আসিবেন করিতে চুম্বন।
তুমি কাঁদিয়ো তখন।

প্রাণশূন্য এই তনু
ভূমিতলে লুটাইবে
মৃত্যুর কালিমা মাখা যুগল নয়ন।
তুমি কাঁদিয়ো তখন।

আশা প্রেম ভালবাসা
বাসনার মরীচিকা
ত্যজিয়ে আমারে যবে করিবে প্রয়াণ—
তুমি কাঁদিয়ো তখন।

নির্ব্বাপিত ভালবাসা
যাতনার দাবানল
জ্বালাতে হৃদয় আর পাবে না যখন—
তুমি কাঁদিয়ো তখন।

অভিমান অশ্রুজল
অপমান উচ্চমান
পারিবে না যবে আর করিতে দহন—
তুমি কাঁদিয়ো তখন।

এত যতনের প্রেম
অযতনে চলে যাবে
কোন অজানিত দেশে ছায়ার মতন—
তুমি কাঁদিয়ো তখন।

নিমিলীত নেত্রদ্বয়
পৃথিবীর শোক দুঃখ
হেরিবে না, চিরতরে করিবে শয়ন—
তুমি কাঁদিয়ো তখন।

জীবনের শেষ দিনে
সব খেলা ফুরাইবে
চিতা বুকে যেই দিন দিব আলিঙ্গন—
তুমি কাঁদিয়ো তখন।

শ্রীমতী নীলনলিনী দেবী।

জাপানী-খেলা।

কোন এক ব্যক্তি জাপানকে "শিশু-স্বর্গ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ক্রীড়ামোদে এরূপ উৎসাহ পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতীচ্য সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্ব্বে জাপান জাতির মধ্যে খেলাই প্রধান কার্য্য ছিল। জাপানের যে কোন সহরের খেলানার দোকান গুলি দেখিলে ইংরাজ-শিশু নিশ্চয়ই আহ্লাদে দিশেহারা হইয়া যাইবে।

ইংরাজ শিশু অপেক্ষা জাপানী বালকবালিকারা নূতন নূতন খেলার আবিষ্কার করিতে বড়ই সুনিপুণ। প্রথমোক্তেরা কেবল চিরপ্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রশংসিত খেলাগুলিতেই অধিকতর অনুরক্ত এবং কদাচ কোন নূতন খেলার উদ্ভাবনে উদ্যোগী হইয়া থাকে। কিন্তু জাপানে প্রত্যেক ছোট বালক বালিকা সে বিষয়ে বড় দক্ষ—এমন কি প্রত্যেকে এত নূতন নূতন খেলার আবিষ্কার করে যে, শেষে তাহার মধ্যে কোন্ খেলাতে তাহারা যোগদান করিবে তাহা স্থির করা তাহাদের পক্ষে কঠিন সমস্যা হইয়া উঠে। আবার যে ক্রীড়ামোদের চীৎকারে ইংরাজ শিশুগণ ঘর 'মাথায়' করিবার উদ্যোগ করে, জাপান শিশুরা সেই খেলাই নিরতিশয় শান্ত ও ধীরভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে।

অনেকগুলি জাপানী-খেলা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে ও কোন বিশেষ দিনে হইয়া থাকে। "ব্যাটল্‌ডোর" এবং 'শ্যাটল্‌ককের' খেলা নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই হইয়া থাকে।
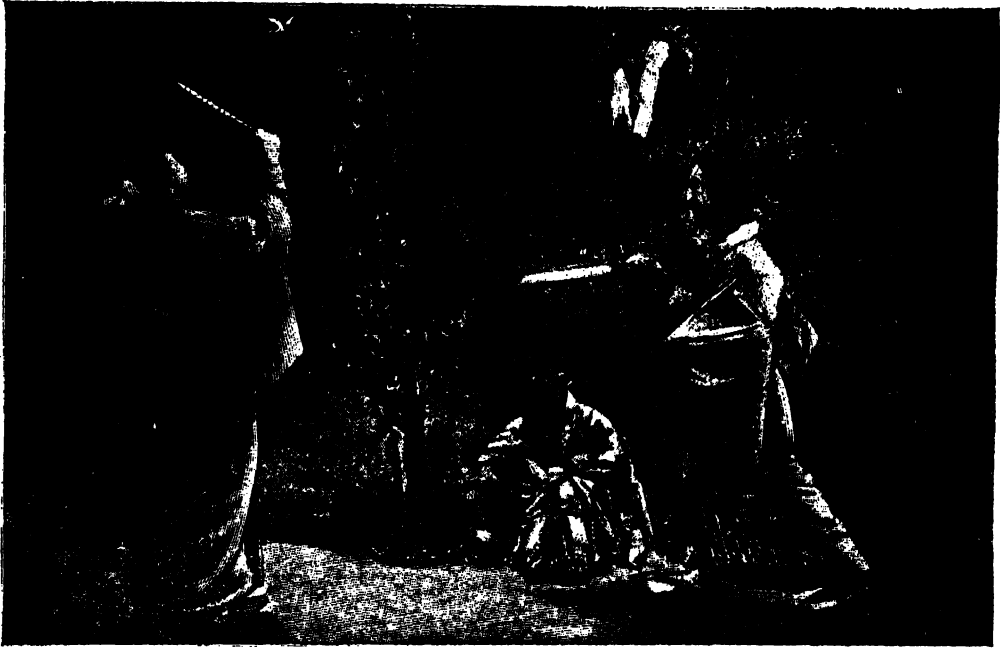
ছবিতে যে দুইটী বালিকা খেলা করিতেছে, তাহাদের হাতে ব্যাটের মত যে দণ্ড রহিয়াছে, তাহারই নাম "ব্যাটল্‌ডোর", এবং যে পালকবিশিষ্ট 'বল'টাকে উহারা মারিতেছে, উহারই নাম 'শ্যাটল্‌কক্‌'। মধ্যের বালিকাটী একটি "বব-বল্ (Bob-ball) লইয়া আপনা আপনি আমোদ করিতেছে। কিন্তু অনেক সময়ে অনেকগুলি বালিকা একত্রিত হইয়া এই 'শ্যাটল্‌কক্‌' খেলাকে, একপ্রকার ইংরাজী 'ব্যাড্‌মিণ্টন' খেলায় পরিণত করে।

তাসক্রীড়া ইহাদের এই সময়ের আর একটি প্রিয় খেলা। ইহাদের সর্ব্বপ্রিয় তাস খেলার নাম "আইরো-হা-কারুতা" অর্থাৎ 'প্রবাদ-খেলা'। এই খেলার দুই সেট করিয়া তাস থাকে—প্রত্যেক সেটে ৪৭ খানি করিয়া তাস। এক সেটের প্রত্যেক তাসখানি ছবিযুক্ত ও প্রত্যেক ছবি এক একটী ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ-সম্ভূত। যে ছবি যে প্রবাদের সেই ছবির এককোণে সেই প্রবাদের একটি বড় অক্ষর লেখা থাকে; এবং অপর সেটের তাস-গুলিতে কেবল সেই প্রবাদগুলি লেখা থাকে। তাসগুলি প্রথমে বেশ করিয়া তাসিয়া সকলকে বাঁটিয়া দেওয়া হয়। তারপর আমাদের দেশের "গোলামচোর" খেলার মত একের পর আর একজনের হাত হইতে এক এক খানি তাস টানিয়া "প্রবাদ" লিখিত তাসের সহিত সেই প্রবাদের ছবিযুক্ত তাসের মিল করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। যে সর্ব্ব প্রথমে এইরূপ মিল করিতে পারিবে তাহারই জিৎ।

নব বর্ষারম্ভে অনেক প্রকার সামাজিক আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের বালক বালিকারাই যোগদান করিতে পারে। উহারই মধ্যে বয়স্থেরা জাপানের নানাবিধ পৌরাণিক গল্প বলিয়া আমোদ করে। এই সকল গল্পের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যও অনেক মিশ্রিত থাকে।

এই সময়ে নৃত্যামোদও খুব হইয়া থাকে, কিন্তু ইংরাজদিগের ন্যায় স্ত্রীপুরুষ কদাপি একত্রে নৃত্য করে না। শীতের দীর্ঘ রাত্রি নৃত্যগীতের সমারোহেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। জাপানীদের একটী সর্ব্বপ্রিয় নাচের ছবি আমরা এই সঙ্গে দিলাম।

বালক বালিকাদিগকে পুরস্কারের প্রলোভনে উৎসাহিত
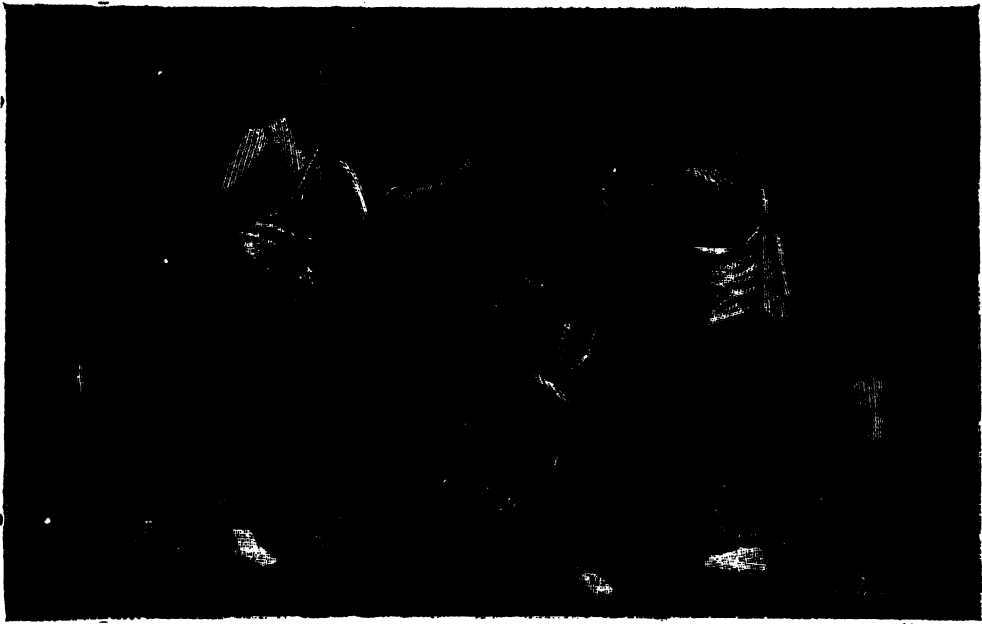
করিয়া গণিতনিপুণতার খেলায় নিয়োজিত করা হয়। চীন দেশীয় তাসে আর এক প্রকার অতি শিক্ষাপ্রদ খেলা হইয়া থাকে। এই খেলায় অপরিণত বয়স্ক ক্রীড়কেরা তদ্দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের বিবরণ পরিজ্ঞাত হয় এবং সাহিত্যশিক্ষার পক্ষে বিশেষ জ্ঞানলাভ করে।

বাহিরের খেলার মধ্যে জাপানে ঘুড়ি উড়ান ও লাটিম ঘুরান আমাদের দেশের মতই হইয়া থাকে। সূতায় মাঞ্জা করা, পেঁচ লাগাইয়া অপরের ঘুড়ি কাটিয়া দেওয়ার আমোদ আমাদেরই ন্যায় উহারা উপভোগ করে। 'রণ পা' (stilt) জাপানী বালকদের বড় প্রিয় সামগ্রী। বালকেরা এই 'রণপা' সাহায্যে এত দ্রুত গমন করে যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

জাপানে 'কন্‌দামেসি' বা 'আত্মা পরীক্ষা' নামে আর এক প্রকার অদ্ভুত আমোদ আছে। কোন গোরস্থানের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কতকগুলি বালক দিবাভাগে নিশান পুঁতিয়া আসে। রাত্রে তাহারা এক স্থানে সমবেত হইয়া নানারূপ বিভীষিকাপ্রদ শোণিতশোষক ভূত-প্রেতিনীর গল্প করে, এবং এক একটী গল্প শেষ হইলে এক একটী বালককে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নিশান সেই গোরস্থান হইতে উঠাইয়া আনিতে বলে। এইরূপে যতক্ষণ না সমস্ত নিশান আনীত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প চলে। আমাদের দেশেও পূর্ব্বকালে অনেক স্থানে এইরূপ বাজী রাখিয়া অনেকে অন্ধকার শ্মশানে খোঁটা মারিয়া অথবা চিতার অঙ্গার আনিয়া সাহসের পরিচয় দিত।

তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন "পুঁতুলের উৎসব"। এই দিনটী বালিকাদের নিকট বড়ই আমোদজনক। তাহারা ঐ দিবস তাহাদের ভাল ভাল পুঁতুলগুলি মেলাতে দেখাইবার জন্য বাহির করে। মেলাতেও বালিকাদের মনোরঞ্জনার্থ নানাবিধ মনোরম সাজে-সজ্জিত পুঁতুল আনীত হয়। এক মেলার পর, পর মেলার মধ্যে কোন বালিকার জন্ম হইলে তাহার জন্য এক জোড়া 'হিনা' ক্রয় করা হয়; সে যতদিন না বড় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই 'হিনা' লইয়া খেলা করে। এমন কি, তাহার বিবাহের পরেও সেই 'হিনা' জোড়াটী সে শ্বশুরালয়ে লইয়া যায়। এই পুঁতুলগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠে বা চীনে মাটিতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।
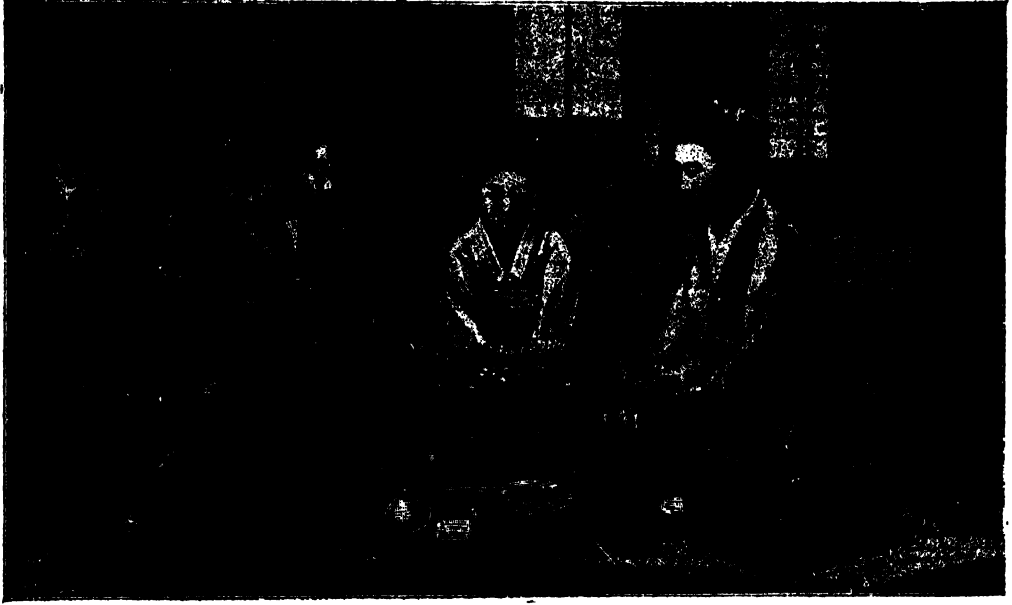
স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া এক প্রকার 'গুটি' খেলা হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই 'পেষাদারী খেলোয়াড়'। এক খানি উচ্চ তক্তা বা মেজের উপর এই খেলা হইয়া থাকে। ইহা প্রায় আমাদের দেশের দাবা খেলার ন্যায়। এই খেলার 'বড়ে' গুলিকে জাপানী ভাষায় 'গো' বলে; এই 'বড়ে' সাদায় কালায় ৪০টী মাত্র। জাপানী ভাষায় দাবা খেলাকে 'শোগি' বলে। ইহাতেও সর্ব্বসমেত 'বলের' সংখ্যা ৪০টী হইয়া থাকে। পাশা খেলাও ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়; এই খেলাতেও বহুবিধ 'রকম' আছে।

বিলাতের ন্যায় জাপানেও ছেলেদের জন্য অনেক প্রকার খেলার বই অতি পরিপাটীরূপে প্রস্তুত করা হয়। এক একটী বালক বালিকার অনেকগুলি করিয়া এইরূপ পুস্তক থাকে। কাগজের বেলুন, মৎস্য বা অন্যান্য জন্তু প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া আকাশে উড়াইয়া দেওয়া জাপান-বাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেরই বড় আমোদের খেলা। মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিবসে এইরূপ শত শত উড্ডীয়মান খেলনা সহরের উপর দিয়া আকাশ পথে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

ঘরে বসিয়া যে সব খেলা হয় তাহাদের মধ্যে 'কঙ্কণচিকি' একটী সর্ব্বপ্রিয় খেলা। একটি বাক্সের উপর একটী বাটি বসান থাকে, তাহার উপরে এক গাছি দড়িতে বড় ফাঁস করিয়া দড়ির দুই ধার দুই চারিটী বালিকা ধরিয়া থাকে। একটী বালিকাকে সেই ফাঁসের মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া অতি ক্ষিপ্রতা ও চতুরতার সহিত সেই বাটিটী স্পর্শ করিয়াই হাত বাহির করিয়া আনিতে হয়, যেন দুইদিক হইতে দড়ি টানিয়া তাহার হাতে ফাঁস না লাগাইতে পারে!

বালকদের মধ্যে আর একটী সুন্দর খেলার নাম "গেঞ্জি ও হিক"। এই খেলায় বালকেরা মৃত্তিকানির্ম্মিত 'শিরস্ত্রাণ' মাথায় দিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে কৃত্রিম যুদ্ধ করে। যুদ্ধকালে যাহার টুপি ভাঙ্গিয়া যায় তাহারই "মরণ" হয়। এতদ্ভিন্ন বিলাতী খেলার ন্যায় জাপানে অনেক প্রকার খেলা আছে। আমাদের দেশের 'বিচ্চু' বা বিলাতী 'হপস্কচ' খেলার মত সেখানেও এক প্রকার খেলা আছে। জাপানের রাস্তায় এই খেলায় প্রায় সকল বয়সের বালক বালিকাদিগকে যোগদান করিতে দেখা যায়।

জাপানী বালকেরা উর্দ্ধে নানারূপ ব্যায়াম-বাজী করিয়া থাকে এবং তাহাদের এরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যায়াম

ক্রীড়া বোধ হয় অনেকেই শীতকালে কলিকাতায় সার্কাসে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহারা যাহাই খেলুক, সর্ব্বদা মন ও মেজাজের ঠিক রাখে। ইহাই জাপান জাতির চমৎকার গুণ।

"লন-টেনিস" প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য খেলা আজ কাল জাপানে প্রচলিত হইয়াছে এবং "ফুট বল" প্রভৃতি অন্যান্য বীরক্রীড়াও প্রচলনের জন্য বহু চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই খেলাগুলির তত বিশেষ আদর নাই, এবং ইহার স্থায়ীভাবে প্রচলন হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে জাপানী ও ইংরাজী খেলার মধ্যে অনেকগুলির বিশেষ ঐক্য আছে বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

সতীর কথা।

রমণীর সহমরণ সম্বন্ধে পুরুষের কথা কহিতে যাওয়া এক প্রকার অনধিকার চর্চ্চা। সেকালে যে সহমরণ প্রথা ছিল, তাহা ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নহে। মহিলাদিগের হস্তেই সে বিষয়ের বিচারের ভার ন্যস্ত হইল। তবে রমণী জাতির গৌরবের কথায় বা স্মৃতিতে পুরুষ জাতি আপনাকে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করে। তাই ভারত মহিলার আত্মত্যাগের দুই একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সহমরণ প্রথার আলোচনায় পুরুষ অপেক্ষা রমণী জাতির মধ্যে ভালবাসা অধিকতর প্রবল বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতীয় সতী রমণী পতির বিরহ সহ করিতে না পারিয়া স্বামীর সহিত পরলোকে মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় মৃত স্বামীর চিতানলে জীবনাহুতি প্রদান করিতেন। বিরুদ্ধবাদীদিগের মত,—পতি-প্রেম অপেক্ষা সমাজের অবজ্ঞার ভয়ে বা মৃত পতির আত্মীয়দিগের পীড়ন ভয়েই অনেক বিধবা সহমরণ শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতেন; অনেকস্থলে বিধবাকে বলপূর্ব্বক স্বামীর সহিত দগ্ধ করাও হইত। উভয় মতের মূলেই কিছু পরিমাণে সত্য থাকিবার সম্ভাবনা। তবে সে সত্যের পরিমাণ কোন্ মতে কতটুকু আছে, তাহার বিচার পাঠক পাঠিকারাই করিবেন।

সহ-মরণ ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুতে, মাদ্রী দেবী, আপনার দুইটী সুকুমার শিশু পুত্রকে কুন্তীর হস্তে প্রদান করিয়া, যেরূপ স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতের পাঠক পাঠিকা মাত্রেই অবগত আছেন। রাজ্যৈশ্বর্য্য, পুত্রস্নেহ, প্রাণের মমতা কিছুতেই মাদ্রীকে অভিভূত করিতে পারে নাই—পতি-প্রেমের নিকট তাহার সমস্তই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পুরাণাদি গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু পুরাণের কথা অনেকের নিকট সত্যযুগ বলিয়া বিবেচিত; সুতরাং সে কালের অলৌকিক কথা ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কথাই বিবৃত করিব।

ভারতে মুসলমান শাসন কালে রাজপুতনার রমণীরা আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে পুনঃ পুনঃ চমকিত করিয়াছিলেন, একথা অনেকেই অবগত আছেন। অন্য দেশের রমণীরাও এবিষয়ে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা রাজপুত রমণীদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। পাশ্চাত্য দেশের ভ্রমণকারীরা সে সময় ভারতে আসিয়া এই সকল ঘটনার যে সমস্ত বিস্ময়কর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এই কারণে তাহার কয়েকটি ঘটনাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বীজাপুরের সুলতানের সহিত মান্দ্রাজের অন্তর্গত ভেলোর রাজের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে ভেলোর রাজের পরাজয় ও পরোলোক প্রাপ্তি ঘটে। সুলতান ভেলোর রাজের সিংহাসন অধিকার করেন। মৃত মহারাজের ১১ জন ধর্ম্ম-পত্নী ছিলেন। মহারাজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে সকলেই অনুমৃতা হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সুলতান এই সংবাদ অবগত হইয়া রাণী-

দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সহ-মরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণীরা কিছুতেই আপনাদিগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। পরিশেষে সুলতানের ভয় প্রদর্শনেও বিরত হন নাই। বলা বাহুল্য তাহাতেও রাণীদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ব্ববৎ অটল রহিল। তখন সুলতান ভাবিলেন, রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় রাণীদিগকে আবদ্ধ রাখিলে কেহই অনুমৃতা হইতে পারিবেন না। সুলতানের সঙ্কল্প অবগত হইয়া রাণীরা বলিলেন, স্বামীর অনুগমন না করিবার নিমিত্ত সুলতান যত চেষ্টাই করুন সমস্ত বিফল হইবে; ৩ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া পরলোকগত স্বামীর সঙ্গলাভ করিবেন। আবদ্ধকারী কর্ম্মচারী রাণীদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি বিদ্রূপ-কলুষিত হাসি হাসিয়া, আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন অর্থাৎ রাণীদিগকে অবরুদ্ধ করিলেন।

তিন ঘণ্টার পরে রাণীদিগের অবস্থা দেখিবার জন্য কর্ম্মচারীর মনে কৌতূহল উপস্থিত হইল। তিনি ধীর-পাদ-বিক্ষেপে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। তাঁহার স্থির নেত্রের সম্মুখে একাদশটি রমণীর শব একই স্থানে নিপতিত! কাহারও শরীরে কোনও ক্ষত-চিহ্ন ছিল না, উদ্বন্ধনে কেহই জীবনান্ত ঘটান নাই—গরল পানেও কাহারও জীবন শেষ হয় নাই! পতির পদাম্বুজ ধ্যান করিতে করিতে একাদশটি সতীর জীবন স্বামীর অনুগমন করিয়াছিল কি না, কে বলিতে পারে?

পূর্ব্বকালে রাজারা বহু বিবাহ করিতেন। এক ব্যক্তি সকলের মনস্তুষ্টি সম্পাদন ও সকলের প্রতি সমান প্রীতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তথাপি ভারতু মহিলার কি নিস্বার্থ ভালবাসা—কি অলৌকিক পতি-প্রেম! একটী জীবনের জন্য সকলেই হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন! ইহা কি ভারতবাসীর অল্প গৌরবের বিষয়—ভারত মহিলার পক্ষে ইহা কি অল্প শ্লাঘার কথা!

পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীদিগের বর্ণিত আর একটি ঘটনা এইরূপ;—১৬৪২ খৃষ্টাব্দে দুইজন ক্ষমতাশালী হিন্দু নরপতি ষোড়শ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীশ্বর সাহজাঁহানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রা নগরে সম্রাটের দরবারে উপনীত হন। তাঁহারা সহোদর ছিলেন। দিল্লী-দরবারের আদব কায়দা তাঁহাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। কাজেই তাহাদিগের ব্যবহারে সম্রাটের দরবারের কর্ম্মচারীরা সকলেই মনে মনে অসন্তুষ্ট হইল। একদিন রাজভবনের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তাঁহাদিগকে রাজসভার মধ্যে সকলের সমক্ষেই বলিলেন, অসীম প্রতাপশালী মোগল সম্রাটের সমক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, নৃপতিদিগের তাহা শিক্ষা করা উচিত। এই কথা শুনিয়া তেজস্বী ভ্রাতৃযুগল আপনাদিগকে অবজ্ঞাত বিবেচনা করিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই রাজসভা মধ্যে প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া ভ্রাতৃহন্তাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের অমিত পরাক্রমে তাঁহাকেও অচিরে ভ্রাতৃপন্থানুসরণ করিতে হইল। দরবারের মধ্যে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সম্রাট্ ভীত হইয়া অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দরবারে যে সমস্ত মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলে নিস্পন্দভাবে এই ঘটনা দেখিতে ছিলেন। সম্রাটের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের পর সকলের চৈতন্য হইল। তাঁহারা চারিদিক হইতে ভ্রাতৃ যুগলকে আক্রমণ করিলেন। বলা বাহুল্য, যে ষোড়শ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নৃপতিদ্বয়ের সহিত আগমন করিয়াছিল তাহারা সকলেই শিবিরে অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং ঐ দুই বীর পুরুষ অসহায় অবস্থায় বহু সংখ্যক মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মুশলমান দরবারের মধ্যস্থলে, বহু সংখ্যক মুসলমানের সমক্ষে, সম্রাটের চক্ষের উপর হিন্দুর হস্তে দুই জন মুসলমান নিহত হওয়ায় বাদসাহ এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, হত্যাকারীদিগের তাঁহার ক্রোধেতেই মৃত্যুর

শান্তি হইল না। তিনি প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া নিহত নরপতিদিগের শব-দেহ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের আঁদেশ করিলেন। নরপতিদিগের ষোড়শ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এই সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। হিন্দুর অন্ত্যেষ্টি প্রথায় হস্তক্ষেপ হইতেছিল ইহা তাহাদিগের প্রাণে সহ্য হইল না। তাহারা সম্রাটের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "যদি নৃপতিদিগের শবদেহ তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করা না হয় তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে। অনর্থক রক্তপাত করিতে সম্রাটের ইচ্ছা ছিল না, তিনি নৃপতি যুগলের শবদেহ সৈন্যদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

যথা সময়ে হিন্দু নরপতিদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আরব্ধ হইল। দুইটি স্বতন্ত্র চিতায় দুইটি শবদেহ স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযুক্ত হইল। চিতানল ধু ধু করিয়া প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে সকলে দেখিল দুইটী রমণী নানাবিধ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে সেই দিকে আসিতেছেন। সকলেই চিনিল তাঁহারাই নিহত নরপতিদিগের মহিষী! মহিষীযুগল শ্মশানে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব পতির চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তৎপরে সুখে সেই চিতানলে আরোহণ করিয়া মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিলেন। অগ্নি দেবের প্রচণ্ড বিক্রমেও তাঁহাদিগের ভ্রুক্ষেপ হইল না। সতীর স্মিতমুখ দারুণ অগ্নিজ্বালায় ম্লান হইল না। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী এই ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন।

একবার ট্যাভার নিচার নামক এক ফরাশী মণিকার পাটনায় সুবাদারের সহিত সক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। টাভারনিচার মহোদয় সুবাদারের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় এক যুবতী তথায় উপস্থিত হইলেন। যুবতীর রূপলাবণ্য অনিন্দ্য, সুন্দর, তাঁহার বয়ক্রম দ্বাবিংশ বর্ষের অধিক হয় নাই। যুবতী স্বামীর সহিত এক চিতায় স্বীয় জীবনান্ত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে সুবাদারের নিকট আসিয়াছিলেন। তাহার এই অসম সাহসিকতার কথা শুনিয়া সুবাদারের মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি অগ্নিদাহের ভয়ঙ্কর কষ্ট এবং মৃত্যুর বিভীষিকার বিষয় পুনঃ পুনঃ বর্ণন করিয়া যুবতীর মনে ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। যুবতী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "অগ্নিতে আমার কিছু মাত্র ভয় নাই। অগ্নির যন্ত্রণা আমাকে কোনরূপে অস্থির করিতে পারিবে না। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, জ্বলন্ত মশাল এখানে আনয়ন করিবার আদেশ করুন, আমি এখনই আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি।" রমণীর কথা শুনিয়া সুবাদারের মাথা ঘুরিয়া গেল। যুবতী স্বীয় কমনীয় শরীর ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্বলন্ত মশালে দগ্ধ করিবে এ দৃশ্য তাহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। কিন্তু তিনি আর যুবতীকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন না।

ক্ষত্রিয় রমণীরা অগ্নি ভয় করিতেন না, কথায় কথায় তাঁহারা চিতানলে জীবনাহুতি দিতেন। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীর এরূপ তেজস্বিতা অন্য দেশে দুর্লভ। বঙ্গদেশের কাপুরুষ বাঙ্গালীর রমণীরাও বীরাঙ্গনার ন্যায় পতির সহিত চিতারোহণ করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হইতেন না। তাহারও উদাহরণ বিরল নহে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী জাতির কোনও ইতিহাস নাই। পরম্পরায় যে সকল আখ্যায়িকা চলিয়া আসিতেছে, যদি কখনও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লিখিত হয়, তবে সেই সকল আখ্যায়িকার উপর তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইবে। তাই এস্থানে কয়েকটী বাঙ্গালী রমণীর বীরত্বের আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিলাম।

গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর নাম বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সহধর্ম্মিণী পতিপ্রাণা পদ্মাবতী তাঁহার অনুমৃতা হইয়াছিলেন।

প্রায় দুই শত বৎসর গত হইল ২৪ পরগণার মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যেও একটী অলৌকিক বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। ঘটনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মুমূর্ষু পতির পার্শ্বে যুবতী স্ত্রী আসীনা।—রাত্রিকাল—প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেকালে রমণীরা লোক লজ্জার

ভয়ে স্বামীর সমক্ষে বড় করিয়া কথা কহিতেন না, এমন কি পাছে কেহ দেখিয়া লজ্জা দেয়, এই নিমিত্ত মুখের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিতেন না। আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি পতির পার্শ্বে অধোবদনে নীরব অবস্থায় অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া বসিয়া ছিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার স্বামী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি চলিলাম, সাবধানে থাকিও, ধর্ম্ম ত্যাগ করিও না।" এই কথা শুনিয়া যুবতীর মুখ অবগুণ্ঠন হইতে উন্মুক্ত হইল, এক গুচ্ছ বর্ত্তিকা সংযোগে দীপ শিখার তেজ বৃদ্ধি করিয়া হাসিতে হাসিতে যুবতী স্বামীর মুখের প্রতি চাহিলেন। স্বামী দেখিতে পাইলেন, যুবতীর একটী অঙ্গুলী দীপশিখায় দগ্ধ হইতেছে, অঙ্গুলী হইতে মাংসখণ্ড সকল অগ্নির তেজে দগ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, তথাপি যুবতী সহাস্য বদনে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। এ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া তিনি নয়ন নিমিলিত করিয়া বলিলেন, "আর না, আমি তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি। আমি আর এদৃশ্য দেখিতে পারিনা।' তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

এখন একটা প্রত্যক্ষ ঘটনা শুনুন :—সার ফ্রনসীস্ হ্যালীডে যে সময় হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সে সময় তিনি স্বয়ং একটি সহমরণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সহমরণ-প্রথা নিবারিত হইয়াছিল। সেই সময় আমি হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। নূতন আইন জারি হইবার পূর্ব্বে একদিন আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমার বাসস্থানের কয়েক ক্রোশ দূরে একটি সতী অনুমৃতা হইবেন। আমি যখনএই সংবাদ পাইলাম, তখন ডাক্তার ওয়াইজ এবং এক জন পাদরি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত উভয়েই আমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। আমরা তিন জনে ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নদীতীরে একটি চিতার পার্শ্বে বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়াছে এবং সহমরণাভিলাষিণী রমণী তাহাদিগের সম্মুখে ধরাতলে বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা তথায় উপস্থিত হইলে আমাদিগের বসিবার নিমিত্ত চেয়ার আনীত হইল। আমরা রমণীর নিকটেই উপবেশন করিলাম। আমি এবং আমার সঙ্গিদ্বয় রমণীকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া বুঝাইতে লাগিলাম। রমণী স্থিরভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পুরোহিতগণ এবং অনেক দর্শকও আমাদিগের যুক্তি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে রমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে কোন ফল হইবে না দেখিয়া, আমি অনুমতি প্রদান করিলাম। রমণী জ্বলন্ত চিতার দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় পাদরী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অগ্নিদাহের যন্ত্রণার বিষয় কি আপনি কিছু অবগত আছেন?" এই কথা শুনিবামাত্র রমণী আমার পদতলে উপবেশন করিলেন এবং ঘৃণাপূর্ণ নয়নে আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটি প্রদীপ আনিতে বলিলেন। প্রদীপ আনীত হইলে, রমণী একখানি বস্ত্র খণ্ড ঘৃতাক্ত করিয়া একটি অঙ্গুলিতে বিজড়িত করিয়া তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। অঙ্গুলিতে অগ্নি সংযুক্ত হইল, দপদপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, রমণী গম্ভীরভাবে স্থির নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অঙ্গুলি ঝলসিয়া গেল, দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল এবং অবশেষে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ এই ভাবে গত হইল, কিন্তু রমণীর মুখে একটি শব্দ পরিশ্রুত বা তাঁহার হস্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। এমন কি তাঁহার মুখের ভাবের সামান্যমাত্র বৈলক্ষণ্যও ঘটিল না। অতঃপর তিনি বলিলেন, "তোমাদের সন্দেহ দূর হইয়াছে ত?" আমি উত্তর করিলাম, "আমাদিগের সংশয় সম্পূর্ণরূপেই দূর হইয়াছে।" তখন তিনি দীপশিখা হইতে অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন, "তবে আমি এক্ষণে যাইতে পারি?" আমি অনুমতি প্রদান করিলাম। রমণী চিতার সন্নিহিত হইলেন।

নদীর পার্শ্বেই চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। চিতাটি উচ্চে ও দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে চারি ফিট এবং প্রস্থে তিন ফিট, এবং উহা শুষ্ক কাষ্ঠের দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। রমণী উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দুই তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অবশেষে চিতায় আরোহণ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। অতঃপর তাঁহার উপর শুষ্ক গুল্ম লতাদি নিক্ষিপ্ত হইল। সেগুলি এত লঘু যে রমণী ইচ্ছা করিলে তাহা সহজেই ফেলিয়া দিয়া চিতা হইতে অবতরণ করিতে পারিতেন। এই সময় কতিপয় ব্যক্তি দীর্ঘ বংশ খণ্ড দ্বারা রমণীকে চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমি তাহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করি।

রমণীর ত্রিংশদ্বর্ষীয় পুত্র সেই চিতায় অগ্নি সংযোগ করিল। চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অনলে ধূনা ও ঘৃত প্রচুর পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আমি চিতার অতি নিকটেই বসিয়াছিলাম। চিতার ভিতর হইতে কোন শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই, অথবা রমণীর কোন প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন দেখিতে পাই নাই। রমণী মৃত পতির সহিত নিশ্চল নির্ব্বাক ভাবে আপনাকে দগ্ধীভূত করিলেন। চিতানল নির্ব্বাপিত হইলে পুত্র ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বোধ হয় ইহার পর হুগলী অথবা সমস্ত বঙ্গদেশে আর সহমরণ হয় নাই।

বর্ত্তমান সময় বাঙ্গালী জাতির কিরূপ নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। বাঙ্গালী জাতির এই নৈতিক অবনতি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে দেখিয়াই কবি মনের কষ্টে গাহিয়াছিলেন "ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি"। কিন্তু এখনও, এই নৈতিক অবনতির দিনেও বাঙ্গালীর গৃহ সতীহীন হয় নাই। সংবাদ পত্রে প্রায়ই সতীর আত্মত্যাগের কথা দেখিতে পাই। আজিও একমাস অতীত হয় নাই, এক দিন 'হিতবাদী'তে এক বঙ্গমহিলার আত্ম ত্যাগের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত পাঠ করিতে ছিলাম। নিম্নে ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি।

একজন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন ;—"সতীর আত্মবিসর্জ্জন—গত ৩রা এপ্রেল বুধবার বেলা ৫টার সময় ২৪ পরগণায় টালীগঞ্জের অন্তর্গত হালতুনিবাসী বাবু রাজেন্দ্রলাল ঘোষের পত্নী স্বামীর জীবনে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এক বৎসর হইতে রাজেন্দ্রবাবু কঠিন অম্লশূল রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, নানা প্রকার চিকিৎসায় রোগ দূর না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইতেছিল। স্বামীর এই নিদারুণ রোগকষ্ট দেখিতে না পারিয়া, ঘটনার দিন অপরাহ্নে, সতী নিজ শয়নাগার অর্গলাবদ্ধ করিয়া নিজদেহে তৈল এবং বস্ত্র সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি যে প্রকারে দেহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই শেষ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, যন্ত্রণায় বিচলিত হন নাই। আত্মহত্যা সর্ব্বথা নিন্দনীয় হইলেও সতীর এই কার্য্য আত্মবিসর্জ্জনের জলন্ত উদাহরণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা সংবাদ পত্র পাঠ করেন, তাঁহারা এইরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ দেখিতে পাইবেন! যতদিন আমাদিগের মাতৃকুলের এইরূপ চরিত্রবল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন শত বিপৎপাতেও ভারত বাসীর জাতীয়ত্ব বিনষ্ট হইবে না।*

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

ভদ্রা।

বিহার প্রদেশে মহাস্থল নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে কল্প নামক কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কল্প দরিদ্র ছিলেন না, কৃষি কার্য্যে তাঁহার প্রচুর আয় হইত। অট্টালিকা, জলাশয়, উদ্যান, দাস দাসী প্রভৃতি তাঁহার

---

* সহমরণ পতিপরায়ণতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নহে। মৃত পতির স্মৃতি সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখিয়া, প্রেমে শুদ্ধ হইয়া, দেহ মনের সমস্ত শক্তিকে জগতের সেবায় নিয়োগ করাই দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা, সহমরণে স্বামীর সহিত মিলন-সুখের অভিলাষ আছে, সুতরাং উহা কাম্য কর্ম্ম, কিন্তু শেষোক্ত আদর্শ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ, আত্মকল্যাণপ্রদ। সংযমই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক।—"সখী সম্পাদক।"

যথেষ্ট ধনশালিতার পরিচয় প্রদান করিত। তাঁহার পত্নীর নাম সুরূপা। সুরূপা যেমন রূপবতী তেমনই পতিপরায়ণা ছিলেন। এক সময়ে তিনি গর্ভবতী হইলেন, প্রেমিক পতি সন্তানের মুখদর্শন করিবেন ভাবিয়া আহ্লাদিত হইলেন। একদিন কল্পভার্য্যা অন্তঃপুরের সন্নিহিত উদ্যানে বেড়াইতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে তিনি একটি পিপ্পল তরুর মূলে দিব্যকান্তি পুত্র প্রসব করিলেন। পিপ্প-তরুর মূলে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পুত্রের নাম পিপ্পলায়ন রাখা হইল। পুত্র দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। যথাসময়ে কল্প পুত্রের বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। পিপ্পলায়ন অতিশয় মেধাবী ছিলেন, সুতরাং অল্পকালের মধ্যেই সবিশেষ বিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন। কল্প যুবা পুত্রকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন; কিন্তু পুত্র সংসারে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ। তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও বিবাহে সম্মত হইলেন না। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা জীবন যাপন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পিতা বংশ-লোপ-ভয়ে পুনরায় পুত্রকে বিবাহের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, পিপ্পলায়ন একটি সুবর্ণময়ী কন্যা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"যদি এইরূপ বর্ণ ও লাবণ্য যুক্ত কন্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আমি বিবাহ করিব, নচেৎ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা জীবন অতিবাহিত করিব।" পিতা সেই অপূর্ব্ব কন্যা-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া হতাশ হইলেন এবং ভাবিলেন, কোন সুশিক্ষিত শিল্পী বহু শ্রমে বিশুদ্ধ সুবর্ণদ্বারা এই কন্যা নির্ম্মাণ করিয়াছে; অতএব ইহার সদৃশ উজ্জ্বলবর্ণ, লাবণ্য ও অঙ্গসৌষ্টব জগতে দুর্লভ। কল্প ঐ রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় চতুরক নামক তাঁহার এক বন্ধু সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কল্পকে আশ্বস্ত করিলেন; এবং স্বয়ং কন্যানুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। ঐ সুবর্ণময়ী কন্যামূর্ত্তিকে এক চতুর্দোলায় স্থাপন পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রচার করিলেন—"ইনি কুমারীগণের সৌভাগ্য-দেবী, যিনি এই দেবীকে ভক্তিসহকারে পূজা করিবেন তিনি পতিপ্রেম ও চিরসৌভাগ্য লাভ করিবেন।" তাহার পর চতুরক যেখানে যাইতে লাগিলেন সেখানেই দলে দলে সুন্দরী ধনিকন্যারা আসিয়া সেই সুবর্ণ প্রতিমার পূজা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে চতুরক সুবর্ণ প্রতিমার সহিত সেই লাবণ্যবতী কন্যাদের দেহ সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহারও বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় কিন্তু অঙ্গ সৌষ্টব প্রতিমার সদৃশ নহে, কাহারও দৈহিক শোভা স্বর্ণময়ী কন্যার তুল্য, কিন্তু বর্ণ অন্যরূপ। চতুরক বহু দেশ ও নগরে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও অভিলষিত কন্যার অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে মধ্যভারতবর্ষে শিপ্রা নদীর তীরস্থ উজ্জয়িনী নগরীতে উপনীত হইলেন। সেখানেও সেই সুবর্ণময়ী সৌভাগ্য দেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়া নাগরিক দুহিতারা তাঁহার পূজার নিমিত্ত আগমন করিল। তন্মধ্যে তিনি একটি কন্যাকে দেখিলেন। তাঁহার দেহের বর্ণ, লাবণ্য ও অঙ্গসৌষ্টব সমুদয়ই স্বর্ণ প্রতিমা-সদৃশ। চতুরক তত্রত্য কোন ব্যক্তির নিকট ঐ কন্যাটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন কন্যার নাম ভদ্রা। তিনি তত্রত্য কপিল নামক ব্রাহ্মণের দুহিতা। শৈশব হইতে বিদ্যার অনুশীলন করিয়া বিশেষ বিদুষী হইয়াছেন এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আর কখনও পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবেন না।

তাহার পর চতুরক তাঁহার বন্ধু কল্পের নিকট গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কল্পের পুত্র পিপ্পলায়ন সেই বিদুষী বিপ্রকুমারীর ব্রহ্মচর্য্যের সংবাদে বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। একদিন স্বয়ং অতিথিবেশে কপিলের গৃহে উপস্থিত। কপিল যথাবিধি অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া কন্যা ভদ্রার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার অর্পণ করিলেন। ভদ্রা অতীব যত্নে পিপ্পলায়নকে নানাবিধ সুরস আহার্য্য প্রদান করিলেন এবং তিনি আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার শয্যা-পার্শে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। পিপ্পলায়ন সেই কন্যার অতুল সৌন্দর্য্য,ততোঽধিক নম্রতা ও ধর্ম্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং অতি মৃদু মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর্য্যে, আপনিই কি সেই ভদ্রা, যাঁহার ব্রহ্ম-

চর্য্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে ? আমি মহাস্থল গ্রামের অধিবাসী কপিলনামক ব্রাহ্মণের পুত্র। আমার নাম পিপ্পলায়ন। চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য পরিপালন করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনার দর্শন করাই এখানে আগমনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। এখানে আসিয়া আপনার পবিত্র ও মধুর আচরণে কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। আমি আপনার নিকট একটি প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কি উহাতে সম্মত হইবেন ? আমি আপনার পাণিগ্রহণার্থী।” ভদ্রা পিপ্পলায়নের বিনয় ও প্রীতি পূর্ণ বাক্যে যেন আত্মহারা হইয়া গেলেন। আনন্দের আধিক্যে কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, “আজ আমি ধন্য হইলাম, যে হেতু বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী পিপ্পলায়ন আমাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি অনেক দিন আপনার পুণ্যময় চরিত্রের সংবাদ অবগত হইয়াছি, আপনার সন্দর্শনে কি রূপ আনন্দিত হইয়াছি, উহা কি প্রকারে ব্যক্ত করিব ? আপনার করুণার অন্ত নাই; এই নগণ্যা ভদ্রাকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করিতে মানস করিয়াছেন, জানিয়া আরও অনুগৃহীতা হইলাম। শান্তির সহিত সংযমের মিলন যদি বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আমার সহিতও আপনার মিলন বিরুদ্ধ নহে। অনন্তর পিপ্পলায়ন পরিতুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে মহাসমারোহে পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ভদ্রা পরিণীতা হইয়া পতিগৃহে আসিয়াছেন। শ্বশুরের অতুল বিভব, কিন্তু তিনি স্বয়ং যেমন ভোগবাসনায় নিস্পৃহ, স্বামীও তদ্রূপ। তাঁহারা এই পূর্ণ যৌবনে অতুল সম্পদের মধ্যে অবস্থান করিয়াও পদে পদে কন্দর্পের আজ্ঞা ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। সৎকার্য্যে দান, দুঃখীর দুঃখমোচন, বিপন্নের উদ্ধার, ইন্দ্রিয় সংযম ও জ্ঞানানুশীলনে তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহাদের শয়নগৃহে উৎকৃষ্ট পালঙ্ক ও দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যার অভাব ছিল না, কিন্তু এই যুবক যুবতী ভূমিতলে সামান্য শয্যা পাতিয়া উহাতে শয়ন করিতেন। যখন পতি নিদ্রাগত হইতেন, তখন পত্নী জাগরিত থাকিতেন। আবার পত্নী নিদ্রাগত হইলে পতি প্রবুদ্ধ হইতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন বটে, কিন্তু কেহ কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিতেন না। একদা গ্রীষ্মরজনীর মধ্যভাগে ভদ্রা শয্যায় নিদ্রিতা। গবাক্ষদ্বারা শুভ্র জোৎস্না তাঁহার চারু মুখমণ্ডলকে অধিকতর আলোকিত করিয়াছে। কবরীবন্ধন শিথিল, একখানি বাহু শয্যা ছাড়াইয়া ভূতলে গিয়া পড়িয়াছে। পিপ্পলায়নের সেই চিরপরিচিত লাবণ্যময় মুখখানি আজ যেন আরও অধিক শোভা ধারণ করিয়াছে। কর্ম্মযোগী পিপ্পলায়ন পত্নীর পার্শ্বে নির্ব্বিকারচিত্তে বসিয়া আছেন। একটি সর্প দেখিতে দেখিতে গর্ত্ত হইতে উঠিয়া শয্যার নিকটবর্ত্তী হইলে পিপ্পলায়ন পত্নীকে কাল সর্পের দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তালবৃন্তের মূল দ্বারা তাঁহার বাহুটি সরাইয়া দিলেন। ভদ্রা সহসা শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে পতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আর্য্যপুত্র! এ কি ? আপনি কি সমস্ত প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছেন ? আপনারও চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে! হায় কি লজ্জার কথা! বরং পর্ব্বতেরা কখনও বিচলিত হয়, কিন্তু সাধুরা ত কোন কারণেই আপন ধৈর্য্য পরিত্যাগ করেন না।” পত্নীর কথা শুনিয়া পিপ্পলায়ন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “প্রিয়ে! আশঙ্কা পরিত্যাগ কর, স্বপ্নেও আমার চিত্তবিকার সম্ভব নহে। ঐ দেখ ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্প শয্যাপার্শ্বে বিচরণ করিতেছে। উহার দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তালবৃন্তের মূল দ্বারা তোমার বাহুটি স্থানান্তরিত করিয়াছি। ভদ্রা পতিবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, “ভাগ্যে আর্য্যপুত্রের হৃদয় ভোগস্পৃহায় কলুষিত হয় নাই। নাথ! ঐ যে বেচারী কৃষ্ণ সর্প ভ্রমণ করিতেছে, ও সাধু। কাম ঐ কৃষ্ণ সর্প অপেক্ষাও ভয়ানক। কৃষ্ণ সর্প এক তনু বিনষ্ট করে, কাম জন্মে জন্মে শত শত তনু বিনষ্ট করিয়া থাকে।” পিপ্পলায়ন ভদ্রার তীব্র আত্মসংযম দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তিনি নারী হইয়াও যে এত দূর উন্নত জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছেন, তজ্জন্য বারংবার তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে পিপ্পলায়নের পিতা পরলোকে গমন করিলেন। ভদ্রা ও পিপ্পলায়নই সমুদয় বিভবের অধিকারী। তাঁহারা সম্পদের অধিকার লাভ করিয়া অধিকতর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। দাস, দাসী, কৃষাণ, সকলেই তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট। একদিন পিপ্পলায়ন কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধানে গিয়াছেন। এদিকে ভদ্রা গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। একস্থানে কয়েকটী দাসী তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য তিল নিষ্পীড়ন করিতেছিল। ভদ্রা উহাদের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলেন, শত শত ক্ষুদ্র কীট তিলের সহিত নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। ঐরূপ জীবহিংসা দেখিয়া ভদ্রার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন, সংসার পাপপূর্ণ। সহস্র চেষ্টায়ও পার্থিব সংসারে বাস করিয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকা যায় না। পতি আগমন করুন, অদ্যই এই পাপ সংসার ত্যাগ করিব। আর এই চক্ষের উপর প্রাণিবধ সহ্য করিতে পারি না। পিপ্পলায়ন গৃহে আসিলে ভদ্রা সজল নয়নে তাঁহার নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রিয়ে! আমাদের উভয়ের এক সময়েই বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। আমি ক্ষেত্রে গিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ রুগ্ন বলদগুলি সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত হইয়া দ্রুত লাঙ্গল টানিতে পারিতেছে না, আর মূর্খ কৃষকগণ কুপিত হইয়া বারংবার তাহাদের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতেছে। ঐরূপ নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা দ্রব্যের অর্জ্জনে প্রয়োজন কি? সংসারের ভার বহনে বস্তুতই শ্রান্ত হইয়াছি, চল আমরা আমাদের পার্থিব সম্পদ অর্থিদিগকে দান করিয়া শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি।" তাহার পর পিপ্পলায়ন তাহাই করিলেন। সমস্ত ক্ষেত্র, পশু, গৃহ, উদ্যান, জলাশয়, শয্যা, পরিচ্ছদ, সুবর্ণাদি যাচকদিগকে প্রদান করিলেন। তাহার পর তাঁহারা বহুপুত্র নামক চৈত্যে গিয়া ভগবান্ বুদ্ধের শরণাগত হইলেন। ভগবান্ সেই স্থানেই তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ দম্পতী ভগবানের নিকট হইতে শুদ্ধবোধ লাভ করিয়া সম্যক্ সম্বুদ্ধ পদ লাভ করিলেন।*

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

গিন্নীর পরিচয়।

ষ্টীমার হইতে নামিয়া
আমি ও গিন্নি বসেছি তীরে, সঙ্গে একটা ঝি;
কোথা হতে বুড়ী আসিয়া
শুধাল আমায়, "কে হন্ তোমার এই যে সঙ্গীটী?"
ক'নু গম্ভীর হইয়া,
"শালী হন্ উনি, চলেছি উহার বাপের বাড়ীতেই।"
তখন সে বুড়ি ফিরিয়া
শুধাল আমায়, "তোমার নারীর বড় হন্ উনি কি?"
কহিনু খানিক ভাবিয়া,
"বড় বল তায়? নাই কি তোমার বুদ্ধি একটু ছি!"
সে কহে লজ্জা পাইয়া,
"ছোট শালী? বটে, বুড়ি ঝুড়ি মানু, তাই আমি বুঝি নি।"
এবার মাথাটি নাড়িয়া
ছোটও যে নয় একথাটি আমি তাহারে জানায়ে দি।
তখন সে কহে হাসিয়া,
"তোমার চালাকি বুঝেছি হে বাবু, আমরি হি হি হি।
যতই রাখ না লুকিয়া,
এখন বুঝেছি উনি তব স্ত্রীর নিখুঁত সমানটি।"
এদিকে গিন্নী রাগিয়া
কহিছে আমায় "বুঝিব, অগ্রে বাড়ীতে যাইয়া নি।"

রঙ্গিয়া।

১

ত্রিকূট পর্ব্বতের বৃক্ষচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন বন্ধুর পাদদেশে ছয় লালের ঘর। রঙ্গিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরের একমাত্র অধি-

* এই গল্পটি রায় শরচ্চন্দ্র বাহাদুর সি, আই, ই কর্তৃক তিব্বত হইতে আনীত "অবদান কল্পলতা" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের কোন উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। লেখক।

খরী। ছন্নু বড় দরিদ্র। কিন্তু রঙ্গিয়ার অগাধ প্রেম, অপরিসীম স্নেহ ছন্নুর দুঃখময় জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। রঙ্গিয়ার সেই সরলতাপূর্ণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া ছন্নু সংসারের সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। দুঃখে হউক, কষ্টে হউক, ছন্নু ভাবিত তাহার দিনগুলি বেশ যাইতেছে। ছন্নুর রঙ্গিয়া ছিল, আর রঙ্গিয়ার ছন্নুলাল ছিল। ইহা ভিন্ন আপনার বলিতে পৃথিবীতে তাহাদিগের কেহ ছিল না।

রঙ্গিয়া মাছ ধরিত, আর তাহাই হাটে লইয়া গিয়া বেচিত। ছন্নুও যে বসিয়া থাকিত তাহা নহে। সে পর্ব্বত হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিত। কোন কোন দিন মাছ ধরা ছাড়িয়া রঙ্গিয়াও ছন্নুর সহিত কাষ্ঠ আনিতে যাইত। রঙ্গিয়া বেশ গাহিতে পারিত। ছন্নু যখন গাছে উঠিয়া রঙ্গিয়ার জন্য ফল ফুল পাড়িত, রঙ্গিয়া তখন একটি উচ্চ শৈল-পৃষ্ঠে বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে গান গাহিত। আর প্রভাত শিশিরসিক্ত কুসুমের মত সুন্দর রঙ্গিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ধীরপবন-সঞ্চালিত ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামের দিকে চাহিয়া—কঠিন পাষাণ বক্ষে দূরপ্রতিহত সেই মধুর গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে ছন্নু আপনা হারা হইত। সে সকল ভুলিয়া প্রেমার্দ্র স্নেহ করুণ স্বরে ডাকিয়া উঠিত, "রঙ্গিয়া—"। রঙ্গিয়া বন দেবীর মত ছন্নুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।

এমনি করিয়া রঙ্গিয়া ও ছন্নুর দিনগুলি, পর্ব্বত গাত্র-নিঃসৃতা স্বর্গের প্রেমধারার ন্যায়, বহিয়া যাইত।

২

এখন আর রঙ্গিয়া হাটে মাছ বেচিতে যায় না। ত্রিকূট হইতে ২ মাইল দক্ষিণে "বাবুজীর" কুঠীতে মাছ দিয়া আসে। "বাবুজী" একজন বাঙ্গালী বাবু। রঙ্গিয়া হাটে যাহা পাইত বাবুজী তাহার দ্বিগুণ দিয়া রঙ্গিয়ার মাছ ক্রয় করিত।

রঙ্গিয়া ছন্নুলালকে "লালজী" বলিয়া ডাকিত। এক দিন মাছ বেচিয়া আসিয়া রঙ্গিয়া বলিল, "লালজী, আমি বাবুজীর কুঠীতে নকরী করিব। চার টাকা আমার তলব মিল্‌বে।"

ছন্নু বলিল "নকরী করিয়া কি হইবে রঙ্গিয়া? আমরাত এমনি বেশ আছি।"

মাথা নাড়িয়া রঙ্গিয়া বলিল "উঁহু তা হবে না। আমি তোমাকে একদিনও ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি না। নকরী করিলে রোজ রোজ ভাত পাইব। তাতেই আমাদের বেশ খাওয়া দাওয়া হইবে। আমি সকালে যাইব, আর সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিব।"

ছন্নুর মুখ কালি হইয়া গেল। সে অতি ধীরে বলিল, "সকালে যেয়ে রাত্রে ফিরে আসা—এতক্ষণ!"

রঙ্গিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা ভয় কি? তুমিও না হয় এক একবার যাইও, লালজী।"

লালজী যেন অকূল সাগরে কূল পাইল। রঙ্গিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা"।

৩

আজ রঙ্গিয়া নকরী করিতে যাইবে। ছন্নু তাহাকে কত উপদেশ দিল, কত কথা শিখাইল। তারপর রঙ্গিয়ার সঙ্গে সঙ্গে "বাবুজীর" কুঠী পর্য্যন্ত গেল। কুঠীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রঙ্গিয়া কহিল, "যাই লালজী। তুমি ঘরে যাও। সন্ধ্যার সময় আমি ফিরিব।"

রঙ্গিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহার ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ ছন্নু চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। রঙ্গিয়া চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে ছন্নু গৃহে ফিরিয়া আসিল। ছন্নুর কেমন ভাল লাগিতেছিল না। সেই কুটীর—কুটীরের সেই সব পরিচিত ছিন্ন ভগ্ন মলিন তৈজস পত্র—সেই সব। কিন্তু ছন্নুর চোখে জল আসিতেছিল। একজনের সঙ্গে সঙ্গে যেন ছন্নুর জীবনের সমস্ত সুখটুকু চলিয়া গিয়াছিল। যে যাহাকে ভালবাসে, সে কাছে না থাকিলে বুঝি এমনি হয়। ছন্নু কতবার মনে মনে ডাকিল, "রঙ্গিয়া—রঙ্গিয়া—"।

আজিকার দিনটী যেন অতিশয় দীর্ঘ! ছন্নু কতবার ঘর বাহির করিল। কিন্তু দিন যেন আর যায় না। অবশেষে পর্ব্বতের ছায়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া ছন্নুর

গৃহ ঢাকিয়া ফেলিল। আকাশ হইতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। কই রঙ্গিয়াত এখনও আসিল না।

সন্ধ্যা চলিয়া গিয়া রাত্রি হইল—রঙ্গিয়া কৈ? ওই বুঝি আসিতেছে—ওই বুঝি রঙ্গিয়ার পদশব্দ। এমনি করিয়া ছন্নু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল—তবু রঙ্গিয়া আসিল না।

ভীত, ত্রস্ত ছন্নু বাবুজীর কুঠীর দিকে অগ্রসর হইল। সম্মুখে শব্দ হইবামাত্রই ছন্নু ডাকে "রঙ্গিয়া—"। দূর হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসে, "রঙ্গিয়া—"।

কুঠীরের সম্মুখে আসিয়া ছন্নু দেখিল—সমস্ত নিস্তব্ধ কোথাও কেহ নাই—ফটক অর্গলবদ্ধ। ছন্নু ফটক ধরিয়া নাড়িল। কাহারও কোন সাড়া শব্দ পাইল না। তাহার বুকের ভিতর হইতে কে যেন থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল, "রঙ্গিয়া।" কিন্তু ছন্নু মুখ ফুটিয়া ডাকিতে পারিল না।

সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে একাকী ছন্নু সেই বৃহৎ ফটকের সম্মুখে বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রত্যূষে যখন একজন ভোজপুরী দরওয়ান আসিয়া ফটকের দ্বার খুলিল, তখন ছন্নু তাহাকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, "রঙ্গিয়া "।

দরওয়ান হাসিয়া উঠিল।

সমস্ত রজনী জাগরণে ছন্নুর চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার মুখ বিশুষ্ক। সেই আরক্ত নয়ন হইতে দুই ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল। ছন্নু আবার বলিল, "আমার রঙ্গিয়া"।

দরওয়ান ছন্নুকে গালাগালি দিল, অবশেষে প্রহার করিল। কিন্তু ছন্নু নড়িল না। সে জোড় হস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল বলিতে লাগিল, "আমার রঙ্গিয়া "।

ছন্নু গেল না দেখিয়া "বাবুজীর" পরামর্শক্রমে পুলিশ আসিল ও ছন্নুকে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। ছন্নু কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "রঙ্গিয়া, আমার রঙ্গিয়া"।

* * * * * *

তারপর কয়েকদিন চলিয়া গেল। রঙ্গিয়া কিন্তু টলিল না। অর্থ রঙ্গিয়াকে ক্রয় করিতে পারিল না। রঙ্গিয়া পার্ব্বত্য-কন্যা, ভয় কাহাকে বলে জানিত না। তাই ভয়েও সে টলিল না। তাহার মুখে সেই এক কথা—

"বাবুজী, জান লেও, ধরম দেগা নেহি।"

রঙ্গিয়া টলিল না বটে, কিন্তু পলায়ন ত করিতে পারিল না। পিশাচের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে যাইবার শক্তি রঙ্গিয়ার ছিল না। একদিন সন্ধ্যার সময় বড় ঝড় আরম্ভ হইল। "বাবুজী" একখানি ছোরা লইয়া রঙ্গিয়ার পিঞ্জরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঙ্গিয়া একটু শিহরিয়া উঠিল, তারপর কাঁদিয়া কহিল, "বাবুজী, আমি তোমার লেড়্কী, আমার ধরম ভিক্ষা দেও।"

উন্মত্ত পিশাচ তাহা শুনিল না। সতীর সহায় স্বয়ং ভগবান্। রঙ্গিয়া বাবুজীকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, সেই ধাক্কায় বাবুজী মেজের উপর পড়িয়া গেলেন। রঙ্গিয়া আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিল না, সেই শাণিত ছোরা তুলিয়া লইয়া বাবুজীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইয়া কড়্ কড়্ করিয়া মহাশব্দে আকাশের মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া ত্রিকূটের বুকের ভিতর সেই প্রতিধ্বনি ক্ষিপ্তের মত ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। রঙ্গিয়া, রঙ্গিয়া ? রঙ্গিয়া আর নাই। সেই অন্ধ তমোরাশির ভিতর সেই প্রলয়ের ভীষণ ঝটিকার মধ্যে ছন্নুর রঙ্গিয়া যেন কোথায় মিশিয়া গেল!

৫

তিনমাস কারাবাসের পর ছন্নু মুক্ত হইল। ছন্নুর সে কান্তি নাই, সে শান্তি নাই, সে শক্তি নাই। ছন্নু যেন মরিয়া গিয়াছিল। ছন্নু আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল রঙ্গিয়া নাই। গৃহ নাই, গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই। ছন্নু দেখিল তাহার সব গিয়াছে! ছন্নু আর কাঁদিল না। তাহার সেই কত সুখস্মৃতির লীলা ভূমির রঙ্গিয়ার সেই তরল হাস্যমুখরিত গৃহের ভিঁটার উপর ছন্নু মাথায় হাত দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। জীবনের ধ্রুবতারা বিসর্জ্জন

দিয়া পতি যেমন নগ্ন শ্মশানে নির্ব্বাপিত চিতার শীতল অঙ্গারের উপর বসিয়া থাকে, ঠিক সেই রকম।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল, ছন্নু নড়িল না। গ্রামের লোক আসিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গেল! ছন্নু কাহারও সহিত কথাও কহিল না। ক্রমে ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসিল। ছন্নু তখনও সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া রাত্রি আসিল, ছন্নু তখনও বসিয়া।

সেদিন পূর্ণিমার রজনী। ছন্নুর ব্যথিত হৃদয়ের দিকে চন্দ্র চাহিল না, তাহার মস্তকের উপর দিয়া অযুত রজত-রশ্মি ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ছন্নু উঠিল না, বসিয়াই রহিল।

অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, সেই পার্ব্বত্য-ভূমি কম্পিত করিয়া, সেই উচ্ছলিত চন্দ্রকর-স্রোত আলোড়িত করিয়া, কে যেন দূরে, বহুদূরে ডাকিয়া উঠিল,

"বাবুজী, জান লেও, ধরম দেগা নেহি।"

ছন্নু শিহরিয়া উঠিল। বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবার সেই শব্দ—"বাবুজী, জান লেও, ধরম দেগা নেহি।"

ছন্নু উন্মাদ হইল।

নিকটে, নিকটে, ক্রমে আরও নিকটে সেই শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল!

উন্মাদ ছন্নু উন্মাদের মত ডাকিল, "রঙ্গিয়া, রঙ্গিয়া, মেরি জান, মেরি কলিজা।"

রঙ্গিয়া হাসিয়া উঠিল "হি হি হি।"

রঙ্গিয়া উন্মাদিনী।

আবার ছন্নু ডাকিল, "রঙ্গিয়া রঙ্গিয়া।"

রঙ্গিয়া আর সেস্থানে দাঁড়াইল না। যেন ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল "বাবুজী, জান লেও, ধরম দেগা নেহি।"

ছন্নুলালও পাগলের মত রঙ্গিয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

রঙ্গিয়া ত্রিকূট-শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল, তাহার পশ্চাতে পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছন্নুর সেই মর্ম্মভেদী আকুল আহ্বান ধ্বনিত হইতে লাগিল "রঙ্গিয়া, রঙ্গিয়া।"

ছন্নু যখন রঙ্গিয়ার খুব নিকটবর্ত্তী হইল, তখন উন্মাদিনী রঙ্গিয়া পর্ব্বত হইতে নিম্নে লাফাইয়া পড়িল। আর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছন্নু ও লম্ফ প্রদান করিল। তখনও রঙ্গিয়ার সেই আর্ত্ত-করুণস্বর পর্ব্বতের বুকে বুকে ধ্বনিত হইতেছিল। তখনও শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনি ডাকিয়া বেড়াইতেছিল—

"বাবুজী, জান লেও, ধরম দেগা নেহি।"

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

শিক্ষা ও নারী চরিত্র।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—

উক্ত বচনটি নারীজাতির মহাগৌরবাত্মক। বাস্তবিকই দেবস্বভাবসম্পন্না নারীগণ পৃথিবীতে দেবতার প্রতিচ্ছায়া এবং সর্ব্বথা আমাদের পূজার্হা।

বিধাতার মূর্ত্তিমতী করুণা ও কোমলতা যে দেশে লাঞ্ছিতা ও অনাদৃতা, সে দেশের কল্যাণ যে সুদূরে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। একবার কোন ইংরাজকে তাঁহাদের জাতীয় গৌরবের মূল কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"mothers"—জননীগণ। এ কথাটীতে গভীর সত্য নিহিত আছে। জননী-হৃদয়েই জাতীয় উন্নতির বীজ লুক্কায়িত। যেখানে নারী শিক্ষিতা, পূজিতা ও সম্মানিতা, সেখানে সন্তানগণও মনুষ্যত্ব-ভূষিত, আত্মসম্মান-বিশিষ্ট।

একদিন আমাদের এই ভারতভূমি জ্ঞানগৌরবশালিনী মনস্বিনী রমণীগণের পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি অক্ষয়কীর্ত্তি-শালিনী রমণী। এই ভারতেই তাঁহাদের কীর্ত্তিগাথা "অনন্ত কালের কণ্ঠে প্রবাদের মত" চিরদিন জগতে ঘোষিত হইবে; এবং যত কাল অতিবাহিত হইতেছে, ততই তাঁহাদের পুণ্যচরিত্রের মধুর প্রভাব অগুরু চন্দনের গন্ধের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীতে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

যখন ভারতে এই সকল রমণীকুলের আবির্ভাব হইয়া-

ছিল, তখন ইহার-মুখশ্রী বিষাদ ও কলঙ্ক-কালিমাচ্ছন্ন ছিল না। সে সময়ের শুভ্র যশোরশ্মি কালের বহুযুগ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আজিকার ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারত-গগনেও নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতে পাওয়া যায়।

জানিনা কিরূপে ভারত ভূমির উপরে দেবতার অভিশাপ পতিত হইল! যে ভারতে একদিন কোমল নারীকণ্ঠে ধর্ম্মবীরের উৎসাহপূর্ণ বাক্য—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্" উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই অমৃত মন্ত্রের উপাসিকা নারীর পরবংশীয়াদিগের উপর কেমন করিয়া মৃত্যুর ছায়া-যবনিকা পতিত হইল!! নির্ম্মল জ্ঞানসূর্য্য অজ্ঞান-জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইল, ভারত রমণীর সমুজ্জল মহিমা-মুকুট ধূলিতে লুণ্ঠিত হইল!!

এখন পূর্ব্বোক্ত মনস্বিনী নারীদিগের কীর্ত্তি-গাথা কেবল অতীতের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন আমরা অনেক সময় বিশ্বাসই করিয়া উঠিতে পারি না যে যথার্থই এক সময়ে ভারতে খনা ও লীলাবতীর ন্যায় বিদুষী রমণীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে আবার ভারতে এক শুভশংসী নব-যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষালোক আশার সংবাদ লইয়া ভারত নারীর দ্বারে সমুপস্থিত। আমাদের দুই একটী ললনা এই আলোকে চক্ষু খুলিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু চারিদিকে সাধারণ নারীকুলের মধ্যে এখনও জড়তার রাজ্য সম্প্রসারিত। এবং যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তাঁহাদেরও প্রকৃত বাঞ্ছনীয় শিক্ষালাভ হইতেছে কিনা সন্দেহ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরূপিত কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া উচ্চ উপাধি লাভ করার নাম শিক্ষা নহে। সেক্স-পিয়ারের সারগর্ভ বচনাবলী উদ্ধৃত করিতে বা মার্টিনোর চরিত্র-নীতির সূক্ষ্ম আলোচনা করিতে সমর্থ হইলেই শিক্ষালাভ করা হয় না। যখন উপদেশ জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, যখন চরিত্র "নীতি ও ধর্ম্ম" হইয়া যায়, তখনই আমরা 'শিক্ষিত' আখ্যা গ্রহণ করিতে পারি। কলেজগৃহে বা আলোচনা সভায় বিবেকের চুলচেরা বিচার করিয়া যদি সামান্য একটী পরীক্ষায় বিবেকবাণী উল্লঙ্ঘন করিয়া বসি, তবে সে শিক্ষার যে অল্পই সার্থকতা আছে, আশা করি কেহ ইহা অস্বীকার করিবেন না।

কিন্তু তথাপি আশা হয়; যুগব্যাপী মরণ-নিদ্রার মধ্যে জীবনের জাগরণ দেখিলে প্রাণ স্বতঃই পুলকিত হইয়া উঠে। উষার প্রকাশে নবোদিত অরুণ-কিরণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অবসর অন্বেষণ করিতেছে এবং যে মহিলাবর্গ সেই প্রাণপূর্ণ শিক্ষালোককে হৃদয়-অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতে-ছেন আমরা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করি।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তথাকথিত শিক্ষিতা মহিলাবর্গ এখনও প্রকৃত শিক্ষার মূল উৎসের সন্ধান পান নাই। সেখানে জল কিরূপ নির্ম্মল ও কলঙ্কপরিশূন্য দেখিতে পাইলে তাঁহারা কখনই শিক্ষার উপরে ভাসমান সমল ফেনপুঞ্জের মোহে মুগ্ধ হইতেন না।

কারণ এখন শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষার খোসার আদর অধিক। আমাদের দেশের শিক্ষিতা নারীগণ পাশ্চাত্য রমণীগণের বেশভূষা, কণ্ঠস্বর, এমন কি চলন ফেরণের আদব কায়দা পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতে একান্ত লালায়িত! এই উদ্দেশ্যে অনেকে অনেকরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া আপনাদের রমণীয় স্বাভাবিকতাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং জগতের সম্মুখে দাঁড়-কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের অভিনয় করিয়া লোক হাসাইয়া থাকেন। কিন্তু ইংরেজ রমণীর ঋজু উন্নত চরিত্রগরিমা অনুকরণ করিতে কাহাকেও তেমন লালায়িত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের সে সহজ আত্মসম্মান, বিপদে অতুলনীয় সাহস ও মনের বল, সে উন্নত স্বাধীন ব্যক্তি-ত্বের অনুভূতি কেহ এ সকলকে চরিত্রগত করিতে যত্নশীলা নহেন। যাহা অনায়াসলভ্য এবং বিনা সাধনায় সম্পন্ন হইতে পারে, শিক্ষার সেই বাহিরের "চটক" লাভ করিবার জন্যই অনেকে ব্যাকুল। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কুঞ্চিত বসন, করে যষ্টি ও নাসিকায় চসমা ধারণ বা অনুকরণ-লব্ধ উচ্চ সূক্ষ্ম কণ্ঠস্বরের সহিত শিক্ষার অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাবর্গকে অনেকেই বিলাসিতা দোষে দোষী সাব্যস্থ করিয়া থাকেন। ইহাতে কিছু অতিরঞ্জন থাকিলেও কথাটা সম্পূর্ণ অলীক নহে। অবশ্য শিক্ষিতা নারীগণ অশিক্ষিতাদিগের ন্যায় বেশভূষা করিয়া লজ্জার মাথা থাইবেন এ আশা করা অস্বাভাবিক ও অন্যায়। তাঁহারা শেমিজ বা জ্যাকেট পরিধান করিবেন না, যদি কেহ এরূপ হুকুম চালাইতে যান—তবে সে হুকুম যে সময়ের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া নারীগণ বসনের বিচিত্র বাহার এবং চলিবার ফিরিবার কায়দাবিশেষকে যদি শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ মনে করিয়া তাহারই গর্ব্ব অনুভব করেন এবং বাবুয়ানা করিয়া একান্ত দুরধিগম্য জীবে পরিণত হইয়া সংসারের সামান্য দৈনন্দিন কার্য্যাবলীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে থাকেন—তবে সেটী তাঁহার মহৎ দোষ। অনেকেই বাহিরের চটকে মুগ্ধ হন—ইহাই আমাদের দুঃখ। অনেকে প্রকৃত শিক্ষাকে ঘরে না তুলিয়া বিকৃত বিলাসিতাকে গৃহে বরণ করিয়া তুলেন এবং সেই বিলাসিতা স্বহস্তপরিপুষ্টা ভুজঙ্গিনীর মত শেষে অন্নদাত্রীরই প্রাণবধ করিয়া বসে।

কিন্তু কেহ যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার ইচ্ছাকে বিলাসিতার সহিত ভ্রম করিয়া না বসেন। সাধ্যানুসারে পরিষ্কার থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ বাহিরের পরিচ্ছন্ন ভাব মনের শুদ্ধতার সহায়তা করে, ইংরাজীতে একটি বচন আছে—Cleanliness is next to godliness ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ফল কথা, বিলাসিতা জ্যাকেট মোজায়, রুমাল চসমায় বা রেশম শাটিকায় আবদ্ধ নহে। বিলাসিতা মনের ব্যাপার—মনের সহিত ইহার সম্বন্ধ। একজন সুবর্ণমণ্ডিত হইয়াও আপনাকে সম্পূর্ণ বিলাসিতা পরিশূন্যা রাখিতে পারেন, আবার অন্য এক জনের ছিন্ন কন্থার প্রত্যেক ছিদ্র হইতে বিলাসিতা উঁকি দিতে থাকে। বাহিরের বৈরাগ্য-লক্ষণ অনেক সময়ে অন্তরের সৌখিন বিলাসিতার আবরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু নীতি ও চরিত্র বাহিরের সকল লক্ষণের অতীত। মনের ইচ্ছা রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্তরের দীনতা ও বৈরাগ্য স্বাভাবিকরূপে বিকশিত হইয়া উঠিবে এবং তখন হংসী যেমন সমল সলিলে শতবার অবগাহন করিলেও কোনরূপ মলিনতা তাহার নির্ম্মল শুভ্র পক্ষপুটকে কলুষিত করিতে পারে না, তেমনি নারীগণ শতবিলাসদ্রব্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত লালিত পালিত হইয়াও বিলাসিতা হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন।

আর একটি দোষ যাহা সচরাচর শিক্ষিতা নারীদিগের উপর অর্পিত হইয়া থাকে তাহা এই—লজ্জাশীলতার অভাব। ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক ভাবে সত্য—এবং যথার্থই পরিতাপের বিষয়। লজ্জা নারীর একটি প্রধান ভূষণ। নারী চরিত্রে লজ্জাহীনতা অতিশয় বিসদৃশ ও অশোভন ব্যাপার। কিন্তু অনেক সময় লজ্জাশীলতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার দোষে শিক্ষিতাদিগের উপর অযথা দোষারোপ করা হইয়া থাকে। লজ্জাশীলতার অর্থ —আপাদ-মস্তক-বসনাবৃত-জড়সড়ভাব নহে। উহাকে "আড়ষ্টতা" বলা যাইতে পারে এবং উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা উচিত। আমরা জানি কোন কোন স্ত্রীলোক যাঁহারা "অসূর্য্যম্পশ্যরূপী" বলিয়া আখ্যাত, তাঁহারা সুদীর্ঘ ঘোমটার অন্তরাল হইতে অনেক সময় যেরূপ নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অতীব লজ্জাকর। এরূপ লজ্জা, লজ্জার ভাণ মাত্র—বাহিরের শাসনের ভয়প্রসূত। যেমন মস্তকের উপর দোদুল্যমান শাসনদণ্ড অপসৃত হয়, অমনি লজ্জাদেবীও তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিতে থাকেন।

আবার অন্য দিকে সূর্য্যকে মুখখানি দেখাইলেই লজ্জাহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় না। রেলওয়ে ষ্টেশনে ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গাড়ীতে উঠিলেই 'বেহায়া' হওয়া হয় না। প্রয়োজন হইলে স্বামির নাম লওয়াতেও নির্লজ্জতা প্রকটিত হয় না। এই থানে একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একদা একটি ভদ্রলোক আপনার স্ত্রীকে লইয়া রেলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। স্ত্রী, মহিলাদের কামরায় ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে ট্রেণ্ পৌছিল, স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি নামিয়া

পড়িলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি সমস্ত রাত্রি জাগরণ বশতঃ হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি নামিতে পারেন নাই। তখন স্ত্রীলোকটি স্বামীকে নামিতে না দেখিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে কুলিকে বলিলেন—"ওগো তোমরা তাঁকে ডেকে দাও না।" কুলি বলিল—"মাইজি, বাবুর নাম কি?" মাইজি মূর্ত্তিমতী লজ্জা, তিনি কি স্বামীর নাম লইতে পারেন? কেবল আকুলভাবে কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওগো তাঁকে ডেকে দাওনা।" কুলি বলিল—"মাইজি কোন্ গাড়ীতে বাবু আছেন দেখাইয়া দিন্।" তখন গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। মাইজির একটি অঙ্গুলি সঙ্কেতে অনেক কষ্টে কুলি "বাবু বাবু" করিয়া ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙাইল। ভদ্রলোক কোন গতিকে চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া সে যাত্রা লজ্জারূপিণীর লজ্জা নিবারণ করিলেন।

আসল কথা বিলাসিতার ন্যায় লজ্জাশীলতাও ভিতরের জিনিস, সুদীর্ঘ ঘোমটা বা স্বামীর নাম উচ্চারণের সহিত ইহার অল্পই সম্বন্ধ আছে। তবে ভিতরে এই লজ্জাশীলতায় ভাব বিদ্যমান থাকিলে বাহিরে তাহা কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে কেহ যদি কেবল ভাণ বা অন্যায় জড়তার ভাব লইয়া নাড়া চাড়া করেন, তবে তাহা একদিকে যেমন অশোভন, অন্যদিকে তেমনি উপহাসজনক হয়।

এই সঙ্গে আর একটি কথার উত্থাপন করা আবশ্যক। এক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মনে দেশীয় সকল জিনিসই মন্দ বলিয়া ধারণা ছিল। রমণীকুল এই ধারণা হইতে বাদ যান নাই। সুতরাং তাঁহারাও ঘরের নিষ্ঠা ভক্তি, সংযম ব্রত, বিনয় বাধ্যতা, লজ্জা কোমলতা প্রভৃতি পরিহার করিয়া বাহিরের দোষগুলি পর্য্যন্ত হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতেছিলেন। কিন্তু এখন স্রোত ফিরিয়াছে। নব্যালোকে দেখিতে পাইতেছে যে বাহিরের সকল জিনিসই ভাল নহে—ঘরের সকল জিনিসই মন্দ নহে। তথাপি অন্ধ অনুকরণের স্রোত এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই।

যেখানে যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ করিয়া চরিত্রের উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ইহাই প্রকৃত শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পূর্ব্বে অযথা গোঁড়ামি ও একদেশদর্শিতা নিবন্ধন ভারতীয় নারী তাঁহার বিদেশীয় ভগ্নীর সাধু গুণাবলীকেও বিজাতীয় ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন। পরে আবার অনুরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইল। ঘরের যাহা কিছু সকলই দূষনীয় বলিয়া লোকের ধারণা জন্মিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সমন্বয়ের শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সমন্বয়েই প্রকৃত উন্নতি। ভারতীয় নারীর নিষ্ঠা ভক্তির ভিত্তির উপর যে দিন পাশ্চাত্য রমণীর সার্ব্বজনীন প্রীতি ও উদার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই দিন যথার্থই মণি-কাঞ্চন যোগে শিক্ষার সফলতা সাধিত হইবে।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শিক্ষিতা নারীদিগের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে কৃতজ্ঞ। তাঁহারা নৈতিক সাহসের বলে জড়ভাবাচ্ছন্ন সাধারণ ভারতীয় নারী প্রকৃতিকে জাগাইয়া পুনরায় পূজ্য ও গৌরবাস্পদ করিয়া তুলিতেছেন। অতএব পরিবর্ত্তনের অধিনায়িকাদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ ত্রুটি অপরাধ থাকিলেও তাহা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষার আলোকে অচিরেই আপনাদের ত্রুটি দেখিতে পাইবেন এবং উহা পরিহার করিয়া শ্যামিকাপরিশূন্য সুবর্ণের মত ভারতমাতার অঙ্গের আভরণ স্বরূপা হইবেন।

শিক্ষিতাগণ সমাজের আশাস্থল। এই জন্য সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহাদের দু একটি দোষের উল্লেখ করা গেল। এখন বিশেষভাবে শিক্ষিতাদের কথা ছাড়িয়া সাধারণ ভাবে নারী চরিত্রের কথা ভাবিলে কয়েকটি দোষ আমাদের চক্ষে পড়ে—যাহা নারীর স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে হয়। এই দোষগুলির পরিহারের একমাত্র উপায়—প্রকৃত শিক্ষা। আমরা বারান্তরে সেই দোষ গুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শিশুপালন।

শারিরীক বিধি।

ছেলে পুলে যে কিরূপে মানুষ করিতে হয় আমরা বাঙ্গালা জাতি তাহার কিছুই জানিনা বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। "মানুষ করা" মানে আমরা জানি কোনও রকমে বাঁচাইয়া রাখা। কিরূপে যে ছেলে বড় হইয়া সুস্থকায় ও সবল হইবে, মনে সাহস ও উৎসাহ থাকিবে, এবং বুদ্ধি ও সৎবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইবে, তাহার বিশেষ কিছুই চেষ্টা করি না। এরূপ না করার ফল হাতে হাতে ফলিতেছে, তবুও আমরা চোখ মেলে দেখি না। দিন দিন লোক কত খর্ব্বাকৃতি, হীনবল, ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে। কত সংসার দেখি কেবল অল্পবয়স্কা বিধবায় পরিপূর্ণ। মনে সাহস উৎসাহ নাই বলিলেই চলে।

আর বুদ্ধি ও সৎপ্রবৃত্তি আছে কি না আছে তোমরাই জান। তবে অতুল এগ্‌জামিন্ পাশ করিবার ক্ষমতা ও তার অব্যবহিত পরেই মন্দাগ্নি ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, এবং আর একটু বড় হইয়াই দলাদলি ও পরচর্চ্চা, উত্তর দিবার সময় ভুলিও না।

এই সকল অনিষ্টগুলি কিরূপে বারণ করা যাইতে পারে। শারীরিকই বল, আর মানসিকই বল, এমন শিখাইবার প্রশস্ত সময় আর সারা জীবনে নাই। এই সময় দেহ যেমন নরম, মনও তেমনি কোমল। যেরূপে ইচ্ছা গড়িতে পারিবে ও তাহাই আজীবন থাকিবে। ভবিষ্যতে যে কোনও পরিবর্ত্তন কষ্টসাধ্য।

এই সময়ে শরীর দিন দিন বাড়ে, মন নূতন শিখিতে বড়ই ব্যস্ত। এবং শরীরেও ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন অনায়াসেই ঘটান যায় ও এখনকার অভ্যাসই চিরকাল প্রবল থাকিবে। এই কটি কথা স্মরণ রাখিয়া দেখা যাউক শিশুপালনের সর্ব্বাপেক্ষা সৎপ্রণালী কি?

শিশু বলিতে গেলে কোন্ বয়স হইতে কোন্ বয়স অবধি বুঝায় তাহা প্রথমে বলিয়া দিই, তবে সে সময়কার কর্ত্তব্য বুঝা যাইবে।

"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষানি দশ বর্ষানি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়ষে বর্ষে পুত্রং মিত্র বদাচরেৎ॥"

এটি নীতিকুশল কবি চাণক্যের উক্তি। ইহার অর্থ—পাঁচ বৎসর অবধি লালন পালন করিবে। পোনের বৎসর অবধি তাড়না করিবে। ষোল বৎসরে পড়িলে পুত্রের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিবে।

অর্থাৎ পাঁচবৎসরে যে লালন পালন করিবে এ যেন মার অধীনে। আর সব ভাল কথায় করা চাই। তখন তাড়নার সময় নয়, তখন তাড়নার উপকারিতাও বোধ হয় নাই। তাড়নায় তখন বরং অপকারিতা আছে। তখন তিরস্কার প্রহারের মানে শিশু বুঝে না। নিষ্কলঙ্ক হইয়া জন্মায়, তারপর যদি কিছু কুশিক্ষা হইয়া থাকে তো সে তোমার দোষে হইয়াছে। তুমি আপনার ঘর সামলাইয়া তাহাকে শিক্ষা দাও, সে ত বাহিরের লোকের সহিত তত বেশী মিশে না, সম্পূর্ণ তোমার ক্ষমতাধীনেই রহিয়াছে। শিখাইতে হইলে তুমি সৎদৃষ্টান্ত দিয়াই শিখাও, জোর জবরদস্তি করিয়া শিখাইতে পাইবে না। ফুটোন্মুখ মুকুলে এত রূঢ় হস্ত সহিবে না। তাহাতে সনাতন বৃত্তি সকল রুদ্ধ হইয়া পড়িবে—মনে সাহস ও উৎসাহের অভাব হইবে। ছোট বয়স হইতে "খ্যাচ্ খ্যাচ্" করিয়া আমাদের দেশে এইরূপই হইতেছে।

পাঁচ বৎসর হইতে পোনের বৎসর অবধি তাড়না করিবে, ইটি যেন পিতার অধীনে। পাঁচ বৎসরে হাতে খড়ি হইয়া যখন গুরুগৃহে বা পিতার শাসন দণ্ডের অধীনে আসিল তখন তাহার চিন্তা শক্তি অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার কিছু ক্ষমতা আসিয়াছে, তখন তাড়নার ফল হইবে। আর এখন তো আর শুধু ঘরে আবদ্ধ নাই যে শুধু আদর্শ দেখিয়া শিখিবে। এখন নানা লোকের সহিত মিশিতেছে—নানা রকম দৃষ্টান্ত পাইতেছে সেগুলি হইতে সামলাইতে হইলে তিরস্কার ও তাড়না চাই। এখন "Spare the rod and spoil the child" অর্থাৎ অধিক আদর দিলে ছেলে নষ্ট হইবে। তবে তাড়নারও সময় অসময় ও সীমা আছে, নতুবা উল্টা উৎপত্তি হয়। গুরুমহাশয়ের নিষ্ঠুর কঠোর সাজা ও পিতার অনবরত "পড় পড়" ধ্বনি উভয়ই অনিষ্টকর।

ষোল বৎসরে পড়িলে পুত্রের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিবে। তখন সে কর্ম্মক্ষমও হইয়াছে এবং মান অপমানও বোধ হইয়াছে। আপনার আপনি হইতে দাও। তখন আদর দিবারও সময় নয়, তাড়নারও সময় নয়।

শারীরিক ও মানসিক উভয় শিক্ষা-কার্য্যই মাতা

পিতার এবং সঙ্গী ও গুরু লইয়া সমাজের সকলেরই কিছু কিছু কর্ত্তব্য আছে। মার কর্ত্তব্য প্রথমেই আরম্ভ হয় ও পাঁচ বৎসর অবধি থাকে। তিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাহার লালন পালন কার্য্য সকলই প্রীতির সহিত সাধিত হয়। শিশুর সম্পর্ক পিতার অপেক্ষা মাতার সহিত অধিক। সচরাচর শিশু সাদৃশ্যে মার মতই বেশী হয়, ভালবাসাও মার উপর অধিক থাকে। কাল বাপ সুন্দর মা—ছেলেগুলিও সুন্দর; সুন্দর বাপ কাল মা—ছেলে গুলিও কাল। কাউকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছি না—কেউ যেন কিছু মনে করিও না। কেন এমন হয়? দশ মাস মার অঙ্গে মিশিয়া থাকে বলিয়া কি এত সাদৃশ্য? জন্মিবার পরও কিছুদিন মা ভিন্ন উপায় নাই বলিয়াই কি মার উপর এত ভালবাসা?

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

মার পর বাপের কর্ত্তব্যের পালা আসে। কিন্তু তখনও মার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হয় না!

উপস্থিত প্রবন্ধে আমি শুধু মার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিতে চাই।

পাঁচ বৎসর অবধি শিশুপালনের ভার বিশেষ রূপে মাতার উপরই ন্যস্ত থাকে। প্রথম দুই বৎসর শিশুকে দুগ্ধপোষ্য বলা যায়—সে তখন একান্ত অসহায়। বাকি তিন বৎসর কতকটা স্বাধীন ও সক্ষম, কিন্তু, বরাবরই অল্পবিস্তর মাতৃযত্ন-সাপেক্ষ।

জীবনের এই সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়। স্থূল স্থূল যাবতীয় শিক্ষা এই সময়েই উৎপন্ন হয়! শরীর মন দুইই যেন এক একখানি সাদা কাগজ। দেখিয়া শুনিয়া তাহাতে অঙ্কপাত হইবে। নূতন ভাজনে অঙ্ক চির-স্থায়ী—ইহ জন্মে মুছিবার নয়। শত শিক্ষায়, শত চেষ্টায় মুছিবার নয়। তবে অল্প বিস্তর প্রতিরুদ্ধ থাকিতে পারে। যৌবনের খরস্রোতে কতক ঢাকিয়া পরে আবার বার্দ্ধক্যের ভাটার সময় অনেক সময়ে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। ভবিষ্যতে যেরূপ অঙ্ক চাও তা এই সময়েই অঙ্কিত করো।

কি অঙ্ক উচিত, কি অঙ্ক বাঞ্ছনীয় তাহা এই বার দেখা যাউক। প্রথম কথা শরীর, দ্বিতীয় কথা মন।

শরীর সুস্থ সবল কিরূপে হয় তাহার এইগুলি প্রধান বিবেচ্য বিষয়:—খাদ্য—এই সময়ে বাড়িবার সময়। হজম শক্তিও চেষ্টা করিয়া বাড়াইলে সহজেই বাড়িবে। খাদ্যের পরিমাণ প্রচুর চাই এবং শিশু অবস্থায় অল্পক্ষণেই খাদ্য হজম হইয়া যায় বলিয়া নিয়ম মত ঘন ঘন খাইতে দেওয়া আবশ্যক। জল খাবার আদি সামান্য খাবার খাইবার দুই ঘণ্টা পরেই আবার ক্ষুধা পায় এবং ভাত রুটী লুচী আদি বিশিষ্ট আহারের পর চার ঘণ্টা পরে আবার খাইতে পারে। অর্থাৎ পেট ভরিয়া খাইবার পর চার ঘণ্টা এবং লঘু আহারের পর দুই ঘণ্টা বাদে আবার খাইতে পারে।

সকল বয়স এবং সকল অবস্থাতেই চড় চড়ে পেট ভরিয়া খাওয়া অপকারী, তাহাতে হজম হইতে দেরী হয় ও হজম শক্তি কমিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় অতি সহজে লিভর বিগড়াইয়া যায়। এবং এরূপ বিগড়াইলে একটু জোলাপ দেওয়া যুক্তি যুক্ত। অবশ্য ডাক্তারের মত না লইয়া নিজেরা বড় কিছু করিতে যেয়োনা।

পরিশ্রমের উপর কার্য্যের হজম অনেকটা নির্ভর করে। গুরুতর আহারের পর পরিশ্রম করিলে খাদ্য সহজে হজম হইয়া যায়।

নানা প্রকার আহার্য্য আছে। সে সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। যথা মাংস জাতীয়, তৈল জাতীয়, অন্ন জাতীয় ও চিনী জাতীয়। ইহা ছাড়া জল ও লবণ একান্ত আবশ্যকীয়।

মাংশ জাতীয় খাদ্য—যথা মাছ মাংশ ডিম দুধ ডাল ইত্যাদি। ইহা খাইলে শরীরে মাংশ পেশী বাড়ে, শরীর ও বল পরিবর্দ্ধিত হয়। ছেলে বয়স বাড়িবার সময় বলিয়া এই জাতীয় খাদ্য একান্ত আবশ্যকীয়। যাহারা যথা নিয়মে ছেলে বয়সে মাংস ডিম ডাল দুধ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খাওয়ায়, তাহার বারন্ত গড়ন, সবল শরীর ও সুস্থকায় হইয়া থাকে। ইংরাজ ও মুসলমানদের ছেলেরা এই কারণে বাঙ্গালী ছেলেদের অপেক্ষা

অনেক সবল ও সুস্থকারি। আমাদের ছেলেপিলেরা, বিশেষ যাহারা সহরে থাকে তাহারা বড় একটা মাংশ খায় না এবং প্রচুর পরিমাণে দুধত খাইতেই পায় না! সুতরাং অল্প বয়স হইতে বড়ই দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুধু ভাত রুটি খাইলে চলিবে না। প্রতি দিনই একটু একটু মাংশ ডিম বা প্রচুর পরিমাণে দুধ ও ডাল খাওয়া চাই। তা না হইলে শরীরের পূর্ণ বিকাশ কখনই হইতে পারে না। মাংশ পেশীর পূর্ণ বিকাশের অভাব বাঙ্গালী মাত্রেরই দেখা যায় ও তাহার একটি প্রধান কারণ এই।

তৈল জাতীয় খাদ্য যথা দুধ ঘি মাখন তেল ইত্যাদি। এ গুলিতে শরীরে চর্ব্বী জন্মে ও শরীর মোটা হয়; বলাধানও হইয়া থাকে; তবে মাংসাদি ভক্ষণের মত অতটা নয়। তবে এ জাতীয় খাদ্য হজম করা অপেক্ষাকৃত শক্ত। কিন্তু যদি হজম হয় তাহা হইলে ইহাতেও শরীরের বিশেষ উপকার হয় ও মস্তিষ্কে সর্ব্বাপেক্ষা তেজ ও স্বাস্থ্য বাড়ে?

অন্নজাতীয় যথা—ভাত আটা ময়দা ইত্যাদি। এ গুলিও আবশ্যক, তবে মাংশ জাতীয় খাদ্যের মত মাংশ পেশী ও শারীরিক বলও বাড়ায় না বা তৈল জাতীয় খাদ্যের মত অত মস্তিষ্কের উপকারও করে না। জোর হইবে বলিয়া ঠেসে ভাত খাওয়া একান্ত ভুল। তাতে কেবল আলস্য ও বদহজম জন্মায়।

চিনি জাতীয় খাদ্য যথা—গুড় চিনি ইত্যাদি। এগুলি অন্ন জাতীয় খাদ্যের মতনই গুণবিশিষ্ট। তবে মিষ্টি তার আছে বলিয়া ছেলেরা বড়ই পছন্দ করে এবং এই কারণে অন্য জাতীয় খাদ্যের সহিত ইহা দেওয়া যায়। তবে ইহা বেশী উপকারী নহে।

জল নুন এসবও একান্ত আবশ্যক, উপরিউক্ত সকল জাতীয় খাদ্যই আবশ্যকীয়। তবে ছেলেদের জন্য মাংস জাতীয় খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। ইহা যেমন সহজে হজম হয় তেমনি শরীরে মাংস, বল ও স্বাস্থ্য বাড়ায়। এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা দরকার আর এইটিই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা কম দিই। ইহাতে ফল এই দাঁড়ায় যে থর্ব্বাকৃতি, লোলচর্ম্ম ও দুর্ব্বল হই এবং পরে বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগে অল্পবয়সেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি।

পঁচিশ বৎসর অবধি শরীর বাড়ে তার পরে আর বাড়ে না। এই পঁচিশ বৎসর অবধি মাংশ জাতীয় খাদ্য একান্ত আবশ্যক। না খাইলে শারীরিক ক্ষতি এখনই হউক আর পরেই হউক হইবেই হইবে। পঁচিশ বছরের পর তত আবশ্যক থাকে না। বৃদ্ধবয়সে ইহা সুধু অনাবশ্যক নহে নিষিদ্ধ। সে সময়ে মাংস জাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইলে পাথুরী বাত ইত্যাদি অনেক রোগ হইতে পারে।

দুধে সকল জাতীয় খাদ্য সুন্দর রূপে মিশ্রিত আছে। সুধু দুধ খাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে। কচি শিশুর সুধু তাই আহার। কিন্তু এক বৎসরের পর হইতে ভাত রুটী লুচি মাংস ডিম ইত্যাদি একটু একটু করিয়া ধরানো উচিত। দুধ-দাঁত উঠিবার তাহাই তাৎপর্য্য।

যাঁহারা মাংস ডিম খান না, তাঁহাদের পক্ষে দুধের ছানা ডাল ইত্যাদি সামগ্রী কতকটা মাংসের কার্য্য করিতে পারে। তবে মাংস ডিমের মত এরা কেহই নয়। ডাল ছানাতে বেশী সার থাকিলে কি হইবে? হজম হইতে দেরী লাগে। মাংশ ডিম অতি সহজে হজম হয় ও সারাল। মোটামুটি বলিতে গেলে শিশুর প্রধান খোরাক মাংস জাতীয় খাদ্য, যুবার তৈল জাতীয়, ও বৃদ্ধের অন্ন জাতীয়।

ভাল খাইবে আর যথেষ্ট পরিশ্রম করিবে। ছেলেদের ছুটাছুটি করিয়া খেলাই পরিশ্রম। ঘরে বসিয়া তাস খেলা বড়ই ক্ষতি করে। ইহাতে শরীর ও মন উভয়েরই অবনতি হয়।

মুক্ত বাতাসে ছুটাছুটী খেলা করা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সেণ্ডোর এক্সারসাইজ Sandow's Exercise ইহা অপেক্ষা একটু বড় বয়স্কের পক্ষে ভাল। কিম্বা যাহাদের ছুটাছুটী খেলা করিবার একান্ত ঠাঁই নাই, তাহাদের আবশ্যক হইতে পারে। ইহাতে মাংসপেশীর ধীরে ধীরে পরিচালনা হয় বলিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আয়তন বাড়ে ও বিশেষ বলবান হয়। তবে এ কাজটির রীতিমত ভার স্কুলেরই লওয়া উচিত। সকল ছাত্রেরা নিজ নিজ বয়স অনু-

সারে এক একটি ডম্বেল লইয়া সারবন্দি হইয়া দাঁড়াইবে ও সঙ্গীত বাদ্যের সহিত তালে তালে সকলে একত্রে তাহা নানা রূপে sandowর নিয়ম অনুসারে পরিচালনা করিবে। ইহাতে আমোদও যথেষ্ট, দেখিতেও সুন্দর, ও নিয়ম মত প্রত্যহই হইবে। একা একা ঘরে করিলে সকল দিন নিয়ম মত করা সম্ভব নয় এবং উৎসাহও থাকে না।

শারীরিক পরিশ্রম করিতে শিশুকে অহরহ নানা প্রকারে উৎসাহ দিবে। সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইবে। দ্রষ্টব্য বিভিন্নস্থান ও দ্রব্যাদি দেখাইবে। কখনও কখনও বা তাহার খেলার সহিত নিজেই যোগ দান করিবে। এরূপে ছেলেরা বড়ই উৎসাহ পায়।

ছেলে "দুষ্ট" হইলেই ভাল। আমি "দুষ্ট ছেলে" বড় পছন্দ করি। দেখি তাহারাই পরে ভাল দাঁড়ায় ও উন্নতি করিতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ও মানসিক বৃত্তি সকল সতেজ হইলে "দুষ্টামী' করা ছেলের স্বভাব-সিদ্ধ, বড় সুলক্ষণ। তাহাতে তাদের কখনও বাধা দিও না, কখনও মেরোনা, কখনও বকো না, সাধ্য পক্ষে বারণও করোনা। চাঞ্চল্য শারীরিক স্বাস্থ্য সূচনা করে ও স্বাস্থ্য আরও বাড়ায়। খাদ্য দ্রব্য সহজে হজম হয়, রক্ত প্রবাহ সতেজ করে ও শরীর দিন দিন শশীকলার ন্যায় বাড়ে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাহস উৎসাহ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিরও বিকাশ হয়।

শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিলেই শেষ হয়। পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা। নিত্য নিত্য ছেলে-দের স্নান অভ্যাস করান বড়ই ভাল। তাহাতে বিশেষ উপকার হয় এই যে, অল্প অত্যাচারে পীড়িত হয় না। তেল মাখাইয়া ঠাণ্ডা জলে সাবান মাখাইয়া স্নান করান অভ্যাস করাই আমি ভাল বলি। শরীর ভাবান্তর হইলে স্নান একেবারে বন্ধ রাখিবার আবশ্যক নাই, তবে অল্প বিস্তর সংক্ষেপ করা উচিত। স্নানের পর গা ঢাকা কর্ত্তব্য। কাপড় জামা নিত্য নিত্য কাচিয়া দেওয়া বড় উপকারী। শরীর হইতে ঘামরূপে পরিত্যক্ত ক্লেদ আবার গায়ে বসান কষ্টকর ও অস্বাস্থ্যকর। এ সকল নিয়ম পালন করা যে বেশী অর্থসাধ্য, তাহা বলিয়া আমার মনে হয় না—এ বিষয়ে একটু মনোযোগ থাকিলে এবং নিজেরা অল্প স্বল্প সেলাই জানিলেই চলে।

এই গেল শারীরিক ব্যবস্থা-প্রণালী! এই বার মানসিক ব্যবস্থা কিসে রক্ষিত হয় সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাউক।

ক্রমশঃ—

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

শৈশব স্বপন্।

আজি এ দেখিনু কিসেরি স্বপন্?
জাগিনু আকুল পিয়াস ভরে,
কাহার পরশে শিহরিনু আজ,
কাঁপিল পরাণ এমন করে!
কাহার মধুর চরণ পরশে,
জীবন বীণায় উঠিল তান,
কে জানে, আজিকে জাগিল কেনবা,
ঘুমান স্মৃতির পুরানো গান!
কোথা হ'তে ভেসে আসিল সঙ্গীত
কেমনে সুধীরে পশিলে প্রাণে,
একটী একটী ললিত ঝঙ্কার
অতীতের মৃদু স্বপন সনে।
দেখিনু নীরব যমুনার কূলে,
মধুমাখা, প্রিয় ছবিটী কা'র,
তাহারি নয়নে পলকে, পলকে,
নীরবে ক্ষরিছে অমিয়ধার।
তাহারি মধুর হাসির সনে
কি যেন, পিয়াস জাগিছে মোর,
তাহারি কোমল স্নেহ দৃষ্টিপাতে
মরমে ছুটেছে ভাবের ঘোর।
চিনিনু বুঝিনু দেখিনু তারে
মম জীবনের অতীত স্মৃতি,
মধুর বীণায় আকুল তানে
গাহিছে শৈশব স্বপন-গীতি।

শ্রীসরলা দত্ত।

কল্পনা সুন্দরী।

নিরালয়ে বসি কে তুমি সুশীলে
পরিয়া রূপের মালা,
মানবী তো নও না জানি কি হও
অথবা দেবের বালা।
নেহারি ও রূপ পরাণ অথির
মোহিনী মূরতি তব,
আহা মরি মরি ও রূপ মাধুরী
কত যে, কেমনে কব।
রমণী হইয়ে ভুলালে রমণী
কত যে মোহিনী জান,
ভুলালে যদি গো ত্যজিয়া যেওনা
শীতল করহ প্রাণ।
অপাঙ্গে চাহলো করুণা করিয়া
এ ক্ষীণ পরাণ পানে,
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে খসিয়া পড়েছে
থাকে না কো কোন টানে।
মনোময়ী দেবী অতীতের স্মৃতি
লীলাভুমি বাসনার,
তুমিলো ললনে সদয় যাহারে
কি অভাব বল তার ?
নিবিড় কাননে সৌধ অট্টালিকা
নিমেষে নির্ম্মাণ কর,
স্বরগের ছবি মরতে আনিয়া
তুমি গো আঁকিয়া ধর।
সুধাকর সুধা চকোর পিয়াও
এতেক মোহিনী ছলে,
কমলিনী সহ রবি পরিণয়
তোমারি মহিমা বলে।
চাঁদ সোহাগিনী জলে কুমুদিনী
এ ও তো তোমার লীলা,
দামিনী রূপসী জিমুত-ঘরণী
এ ও যে তোমার খেলা।
গিরি-চূড়া' পরে জলধির নীরে
আঁধারে জোছনা মাখি,
হাসিয়া হাসায় কাঁদিয়া কাঁদায়
তোমার সনেতে থাকি।
বায়ু সনে মিশে আকাশেতে উঠে
কভু বা অতল তলে,
কভু বা স্বরগে নন্দন কাননে
পারিজাত ফুল তোলে।
কভু বা ভাসিছে দেবের বালা
মন্দাকিনী পূত নীরে
কভু বা পাতালে দৈত্যেশ মহিষী
ভাসে ভগবতী নীরে।
গোপের ললনা বসন বিহীনা
যমুনার জলে ভাসে,
কদম্বেরি ডালে মুরলী লইয়া
মুরলী-বদন হাসে।
দানব তনয়া প্রমিলা সুন্দরী
লয়ে সখী দলে বলে,
রণ উন্মাদিনী গরবে গুমরী
ঠমকে দমকে চলে।
তোমাতে আমাতে সতত জড়ায়ে
ভাসিব বাসনা-স্রোতে,
এ কায়া ও কায়া মিশাইয়া সতী
রহিব অনন্ত পোতে,
লইয়ে বিভব উপহার দিয়া
ও পদে মগন যারা,
মরিয়া না মরে এ ভব মণ্ডলে
অমর হয়েছে তাঁরা।

শ্রীঅন্নদাময়ী দেবী।

কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ ১৩০৮। ১০ম, ১১শ সংখ্যা।

বড়লাটপত্নী লেডীকর্জ্জন।

ভগ্ন-গৃহ।

চারিদিকে জীবনের অনন্ত কল্লোল।
অনন্ত সৌন্দর্য্যালোকে ভাসিছে ভুবন।
আশার প্রদীপ হেথা নিত্য রহে জ্বলি,
সভয়ে আঁধার করে দূরে পলায়ন।
এত শোভা এত আলো এত গীত মাঝে,
ও কেন গো মূর্ত্তিমান্ নিরাশার মত ?
রচিয়াছে আপনার জীবন্ত সমাধি,
বিজন পরাণ লয়ে কি ধ্যানে ও রত ?
মাঝে মাঝে হু হু করে স্মৃতির সমীর,
কাঁদিয়া বিলাপে ওর ও শূন্য হৃদয়ে।
আপনার ছায়া মাঝে আপনি লুকায়ে,
একাকী ও কেন শুধু করে হায় হায় ?

কেন অমঙ্গল মত আনন্দের মাঝে,
বিষাদের হাসি হাসে নীরবে বসিয়া ?
কেন দুঃস্বপন মত মঙ্গল স্বপনে,
আনিতে গো নি[illegible]
অতীত সুখের [illegible]
কেন এ উৎসব [illegible]
আনন্দ আলয় [illegible]
কাঁদিছে মলিন [illegible]
হায় ওই প্রতি[illegible]
প্রতিক্ষণে জীর্ণ [illegible]
ওই যে মরণ [illegible]
রয়েছে ও শীর্ণ [illegible]

[illegible]

ভাঙ্গা চিমনি।

(অন্দর মহল, প্রফুল্ল ও তাহার মাতা—মাতার হস্তে ভাঙ্গা চিমনি)

প্রফুল্লের মাতা। (অত্যন্ত বিরক্তভাবে উচ্চৈঃ স্বরে) তোদের জন্যে কি আমি দেশ ছেড়ে যাব! না, গলায়

ছুরি দেব, তাই বল্ দেখি প্রফুল্ল! আর ত পেরে উঠিনি বাপু। এই সৃষ্টি সংসার নিয়েই সারাদিন খাট্‌বো, না ঘরের দিকেই তাকাবো! আমার তো আর ভগবান্ দশটা চোখ দেন নাই!

প্রফুল্লর মেজকাকা। (হঠাৎ প্রবেশ করিয়া) সেটা ভগবানের একটা বেজায় ভুল হয়েছে; কিন্তু সে জন্য, মা লক্ষ্মীর তো কোন অপরাধ নাই, তার জন্য সেই ভগবান্ মহাশয়েরই কৈফিয়ৎ তলব কর না কেন বৌদিদি! বলি ব্যাপারটা কি?

প্র—মা। তোমার তো সকল তা নিয়েই রহস্য আর ঠাট্টা! বোল্‌বো আর কি মাথা মুণ্ডু! দেখ্‌তে পাচ্ছ না, সেদিন সেই হরিকেন লণ্ঠনের চিমনিটা কে ফুটিয়ে দিয়েছে,—আজ আবার তোমার ঘরের এই ভাল চিমনিটি তোমার মা লক্ষ্মী ভেঙ্গে বসে আছেন! এমন অলক্ষ্মীকে আবার মা লক্ষ্মী বলা হয়! আমিও যেমন অলক্ষ্মী, পেটে যে গুলি হচ্ছে, তারাও তেমনি হবে বৈ আর কি!

মেজকাকা। সেটা যদি এতই ঠিক জান, তবে আর ওকে বল্‌ছো কেন বল দেখি! সেটা তো স্বাভাবিক, মানুষের পেটে মানুষ, গোরুর পেটে গোরু, অলক্ষ্মীর পেটে অলক্ষ্মী! তবে তুমি যে অলক্ষ্মী, একথা বড় দাদা স্বীকার করবেন্ কি?

প্র—মা। যাও, তোমার ও সব ঠাট্টা রাখ। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল! আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জলে যাচ্ছে, আহা হা! এমন চিমনিটা ভেঙ্গে ফেল্‌লো!

মেজকাকা। মা প্রফুল্ল, এক কলসী ঠাণ্ডা জল শীগ্‌গির নিয়ে এস; তোমার মার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিই; কি জানি যদি জল্‌তে জল্‌তে জ্বলেই ওঠে, তাহলে উনি তো যাবেনই, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাব, বাড়ী খানাও যাবে। যাক্, বলি ভাঙ্গলো কি করে, সেটা কি শুনতে পাই না?

বৌদিদি। সে তোমার মা লক্ষ্মীর গুণ! আমার পেটের গুণ! ভগবানের সঙ্গে কি বাদই আমার ছিল যে, আমাকে এই রকম করে তিনি জ্বালান!

মেজকাকা। (নিজের হাতের লাঠি খানা ভ্রাতৃবধূর হাতে দিয়া) সে জন্য ভগবান্‌কে ছাড়্‌বে কেন? এই লাঠি নিয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে শালগ্রাম শিলার মাথায় ঠেঙ্গিয়ে দাও গিয়ে! আর যত সব ব্রত, নিয়ম, পূজো, পালি বাদ করে দাও; তা হলেই বেটা বেজায় জব্দ হবে, না খেতে পেয়েই মরে যাবে! তোমরা ছাড়লেই দেবতা মাটি! আমরা তো বহুকালই ছেড়েছি!

প্র—মা! (হাসিয়া) যাও, হয়েছে; তোমার আর ঠাট্টার সময় অসময় ত নাই; আর তোমার ভাব দেখে আর কথা শুনে না হেসেও পারা যায় না। কিন্তু ভাই আমার বড় কষ্ট লেগেছে! চিম্‌নিটা বড় ভাল ছিল; তোমার পছন্দ করে কেনা। এক মুহূর্ত্তমধ্যে ভেঙ্গে দিলে!

মেজকাকা। যাক্, তোমার উগ্র মূর্ত্তি তো একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, আমার তো ভয় হয়েছিল যে, "চণ্ড মুণ্ড বধে দেবী" বুঝি দাদাকে আওড়াতে হয়।—এস ত মা লক্ষ্মী, বল দেখি কি করে ভাঙ্গ্‌লো!

প্রফুল্ল। (কাকার নিকট আসিয়া কাঁদো কাঁদো স্বরে) কাকা, আমি ইচ্ছা করে ভাঙ্গি নাই—তা খুড়িমা নিজেই দেখেছেন; আমি ও ধার থেকে কি আন্‌তে গেলাম, চিমনিটা ভাল বসান ছিল না, আমার আঁচল লেগে পড়ে ভেঙ্গে গেল! আমি সত্যি বল্‌ছি কাকা, ইচ্ছা করে ভাঙ্গি নাই। (রোদন)

মেজকাকা। তা মা কেঁদে কি ফল;—তুমি ইচ্ছা করে কেন ভাঙ্গবে মা; হঠাৎই হয়ে গেছে,—সেটা সাক্ষী প্রমাণ না নিয়েও আমি বুঝ্‌তে পারি—হরিকেনের চিম্‌নি কে ভেঙ্গেছে?

প্রফুল্ল। তা আমি জানি না; কেমন করে যেন একটা দু আঙ্গুল ফুটো হয়ে গেছে, সে ভাঙ্গা কাচ টুকুও আছে।

মেজকাকা। তোমার মা যখন বক্‌লেন, তখন তুমি কি করলে?

প্রফুল্ল। আমি বল্‌লাম যে, ইচ্ছা করে ভাঙ্গি নাই, খুড়িমাও তা বল্‌লেন, তবু মা বলেন যে, সাবধান হয়ে চলিস্ না কেন?

মেজকাকা। হাঁ, চিমনিটা কাছে ছিল, সুতরাং তোমার

আরও সাবধান হয়ে চলা উচিত ছিল বই কি? তাই তিনি শাসন করেছেন যে, পরে আরও বেশী সাবধান হবে। বুঝতে পাচ্ছ, তোমার দোষটা কোথায়?

প্র। হাঁ, আমার কি আর কষ্ট হয় নাই? চিমনিটা পড়লো দেখেই আমি কেঁদে উঠেছিলাম!

মেজকাকা। সে বেশ! যাও এখন তোমার মাকে প্রণাম করে বল যে, আমার দোষ হয়েছে ক্ষমা কর।

(প্রফুল্লের তথা করণ)

প্র—মা। আমার কাছে স্বীকার কর্ যে, ভবিষ্যতে বেশ দেখে শুনে চল্‌বি?

প্র। হাঁ তা আমি চল্‌বো মা!

প্র-মা। আচ্ছা তবে যাও।

মেজকাকা। নিয়ে আয় মা চিমনিটা; আমার ঘরে যাই, দেখি ওটা ঠিক করতে পারি কি না!

প্র—মা। এত বড় হ'লে তবু তোমার ছেলে মান্‌ষি গেল না, কাচ নাকি আবার জোড়া লাগে? কথায় বলে, "মানুষের মন কাচে গড়া, ভাঙ্গলে আর যায় না জোড়া!"

মেজকাকা। তা তো এখনি দেখলাম, "ভেঙ্গেছিল মন, লেগে গেল জোড়া—বুদ্ধি চাই বৌদিদি, বুদ্ধি চাই থোড়া"!

প্র-মা। করগে ভাই যা খুসি, আমার কাজ আছে, আমি চল্লাম। (প্রস্থান)

প্র। সত্যি কাকা, আপনি কি জুড়তে পার্‌বেন?

মে, কা। হাঁ, মা, তুই একখানা রুটি করার মত খানিকটা ময়দা নিয়ে আয় দেখি, আর গামলায় করে খানিক জল, আর খানিকটা চুণ, একটা কুলের বিচির মত, নিয়ে আয় আমি ঘরে চল্‌লাম!

প্র। এই ত কাকা, সব নিয়ে এসেছি, কি কর্‌বো?

মে, কা। ময়দাটাতে জল মাখিয়ে আঠা করে বেশ করে দল্‌তে থাক, রুটী কি লুচী কর্‌তে যেমন করে মেখে দল্‌তে হয়, তেমনি করে বেশ মোলায়েম করে দল দেখি।

প্রঃ (কিছু পরে) এই দেখুন ঠিক রুটীর ময়দার মত হয়েছে! হাতে টান্‌লে রবরের মত বেড়ে আস্‌ছে!

মে, কা। বেশ হয়েছে; এখন ময়দাটা ঐ গামলার জলে বেশ করে ধু'তে থাক!

প্র। ধু'লে তো সব জলে গুলে যাবে, তাতে ফল কি?

মে, কা। না মা তা যাবে না, কিছু থাকবে। ময়দাটা হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে গামলার জলে হাত ডুবিয়ে রাখ, আর কেবল হাতের মধ্যে ময়দাটা আস্তে আস্তে চাপিতে থাক; হাঁ অমনি কচলাইতে থাক্।

প্র। বাঃ! জলটা বেশ দুধের মত হয়ে যাচ্ছে; হাতের ময়দাও কমে যাচ্ছে!

মে, কা। তা যাক, তুই বেশ করে ধু'তে থাক্। যদি একটু একটু টুকরা খুলে জলে পড়ে তা পড়ুক।

প্র। হাঁ তা পড়্‌ছে বই কি! কতক্ষণ এমনি ধু'তে হবে!

মে, কা। এই দশ মিনিট, কি ঐ রকম। হয়ে এসেছে বোধ হয়; দেখি!—হাঁ, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ময়দার সাদা রং গিয়ে আঠাল মাটির মত (কি মাখা ময়দার মত) হয়ে আস্‌ছে। এখনও সাদা সাদা একটু আছে; আরও খানিকটা ধোও।—হাঁ, এইবার বেশ হয়েছে, আর বড় সাদা দেখা যাচ্ছে না; এখন ময়দা টুকু ওই পাতাটায় রেখে দিয়ে আস্তে আস্তে জলটা ফেলে দাও; তলায় যদি আঠা একটু পড়ে থাকে, তবে সে টুকুও লওয়া যাবে।

প্র। এই দেখুন, তলায় একটু একটু আঠাও আছে, সাদা ময়দাও একটু একটু আছে।

মে, কা। আচ্ছা, ওর সঙ্গে পাতার ময়দা টুকুও মিশিয়ে দিয়ে আর কিছু পরিষ্কৃত জল দিয়ে একবার রগড়ে নাও, তা হলে ময়দার গুঁড়া যা একটু থাকে, তা ধুয়ে গিয়ে পরিষ্কার হবে। হাঁ, আর একটুও সাদা গুঁড়া ওতে নাই। এখন ঐ আঠার বড়িটার সমান পরিমাণ টাটকা চুণ মিশিয়ে দিয়ে পাতার উপর বেশ করে রগড়াতে থাক দেখি। ময়দার আঠা যতটুকু বেরবে, চুণ প্রায় তত টুকুই লাগে, বেশী পুরু হলে আর একটু চুণ দিয়ে পাতলা করে নিতে হয়।

প্র। এ তো মিশে না, কেবল খস্ খস্ করছে, আর তাল পাকাচ্ছে।

মে, কা। মিশ্‌বে মিশ্‌বে, বেশ একটু জোর দিয়ে পাতার সঙ্গে ঘস্‌তে থাক; আপনিই নরম হয়ে আসবে।—ঐ দ্যাখ, কেমন বেশ মিশে আঠা হোলোনা?

প্র। হাঁ, বেশ মিশেছে বটে, আর এ যে বেজায় আঠা! খুব মিশেছে দেখুন, একবারে ময়দাটা গলে গিয়েছে।

মে, কা। হাঁ তা হলেই হয়েছে! আচ্ছা এখন চিমনি-টার ভাঙ্গা তলাটা নিয়ে ওই ভাঙ্গার দাগের উপর বেশ করে আস্তে আস্তে মাখিয়ে দে, দেখিস্ যেন হাত না কেটে যায়।—আচ্ছা আমার কাছেই দে, আমিই কচ্ছি! এই দেখ ভাঙ্গা দাগটার উপর বেশ সরু অথবা একটু পুরু করে মাখিয়ে দিলাম। এখন ভাঙ্গা মাথাটা দে দেখি, এই দ্যাখ ভাঙ্গার দাগে দাগে বেশ করে বসিয়ে দিলাম, জোড়টা ঠিক দাগে দাগে মিলে যাওয়া চাই। তারপর উপর আর নীচের দুই দিকে এমনি করে বেশ একটু চেপে ধরে রাখ্‌তে হয় যে, জোড়ের মুখে আর ফাঁক না থাকে। তারপর এই ফাটা দাগের জায়গায় বাহিরের চারিদিকেও এই দেখ বেশ সরু অথচ পুরু করে আঠাটা মাখিয়ে দিলাম, মধ্যেও এই মত করে আঙুল দিয়ে একটু করে আঠা দাগটার উপর মাখিয়ে দিলাম। এখন খানি-কটা জলন্ত আগুন নিয়ে আয় দেখি।

প্র।—এই এনেছি কাকা! ধক্ ধক্ কচ্ছে!

মে, কা। হাঁ এমনি করে জোড় জায়গায় বেশ চেপে ধরে আগুনে সেক দিতে হয় যে, আটাটা শীগ্‌গির শুকিয়ে গিয়ে এঁটে লেগে যায়!—এই দেখ শুকিয়ে কেমন এঁটে গেছে! এ আর সহজে খুলবে না। আগুন-তাত না দিয়ে রোদে রাখলেও হয়। তবে তা'হলে কোন কিছুর চাপ দিয়ে ভাঙ্গা জোড়াটা এঁটে বেধে রোদে ফেলে রাখতে হয়—কে রোদের মধ্যে বসে থাকে বাপু! কেমন হলো না!

প্র। (অত্যন্ত আনন্দের সহিত) বাঃ! বেশ হয়েছে, একটু জোর দিয়ে টান্‌লেও খুলে না! বাঃ! বাঃ। আমি হরিকেন টাও নিয়ে আসি কাকা?

মেজকাকা। হাঁ নিয়ে এস মা, একবারে সেরে ফেলি

প্র। এই নিন! এটার মধ্যে ত হাত যাবে না!

মেজকাকা। তা না যাক, ছোট কাচখানা অমনি রেখে চিমনির ভাঙ্গা যায়গায় আঠা বেশ করে লাগিয়ে শেষে জুত বরাত করে, ছোট কাচ খানা লাগিয়ে বাহিরে আস্তে আস্তে আটা মাখিয়ে দেব। এই দেখ বেশ হয়েছে, তবে এ সব গুলি একটু সাবধান হয়ে ব্যবহার করতে হবে তা বুঝতেই পাচ্ছ; বেশী বল খাটাতে গেলে ওর ভাঙ্গা প্রাণ বাঁচবে না।

প্রফুল্ল। তা তো বটেই, কিন্তু এ বড় ত কৌশল—মা! মা! একবার দেখে যাও এক মজা!

(প্রকাশ্যে মাতা ও অন্তরালে প্রফুল্লের খুড়িমাতার প্রবেশ)

প্র। (আনন্দে) দেখ কে বলবে, ভাঙ্গা চিমনি? যা একটু আঠার দাগ দেখা যাচ্ছে।

প্রফুল্লের মা।—বা বেশ তো ধন্যি ঠাকুরপো, তোমার পেটে কত গুণই যে আছে; তুমি আমার লক্ষ্মণ দেবরই বটে। এখন থেকে কাচের জিনিস ভাঙ্গলে আর ফেলে দিতে হবে না, গেরস্তালীর অনেক সাহায্য হবে।

মেজকাকা। তা বৌদিদি আমার মজুরি আর পুরস্কার?

প্র—মা। (অন্তরালবর্ত্তিনীর দিকে দেখাইয়া) মজুরি আর পুরস্কার ঐ আমার বোন্ দেবে। আমি চল্লাম।

মেজকাকা। (অন্তরালে কটাক্ষ করিয়া) তা বেশ, সেই ভাল!*

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী

সতী শ্যামাসুন্দরী।

আউদ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে লাইনের ফয়জাবাদ নামক প্রাচীন ও প্রশস্ত নগরের প্রায় সার্দ্ধ দুইক্রোশ অন্তরে পবিত্র-সলিলা সরযূতটে প্রাচীনা অযোধ্যাপুরী

* ইহা লেখকের পরীক্ষিত। পাঠিকাগণ পরীক্ষা করিয়া ফল জানাইলে সুখী হইব। লেখক এই উপায়ে একটি 'চিমনি' সারিয়া দুই বৎসর ব্যবহার করিতেছেন এবং আজও তাহা জুড়া আছে।

বিভববিহীনা হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামাকারে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালের কুটিলপ্রভাবে রক্ষবংশ-ধ্বংসকারী রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন, সুতরাং বর্ত্তমান অযোধ্যাপুরীতে আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। নগরীর চারি পার্শ্বে প্রাচীন কালের বিপুলকায় প্রাসাদসমূহ ভগ্ন স্তূপাকারে স্থানে স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া রঘুবংশের রুদ্রসম বিক্রমের এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধাধীন জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া অযোধ্যাপুরীতে যাঁহারা রঘুকুলপতি মহারাজ রামচন্দ্রের জন্ম ও বাল্যলীলার স্থানসমূহ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, যে এক অনতিবৃহৎ ভূমিখণ্ড এক্ষণে সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রসূতিগৃহের আধার বলিয়া পরিচিত; তাহার অর্দ্ধাংশ মুসলমানের এবং অর্দ্ধাংশ হিন্দুর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

যে সুন্দর ও প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদটি রামচন্দ্রের প্রসূতিগৃহ ছিল, তাহা এখন বর্ত্তমান নাই; যে ভূমিখণ্ডের উপরে এই প্রাচীন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই এক পার্শ্বে এবং যে গৃহে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে এখন একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মন্দিরের অর্দ্ধাংশ হিন্দুর দেব দেবী কর্ত্তৃক এবং বাকী অর্দ্ধাংশ মুসলমানের মোল্লা কর্ত্তৃক অধিকৃত। অর্দ্ধাংশে শ্রীরামচন্দ্রের নবদূর্ব্বাদলশ্যাম মোহনমূর্ত্তি এবং অপরার্দ্ধাংশে মস্‌জিদ, মৌলবী এবং মোসাহাফ্ (কোরাণ) দেখিতে পাওয়া যায়। একটি সুন্দর ও সুবৃহৎ হিন্দু মন্দিরকে অঙ্গহীন করিয়া এই মসজিদ্ প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য ভারতের আর কোন তীর্থস্থলে বিরল; বারাণসী প্রভৃতি নগরীতে বড় বড় মন্দিরের নিকটে মসজিদ্ দেখা যায় বটে, কিন্তু অযোধ্যা ভিন্ন আর কোনও স্থানে হিন্দুর মন্দির এবং মুসলমানের মসজিদ্ একই প্রাচীর, একই সীমানা (কম্পাউণ্ড) একই ছাদ এবং একই ভিত্তি লইয়া, একই অট্টালিকার দুই অংশে পাশাপাশি ভাবে দুইটী বন্ধুর মত দাঁড়াইয়া হিন্দুকে রামায়ণ এবং মুসলমানকে কোরাণ শুনায়—এই রূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কোনও স্থানে নাই, ইহা আমরা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি। যে রামের রুদ্র শক্তিতে রাবণ কম্পিত হইয়াছিল, যে রামের তাড়নায় তাড়কা ত্রস্ত হইয়াছিল, যে রামের বাণে বিদ্ধ হইয়া বালি নিহত হইয়াছিল, যে রামের বিশিষ্ট বিক্রমে বিপুলবপু কুম্ভকর্ণ করাল কাল কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছিল, সেই ভুবন বিখ্যাত ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রসূতিগৃহে মুসলমানের মস্‌জিদ্ প্রতিষ্ঠার কথঞ্চিৎ ইতিহাস না শুনাইলে, প্রস্তাবশীর্ষোক্তা সতী শ্যামাসুন্দরীর জীবনী পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মোগল সম্রাট (হুমায়ুন), খৃষ্টীয় ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে ফইজি উল্লা নামক প্রসিদ্ধ সেনাপতি সমভিব্যাহারে গাঙ্গেয় প্রদেশ সমূহ অতিক্রম করিয়া সরযুতটে উপনীত হয়েন। অযোধ্যার অসংখ্য দেবালয়, ব্রাহ্মণদিগের বিপুল বিভব, শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতদিগের পূজা পাঠ, আরতির আড়ম্বর, মন্দিরস্থিত মূর্ত্তির বহুমূল্যতা হিন্দু রাজগণ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রে ঈশ্বরত্ব আরোপ, সরযু-তটস্থিত অগণ্য দেবদেবী মূর্ত্তির চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে হিন্দুর বিশ্বাস, প্রভৃতি কথা শ্রবণ করিয়া অযোধ্যায় মোগলের জয় পতাকা উড্ডীয়মান করত মুসলমানের মহম্মদীয় ধর্ম্ম স্থাপনা করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিলে হিন্দুর তরবারী কখনও সূর্য্যালোক দর্শন করে না; সুতরাং সরযুতটে হিন্দু ও মুসলমানের সমর অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মোগলকুল-সম্রাট মহাবীর হুমায়ুন স্বয়ং অধিনায়ক হইয়া হিন্দুর সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবেন, এ কথা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু নরপতিগণ ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের যথাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল; মোগলের মহাবিক্রমে হিন্দু পরাজিত হইয়া অপমানিত ও আহত হইলেন। ক্রমে নানা স্থান হইতে হিন্দুবীরগণ সমবেত হইয়া পুনরায় ভীষণতর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন; কিন্তু মদমত্ত মোগলের অজেয় অস্ত্রশস্ত্রের সম্মুখে তাঁহাদিগকে শার্দ্দূল-তাড়িত সারমেয়-শাবকের ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পলায়ন করিতে হইল।

তৃতীয় বা শেষ যুদ্ধে অসংখ্য হিন্দু স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু জয় ও ভাগ্যলক্ষ্মী হিন্দুর কোমল ক্রোড়কে পরিত্যাগ করিয়া মোগলের কঠিন কিরীটে গিয়া উপবেশন করিলেন। মুসলমানেরা বজ্র-গম্ভীর রবে মোগলের জয় এবং মহম্মদের ঐশী শক্তির ঘোষণা করিয়া অযোধ্যাপুরী অধিকার করিল; কিন্তু দেবালয়াদি ভগ্ন করা সহজ কার্য্য নহে দেখিয়া মোগলেরা উৎকণ্ঠিত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নয়নের অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সরযূজল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, অযোধ্যায় একটি হিন্দু বর্ত্তমান থাকিতেও "ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির ভগ্ন করিতে দিব না।" সশস্ত্র হইয়া, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া "হর হর বম্ ববম্" রবে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া দলে দলে অসংখ্য হিন্দু নরনারী সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রসূতিগৃহের সম্মুখস্থিত বিস্তৃত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিতে দেখিতে মুসলমানেরা মন্দির ভগ্ন করিতে উপস্থিত হইয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিল। স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ সমরনীতির নিয়মানুসারে সংগ্রাম না হইয়া হিন্দু ও মুসলমানে হাতাহাতি যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। হিন্দুর বীরত্ব, বিক্রম, অধ্যবসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সাহস, স্বধর্ম্মানুরাগ, অস্ত্রশিক্ষা, জীবনে মমতাশূন্যতা প্রভৃতি অতুলনীয় হইলেও সে যুদ্ধে মুসলমানের নিকটে হিন্দুবীরেরা আবার পরাজিত, আবার হত হইলেন। রামচন্দ্রের সুবৃহৎ মন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়া মোগলেরা সানন্দে সরযূতটস্থিত শিবিরে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। মুসলমান ভাবিল, অযোধ্যায় রাম আর রামায়ণের নাম বুঝি লুপ্ত হইল! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরদিন প্রভাতে পূর্ব্বগগনে দিননাথ উজ্জ্বল প্রভায় উদিত হইতে না হইতে মোগলেরা দেখিল হিন্দুর মন্দির যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে! বিস্মিত হইয়া মোগল সৈন্য হুমায়ুনের নিকটে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বিবৃত করিল। হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণেরা বলিয়া উঠিলেন—বাদসাহ! এখন বিচার করিয়া দেখ, হিন্দুর রাম বড় কি মোগলের মহম্মদ বড়? মহম্মদের শক্তিবলে তোমরা মন্দির ভাঙ্গিয়াছ, কিন্তু রামের শক্তিবলে রাত্রি প্রভাত না হইতে ভগ্নমন্দির নূতন মন্দিরে পরিণত হইয়া পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিতেছে! ভগবান্ রামচন্দ্রের মন্দিরের বিগ্রহ লোপ করা কি দিল্লীর মোগলের সাধ্য?" এই কথা শুনিয়া হুমায়ুনের সহাস্যবদন লজ্জা ও অভিমানের কালিমায় মলিন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আরক্ত লোচনে সেনাপতিকে বলিলেন—"ফয়জুল্লা! বুঝিতেছ না, বিধর্ম্মী হিন্দুদের মধ্যে পরিশ্রমী এবং সুকৌশলসম্পন্ন বহুবিধ কারুকার আছে, তাহারাই নিশীথে এই নিদারুণ মর্ম্মব্যথার কারণোৎপাদন করিয়াছে। আইস, আজি আমরা রামমন্দিরের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া প্রতিহিংসা লই।" মুসলমানেরা আবার সেই মন্দির ভগ্ন করিল; আবার মন্দিরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ, প্রস্তর, ইষ্টক, চুণ প্রভৃতি মশলা পর্য্যন্ত উষ্ট্র পৃষ্ঠে বহন করত সরযূর সলিলের স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। মোগল ভাবিল, এবারে রামের বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্য ভাল করিয়া হিন্দুকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। মুসলমানেরা এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, হিন্দুর উৎসাহ ও বিক্রম ঠিক কুম্ভকর্ণের উৎসাহ ও বিক্রমের সহিত তুলনীয়; কুম্ভকর্ণ অধিকাংশ সময়ই নিদ্রায় অপব্যয় করে। নিদ্রিত থাকিলে কুম্ভকর্ণের অশন, বসন, বিহার, বিক্রম, উৎসাহ, উদ্যোগ, বীরত্ব বিভব প্রভৃতির কিছুই থাকে না, কিন্তু একবার জাগিয়া উঠিলে সমগ্র পৃথিবীকে গলাধঃ করিলেও কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। সমস্ত জগতের পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হয় না, অথবা সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিলেও তাহার অস্ত্রশস্ত্র কম্পিত বা ক্লান্ত হয় না। যে জাতি স্বধর্ম্মের জন্য কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিতে পারে, যে জাতি স্বদেশের জন্য স্ত্রী পুত্র বিসর্জ্জন করিতে পারে, যে জাতি স্বজাতির জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, সে জাতির নিকটে রাতারাতি একটা মন্দির নির্ম্মাণ করা কি অলৌকিক কার্য্য? প্রভাতে উঠিয়াই যবন দেখিল, হিন্দুর রামের মন্দির যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে!

ঠিক এই সময়ে দিল্লী হইতে প্রাপ্ত এক পত্র পাঠ করিয়া সম্রাট জানিতে পারিলেন—দিল্লীতে তাঁহার

পরিবার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের শরীরও সুস্থ ছিল না এবং সেনাপতি ফই-জুল্লা একটি ভুশ্চিকিৎস্য রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। সুতরাং হিন্দুর সঙ্গে সন্ধি করিয়া সরযূ পরিত্যাগ করত দিল্লী অভিমুখে প্রয়াণ করাই শ্রেয়ঃ, সম্রাট ইহাই স্থির করিলেন। উভয় দলের নেতারা উপস্থিত হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল; সন্ধিপত্রে সম্রাট লিখিলেন, "আপনারা (হিন্দুরা) রামচন্দ্রের যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মুসলমানেরা তাহা ভগ্ন করিবে না এবং ভগ্ন করিবার অধিকারী হইবে না; কিন্তু আপনাদের ঐ মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রাচীরে সংলগ্ন ভাবে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইবে, হিন্দুরা তাহা ভগ্ন করিতে পারিবে না অথবা ঐ মসজিদের ভূমির অধিকারী হইতে পারিবে না। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে পরস্পরে দ্বেষ বিদ্বেষ পরিহার করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে মন্দির ও মসজিদ্‌কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ও হইলেন; ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষের কোন আপত্তি রহিল না। সন্ধিপত্রের স্বাক্ষর শেষ হইয়া গেলে, মসজিদের বাহির দিকের দরজা অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া উঠিল, ঐ ফটকে (Gate) সম্রাট বাহাদুর একখানি প্রস্তর ফলক স্থাপিত করিয়া তদুপরে পারস্য ভাষায় যাহা খোদিত করিয়া দিলেন, তাহার প্রকৃত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"মোগলের কীর্ত্তি।

মহম্মদের জয় এবং রামের পরাভব।
এই স্থানে ধর্ম্মযুদ্ধে সাহান-সা হুমায়ুন
হিন্দুজাতিকে পরাস্ত করেন।
হিজ্‌রী আটশত।"

ঐ প্রস্তর ঐ মসজিদের সম্মুখস্থ দ্বারদেশের উপরে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু হিন্দুরা এই বলিয়া আবার আপত্তি করিল যে, রামের অপমানসূচক কোনও কথা ব্যবহার করিয়া প্রস্তর ফলক স্থাপিত করিবার কথা উক্ত সন্ধিপত্রে নাই, সুতরাং সম্রাটের এই ব্যবহার অন্যায় এবং অযৌক্তিক হইয়াছে।" হুমায়ুন ফাঁদে পড়িলেন, তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র দিল্লী যাইতে হইবে, সুতরাং হিন্দুর বিপক্ষে সংগ্রাম করা তাঁহার পক্ষে এখন অত্যন্ত কঠিন এবং অত্যন্ত অসুবিধা-জনক হইয়া উঠিল। য়িশু খৃষ্টের ক্রুশে পণ্টীয়স পাই-লট্ যাহা লিখিয়াছিলেন, য়িহুদীরা তাহার প্রতিবাদ করায় পাইলট্ বলিয়াছিলেন "যাহা লিখিয়াছি, তাহা লেখা হইয়া গিয়াছে!" হুমায়ুনও হিন্দুগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যাহা লেখা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর সংশোধন নাই।" কিন্তু হিন্দুরা এই উক্তির অনুমোদন করিল না; শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পরে এই স্থির হইল যে, মসজিদের ফটকে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা যেমন আছে তেমনি থাকুক; কিন্তু ভিতরের মসজিদের দ্বারদেশের উপরের প্রস্তরে মোলানারুম নামক প্রসিদ্ধ পারস্য কবির বিরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত থাকিবে; ঐ প্রস্তর এবং উহার উপরের কবিতা এখনও স্পষ্টাক্ষরে পড়িতে পারা যায়। উহা এই—

"দর্ তরিখে কাবা য়ো বুতোখানা ফরক্ অসৎ।
মগর্ দর উশুলে কাবা য়ো বুতোখানা একিসৎ॥"

অর্থ:—হিন্দুর পৌত্তলিকতাপূর্ণ মন্দিরে এবং মুসলমানের একেশ্বরবাদপূর্ণ মসজিদে ভিন্ন ভিন্ন উপাসকেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রবেশ করিলেও, মসজিদে যে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের উপাসনা হয়, মন্দিরেও সেই ভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে।

হিন্দুরা সন্তুষ্ট হইল, সম্রাট চলিয়া গেলেন, অযোধ্যার হাঙ্গামা মিটিয়া গেল। হুমায়ুনের পুত্র মোগলকুলতিলক আক্‌বর সাহ অযোধ্যায় আসিয়া ঐ কবিতা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "দর্ হকিকৎ হিন্দুকা কাশী আওর মুসলমানকা মক্কা একই বিজ্ হ্যায়।"

উপরে যে হাতাহাতি যুদ্ধের কথা লেখা হইয়াছে, তাহাতে যে সকল হিন্দু নরনারী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহাদের মৃতদেহ সরযূর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহাদের মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ করিবার অবসর পাওয়া যায় নাই, যবনেরা সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া ঐ মসজিদের সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে "কবর" দিয়াছিল; ঐ সকল "হিন্দু-কবর" এখনও বর্ত্তমান। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ঐ

কবর সমূহের উপরে পুষ্পমালা অর্পণ করে এবং ঈশ্বরে ধন্যবাদ করিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের বীরত্বের প্রশংসা করে যে সকল স্বধর্মানুরাগী হিন্দুবীর এই ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের দেহস্থিত শোণিতের ধারা দ্বারা হিন্দুর গৌরব রক্ষা হইয়াছিল, সতী শ্যামাসুন্দরী তাঁহাদের সকলের অগ্রগণ্যা!

অযোধ্যার এই হিন্দু মুসলমান হাঙ্গামার প্রায় ত্রিংশ বর্ষ কাল পূর্ব্বে কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী ব্রহ্মচারিণী আসিয়া সরযূতটে সামান্য পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করত অযোধ্যাতীর্থে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাহার উনবিংশ বৎসর বয়ক্রম; দেহের দেবোপম লাবণ্য, কণ্ঠের কোকিল স্বর, বাক্যের মধুরতা, স্বভাবের কোমলতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, নয়নের ঐশী জ্যোতিঃ, অশন ও বসনের সাত্বিকতা এবং জীবনের গভীর আধ্যাত্মিক ভাব অবলোকন করিয়া লোকেরা বুঝিতে পারিল, এই রমণী সামান্যা রমণী নহেন। ক্রমে জানা গেল, তিনি বঙ্গদেশের বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের কন্যা; কাশীতে তাঁহার জন্মস্থান এবং কাশী ধামেই তাঁহার শ্বশুরালয়। তাঁহার পিতা পিতামহ বারেন্দ্র ভূম হইতে কাশী ধামে আসিয়া বাস করেন। তথায় শ্যামাসুন্দরীর জন্ম ও বিবাহ হয়। ক্রমে আরও অনুসন্ধানে জানা গেল, শ্যামা সুন্দরীর স্বামী অসচ্চরিত্র এবং দুর্দ্দান্ত; অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিতে সমর্থা হয়েন নাই। শেষে যখন দেখিলেন, স্বামী গৃহে থাকিলে তাঁহার দেহের, মনের এবং আত্মার সর্ব্বদা অবনতি হইবে—অথচ গৃহে অবস্থান করিলেও স্বামীর বা গৃহের কোন বিশেষ উপকার নাই—তখন তিনি কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করত অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক সরযূতটে বাস করেন। তখন রেল বা ডাকঘর ছিল না, কিন্তু তথাচ পথিকদিগের মুখে এবং নানা উপায়ে মধ্যে মধ্যে তিনি স্বামীর সংবাদ পাইতেন। তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছিল; শ্বশুর শাশুড়ী জীবিত ছিলেন না; পুত্র কন্যা হয় নাই; সুতরাং স্বামী ভিন্ন শ্যামা সুন্দরীর ইহ জগতে আর কেহ ছিল না। আর কেহ ছিল না বটে, কিন্তু জগৎকে তিনি আপনার বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছিলেন, জগতের উপকারের জন্য তাঁহার জীবন তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের জীবন জগতের শিক্ষক স্বরূপ ছিল। তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন, সংসারের মনুষ্য-সম্মুখে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। কেবল জীবশ্রেষ্ঠ মানবের উপকার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। পশু, পক্ষী, পিপীলিকা পতঙ্গ পর্য্যন্ত কেহই শ্যামাসুন্দরীর সদ্ব্যবহারে বঞ্চিত ছিল না। দুঃখের বিষয়, এই অসামান্যা রমণীর—এই তপঃ প্রভাবসম্পন্না বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যার বিস্তৃত জীবনী আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত অযোধ্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; উনবিংশ বৎসর বয়ক্রমে যৌবনের পূর্ণাবস্থায়, তিনি সরযূতটে আসিয়া উপনীত হয়েন এবং প্রায় অর্দ্ধশত বৎসর বয়সে কাশীতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে তিনি সরযূতট পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং পতিতপাবনী গঙ্গার পবিত্র কূলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন! অযোধ্যাপুরীর লোকেরা তাঁহাকে দ্বিতীয়া পার্ব্বতী বলিয়া অভিহিতা করিত; ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার অনুগত ও ভক্ত ছিল; মুসলমানেরাও তাঁহাকে ঐশী শক্তিসম্পন্না বলিয়া বিশ্বাস করিত। হুমায়ুনের সৈন্যদল যখন সরযূতটে শিবির স্থাপন করিল, তখন সেনাপতি ফইজুল্লার কর্ণে শ্যামাসুন্দরীর গুণানুবাদ আসিয়া পৌছিল। সেনাপতি ব্রহ্মচারিণী মাতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রীত হইলেন এবং যে উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় আসিয়াছেন, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়া বলিয়া গেলেন। তাহার পরদিন হইতেই হিন্দুর নেতাদিগের মধ্যে যে সকল পরামর্শ চলিতেছিল, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইতেছিল, ব্রহ্মচারিণী শ্যামাসুন্দরী সে সকলের মূল।

শ্যামাসুন্দরী শক্তি উপাসিকা ছিলেন, কিন্তু মৎস্য মাংস বা মদ্য ব্যবহার করিতেন না; জীব হিংসা করা তাহার নীতির বিরুদ্ধ ও জীবকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের বিরোধী ছিল। কিন্তু স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্ত্রীর সতীত্ব, অথবা গো ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য দুষ্ট

উপস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিয়াছিলেন। কতবার তাঁহার দেহে গুরুতর আঘাত লাগিল, কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্যও কাতরা হইলেন না। মোগলেরা যখন শুনিল, এই ব্রহ্মচারিণী হিন্দুদিগের নিকটে "ঐশী শক্তিসম্পন্না" বলিয়া পরিগণিতা, তখন তাহারা ইঁহাকে দুই তিনদিন পর্য্যন্ত অনাহারে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ইঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। যবন হস্তে বন্দিনী থাকিবার সময়ে ফইজুল্লা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি ত শক্তি মন্ত্রের উপাসিকা, আর অযোধ্যার নিরামিষাশী ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত। তবে বৈষ্ণবের প্রতি শাক্তের এ অযথা সহানুভূতি কেন?" শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, শাক্তে ও শৈবে কোন প্রভেদ নাই; প্রত্যেক বৈষ্ণবই শাক্ত এবং প্রত্যেক শাক্তই বৈষ্ণব। যিনিই শক্তি তিনিই বিষ্ণু, যিনিই বিষ্ণু তিনিই শক্তি।" এই কথা বলিয়া তিনি গাহিলেন—

"মথুরাতে তিনি হন নবঘন শ্যাম,
অযোধ্যাতে হন তিনি রঘুপতি রাম,
কৈলাসেতে তিনি ভস্ম করি কাম,
'মদনারি' নামে বিখ্যাত হয়।
তিনি কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত;
কখনও সৌর তিনি, কখনও গাণপত্য;
কে জানিবে তাহার মহত্ব তত্ব,
মূর্খেতে কেবল প্রভেদ কয়॥"

শেষ যুদ্ধে অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের হাতাহাতি যুদ্ধে শ্যামাসুন্দরী গুরুতর রূপে আহতা হয়েন; সে আঘাতে তাঁহার আর বাঁচিবার ভরসা রহিল না। মুসলমানদের অনেকে তাঁহাকে বাচাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষার আশা খুব কম দেখা গেল। এই সময়ে জীবের সংহার করা তাঁহার মতে দোষাবহ ছিল না। এই জন্য তিনি ব্রহ্মচারিণী হইয়াও ভৈরবী বেশে সংগ্রাম ক্ষেত্রে স্বধর্ম্মরক্ষার্থে প্রাণ দিতে অগ্রসরা হইয়াছেন। যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ততবারই তিনি রণক্ষেত্রে স্বয়ং অনেক পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মুখে সংবাদ পাইলেন, তাঁহার স্বামী অতি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া আছেন, তাঁহারও বাঁচিবার আশা খুব কম। শ্যামাসুন্দরী ঝটিতি অযোধ্যা হইতে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অতি শীঘ্রই কাশীধামে উপনীতা হইলেন। স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহার দেবোপমরূপ, নয়নের ঐশী জ্যোতিঃ এবং মস্তকের জটাজূট দেখিয়া স্বামী শিহরিয়া উঠিলেন; অতি ভয়ে অতি ভক্তিতে স্ত্রীর পদে মস্তক রাখিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শ্যামাসুন্দরী তাহা করিতে দিলেন না। স্ত্রীর সেই অপরূপ লাবণ্য, সেই দেবভাব পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সাশ্রু লোচনে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার স্বামী বলিলেন "যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, তাহা হইলে যেন জন্মান্তরে আমি আবার তোমার পতি হইতে পাই! ইহ জন্মে যত কিছু অপরাধ করিয়াছি, পর জন্মে তোমার সেবা করিয়া যেন তাহার প্রতিকার করিতে পারি।" স্বামীর বল হীন হইল, দৃষ্টি শক্তি কমিয়া গেল, আসন্ন কাল উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন— "মনে রাখিও—ক্ষমা করিও"। এই কথা শেষ না হইতে হইতেই স্বামীর ক্ষীণ দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা তাহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পতিত-পাবনী গঙ্গার পবিত্র তটে উপস্থিত করিলেন। সৎকারের বন্দোবস্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চিতায় অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণেরা 'মাতর্গঙ্গে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে সেই ত্রিশূলধারিণী ব্রহ্মচারিণী শ্যামাসুন্দরী আলুলায়িতা কেশে সেই প্রজ্ব-লিত চিতা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সায়াহ্নে ধীরা গঙ্গার সম্মুখে সন্ধ্যা সমীরণের মধুর স্বরের সঙ্গে সঙ্গে দুই বার "মাতর্গঙ্গে" "মাতর্গঙ্গে" বলিয়া তপস্বিনী শ্যামাসুন্দরী চিতার প্রজ্জ্বলিত অনল বক্ষে ঝম্ফ প্রদান করিলেন। সম্মুখের পবিত্র সলিলা জাহ্নবীর তরঙ্গ মালা ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, সে তরঙ্গমালা অনন্তের দিকে ছুটিল আর ফিরিল না; সতী শ্যামাসুন্দরীর প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল, সে বায়ু অনন্তের দিকে ছুটিল, আর ফিরিল না। দেখিতে দেখিতে শরতের মনোহারিণী পূর্ণিমার অনন্ত আকাশে প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র রাশি শোভা পাইতে লাগিল, তাহার মধ্যে কেবল "ধ্রুব" নামে একটি মাত্র নক্ষত্র আপনার স্থানের বা গতির পরিবর্ত্তন করিল না; ঘাটের এক ব্রাহ্মণ কন্যা

আহ্নিক করিতে করিতে বলিলেন, "সতী স্ত্রী ঐ ধ্রুব নক্ষত্র!"

সতী শ্যামাসুন্দরী আর নাই, কিন্তু বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী আছে। বাঙ্গলায় এখন কয়টা শ্যামাসুন্দরী পাওয়া যায়? আমরা শ্যামাসুন্দরীর ন্যায় চিতানলে দগ্ধ হওয়া অথবা স্বামিত্যাগের অনুকরণ করিতে বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহার অগণ্য গুণ রাশি কয়জন বাঙ্গালী রমণীতে দেখা যায়?

মণিকর্ণিকা ঘাট ও দশাশ্বমেধ ঘাট মধ্যে যে সকল অসংখ্য সতী-স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্যামাসুন্দরীর স্তূপ প্রস্তর তাহাদের ঈশাণ কোণে অবস্থিত। এক সময়ে পাদ্রী উইলিয়ম স্মিথ সাহেব বারাণশীর সাহিত্য-সভায় সতীদাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি সতী দাহের ঘোরতর বিপক্ষ ছিলেন এবং সতী দাহ প্রথাকে নিষ্ঠুর প্রথা বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু সতী শ্যামাসুন্দরীর কথা উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞ পাদ্রী সাহেব বলিয়াছিলেন Her life was brimfully interesting; her life was of entheralling interest to the student of humanity; it is a pity that her mantle of inspiration has not yet fallen on any woman of modern India."

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কীট বনাম মনুষ্য।

ঈশ্বর কাহাকেও বৃথা সৃষ্টি করেন নাই। সকলেই এই পৃথিবীতে আসিয়া স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গতাসু হয়। ইহা জগতে ছোট বড় উচ্চ অধম সকলেই সকলের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারে। মনুষ্য, পশু পক্ষী হইতে অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। পশু পক্ষীরাও মনুষ্যের নিকট হইতে অনেক শেখে। মাকড়সা, পিপীলিকা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীদিগকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখি, ইহাদের যে কোন প্রকার শিক্ষাপ্রদ ক্ষমতা কিংবা কার্য্য-নৈপুণ্য আছে বলিয়া আমরা একবারও ভাবি না। কিন্তু আমাদের শারীরিক বলের সহিত সামান্য কীট পতঙ্গের অতি ক্ষুদ্রতম দেহের বল পরীক্ষা করিবার যদি কোন কাল্পনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে উহার ফল দেখিয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মাকড়সা প্রভৃতি সাধারণ কীট-গুলিকে যদি উক্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দর্শন করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি উহারা মনুষ্যের ন্যায় দীর্ঘাকার হইত এবং এই ক্ষুদ্রদেহের অনুপাতে বল পাইত, তাহা হইলে মনুষ্য অপেক্ষা তাহারা না জানি কতই অদ্ভুত-কর্ম্মা হইত!

সকলেরই গৃহে মাকড়সা আছে, কিন্তু কেহ কি কখন তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? তাহাদের যে কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতা তাহা জানিবার জন্য কেহ কি কখন আকিঞ্চন করিয়াছেন? মাকড়সার আট খানি পা; এবং প্রত্যেক পায়ের অগ্রভাগ সাঁড়াসির ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত, তাহাদের পায়ে এত বল যে, মক্ষিকা প্রভৃতি পতঙ্গ সকল যদি একবার এই সাঁড়াসির মধ্যে পড়ে, তবে তাহার আর পরিত্রাণ নাই! একটি বাঘের হাতে পড়িলে যেমন কোন জীব জন্তুর মুক্তির আশা থাকে না, সেরূপ মাকড়সাদের কবলে পতিত হইলে মক্ষিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের আর প্রাণের ভরসা থাকে না। মাকড়সাদের শরীরে যে কত বল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যদি উহারা মনুষ্যের মত বড় হইত, তাহা হইলে ইহারা প্রত্যেকে অনায়াসে এক একটি পায়ে এক একটি মানুষ ধরিয়া রাখিতে পারিত। মাকড়সার বুভুক্ষা শক্তিও অত্যন্ত অধিক। দেহের অনুপাতে মনুষ্য কিংবা অপর কোন জন্তুর সেরূপ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যের যদি মাকড়সার ন্যায় ভোজন শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাহার ভোজনের জন্য প্রত্যহ প্রাতে অন্যূন তিন চার মণ চাউলের অন্ন, দেড় মণ মৎস্য এবং উক্ত অন্নোপযোগী প্রভৃত তরকারী এবং রাত্রে একটি বৃহৎ ছাগ এবং প্রায় একমণ চাউলের অন্ন আবশ্যক হইত!

পতঙ্গের মধ্যে সাধারণ মক্ষিকা এবং ভ্রমর প্রভৃতির দ্রুত গমন শক্তি এত অধিক যে, অপর কোন জন্তু কিম্বা

পতঙ্গের সহিত তাহার তুলনা হয় না। পক্ষীদের মধ্যে ফিঙ্গা এবং তালচঞ্চু পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু সামান্য মক্ষিকার নিকট ইহারাও পরাস্ত হয়। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মক্ষিকারা অর্দ্ধ সেকেণ্ডে তিন ইঞ্চি উড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের একবার মাত্র নাড়ী স্পন্দনে যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে মক্ষিকারা ৫৪০ পদ যাইতে পারে! একজন মনুষ্য দুই ফুট পরিমাণ পদ বিক্ষেপ করিয়া যদি মক্ষিকার ন্যায় দ্রুত গমন করিতে পারিত, তাহা হইলে সে এক মিনিটে ২৪ মাইল পথ যাইতে পারিত! বিলাতে এক ব্যক্তি ৪ মিনিট ১২ সেকেণ্ডে একমাইল পথ দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা অল্প সময়ে এক মাইল যাওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

মনুষ্য অনশনে যতদিন বাঁচিয়া থাকুক না কেন, তাহা অপেক্ষা সামান্য কীটেরা অনেক অধিক দিন বাঁচিতে পারে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মাকড়সা তাহার অসামান্য বুভুক্ষাশক্তি সত্বেও দশমাস কাল অনাহারে থাকিতে পারে! এবং সামান্য গোময়োস্মা নাকি তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত অনশনে থাকিতে সমর্থ! এই সকল কীটের ন্যায় মনুষ্য যদি অনাহার-ব্রত হইতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবীতে এত দুর্ভিক্ষের জ্বালা হইত না ও এত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত না!

মক্ষিকার একেবারে যতগুলি সন্তান হয়, তদ্রূপ বোধ হয় আর কোন প্রাণীরই হয় না। ওয়াশিংটন নগরের প্রধান পতঙ্গ-তত্ব-সমিতির অধ্যাপক হাউয়ার্ড সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে একটি মক্ষিকার একেবারে ৪, ৪৭, ২২, ৮৬১, ৯১৬, ২৮৭, ১৩৫, ৫৯৩, ২০ গুলি সন্তান হয়! সিন্ধু-তীরে বালুকা-কণাই বা কত আছে!!

সভ্যতার অন্যতম চিহ্ন অট্টালিকাদি। যে দেশে যত সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্যাদি আছে, সে দেশ তত সভ্য বলিয়া পরিগণিত। দেশের সুন্দর সুন্দর সৌধরাজি যে সেই দেশের সৌভাগ্য সূচিত করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণকারী ও পর্ব্বত গহ্বর খননকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মাগণ, মিশরের পিরামিড প্রস্তুতকারী শিল্পিবৃন্দ তাহাদের অসামান্য শিল্পচাতুরী প্রদর্শন করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে; কিন্তু পিপীলিকার ক্ষুদ্র বল ও গৃহনির্ম্মাণের ক্ষমতা ও কৌশলের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর! আফ্রিকা দেশে "টার মাইট" নামক এক প্রকার পিপীলিকা আছে; ইহাদের গৃহ-নির্ম্মাণ-ক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সচরাচর ইহাদের গৃহ ২০ ফুট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং ইহার ভিতরে বহু সংখ্যক ঘর দালান ইত্যাদি থাকে। আমাদের দেশের সামান্য উই পোকা তাহাদের বল্মীক প্রস্তুত করিতে কি প্রকার ক্ষমতা এবং শিল্প চাতুরী প্রদর্শন করে, তাহা সকলেই জানেন। আফ্রিকাবাসী পিপীলিকাসমূহের আবাস-নির্ম্মাণ ক্ষমতার সহিত মনুষ্য বলের তুলনা করিলে মানুষের বাসগৃহ মেঘ ভেদ করিয়া উঠা উচিত ছিল।

আফ্রিকা প্রদেশে Driver ant নামক এক প্রকার "ডেয়ো" পিপীলিকা আছে, তাহারা সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইয়া একদেশ হইতে অপরদেশে গমন করে। চলিবার সময় ইহাদের সম্মুখে যে কোন দ্রব্যই পড়ুক না কেন, তাহারা তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপ দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা কালে যদি ইহারা কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ের তটে উপনীত হয়, তবে তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া শৃঙ্খল বদ্ধ-রূপে তটস্থ কোন বৃক্ষের উপর আরোহণ করে এবং বায়ু বলে ঐ শৃঙ্খলের এক প্রান্ত উড়িয়া উড়িয়া জলাশয়ের অপর পারে কোন বৃক্ষ সংলগ্ন হইবামাত্র অপর পিপীলিকা গণ সেই জীবন্ত-সেতুর উপর দিয়া পার হয়। যে পিপীলীকা, সর্ব্ব প্রথম গন্তব্য পারের বৃক্ষ ধরে, সমস্ত সহচর পার হইবার পর সে পারগামী শেষের পিপীলিকার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বৃক্ষের কিঞ্চিৎ উপরে উঠে; সুতরাং সেতু-শৃঙ্খলে টান পড়ে, তখন অপর পারের পিপীলিকাটি হাত ছাড়িয়া দেয়, দিবা মাত্র অমনি সকলে পরপারে নীত হয়।

যদি মনুষ্যের এইরূপ ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে যুদ্ধ কালে সেতু নির্ম্মাণের জন্য অজস্র অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না।

সকলেই গঙ্গা ফড়িং দেখিয়াছেন। ইহারা লাফ দিতে কিরূপ পটু, তাহাও সকলে জানেন। কয়েকজন প্রাণি-

তত্ত্ববিদ্ পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহারা ইহাদের দেহের তুলনায় একশত গুণ অধিক লম্ফ প্রদান করে! একটি ৩ ফিট ৮ ইঞ্চি বালক যদি এই ফড়িং এর ন্যায় লাফ দিতে পারিত, তাহা হইলে সে বিলাতের সর্ব্বোচ্চ সেন্টপল্ গির্জ্জার দীর্ঘ চূড়া এক লম্ফে পার হইতে পারিত। এই ফড়িং গুলি যে কেবল লম্ফ প্রদানে পটু তাহা নহে, ইহাদের অন্য ক্ষমতাও অসাধারণ! ইহারা ইহাদের দেহাপেক্ষা ২৪ গুণ ভারী বস্তু অনায়াসে তুলিতে পারে। আমাদের এইরূপ ক্ষমতা থাকিলে আমরা একাকী দুইজন অশ্বারোহী এবং দুইজন পদাতিক সৈনিককে অক্লেশে তুলিতে পারিতাম। আমাদের রাবণের বোধ হয় কীট পতঙ্গের ন্যায় বল ছিল, তাই তিনি হরগৌরী সহ কৈলাস পর্ব্বতকে সহজেই উত্তোলন করিয়া ছিলেন!

সকলেই গুবরে পোকা দেখিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের কিরূপ শক্তি, তাহা বোধ হয় কেহ দেখেন নাই। ইহাদের অসামান্য সহ্য-গুণ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদিগকে আলপিন্ বিদ্ধ করিলে ইহারা কোন রূপ যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ করে না, বরং আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। গুবরিয়া পোকাকে মাড়াইলেও মরে না, পা তুলিয়া লইলেই পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় হাঁটিয়া যায়। আমাদের এইরূপ শক্ত দেহ ও কঠিন প্রাণ হইলে আমরা অনায়াসে হস্তী-পদ-দলিত হইতে ভয় পাইতাম না!

"মাল" পোকার ক্ষমতাও অতি অদ্ভুত। গাং ফড়িং তাহার শরীর অপেক্ষা ২৪ গুণ ভারী বস্তু তুলিতে পারে, কিন্তু "মাল পোকারা" তাহাদের অপেক্ষা ২০০ শত গুণ গুরু দ্রব্য তুলিতে সমর্থ!

মনুষ্য পক্ষীর ন্যায় আকাশমার্গে উড়িতে বহুবিধ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না; এবং কখনও যে হইবে, তাহার আশা কম। মানুষ সোজা পথে অথবা ঢালু পর্ব্বত গাত্রে কষ্টে সৃষ্টে উঠিতে পারে, কিন্তু তাহারা মক্ষিকা প্রভৃতির মত ঠিক সমরেখার ন্যায় উচ্চ গৃহ ভিত্তিতে অথবা পর্ব্বত শিখরে সোজা হইয়া হাঁটিয়া উঠিতে পারে না। ক্ষুদ্র মক্ষিকাদিগের প্রতি বায়ুর অনুগ্রহই ইহার একমাত্র কারণ।

মনুষ্যেরা আধুনিক বিজ্ঞান সাহায্যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু সমূহ আবিষ্কার করিয়া দিন দিন আত্মোন্নতি সাধন করিতেছে, জ্ঞান গরিমায় সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতেছে। কিন্তু যখনই আমরা সামান্য কীট পতঙ্গের অলৌকিক কার্য্যকলাপ ও অদ্ভুত ক্ষমতা সমূহের বিষয় অনুধাবন করি, তখনই হতবুদ্ধি হই, আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ হয়! তখনই মনে হয় সামান্য তুচ্ছানুতুচ্ছ কীট পতঙ্গের তুলনায় আমাদের জ্ঞানবল, ধৈর্য্যবল, বাহুবল সমস্তই অতি হীন, ক্ষীণ, তুচ্ছ, ও হেয়!

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্যাবাইনাস ও অলিন্দা।

জর্ম্মণ দেশে স্যাবাইনাস নামক কোন যুবক বাস করিতেন। প্রকৃতি দেবী এই যুবককে ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি যে স্থান জয় করা সঙ্গত মনে করিতেন, সেই স্থানই জয় করিতে পারিতেন। তিনি অতীব ধীর প্রকৃতি ছিলেন। এই জন্য তিনি অলিন্দা নাম্নী কোনও যুবতীর প্রীতিপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অলিন্দা অপেক্ষা অধিকতর সম্পত্তিশালী ছিলেন; কিন্তু অলিন্দার গুণগ্রাম অতুলনীয় ছিল। সকলেই অলিন্দাকে স্যাবাইনাসের উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, অলিন্দা ব্যতীত অপর কাহাকেও স্যাবাইনাসের উপযুক্ত পাত্রী কেহ মনে করিত না। স্যাবাইনাসও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন ও তাঁহার ভালবাসা পাইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে বিবাহক্রিয়ায় তাঁহাদের মনের মিলন প্রকাশ্য মিলনে পরিণত করিল।

স্যাবাইনাসের সহিত এরিয়ানা নাম্নী ভদ্রবংশজাত কোন স্ত্রীলোকের নিকট সম্বন্ধ ছিল। তিনি অত্যধিক সম্পত্তিশালিনী ছিলেন। তাঁহার গুণের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। তিনি স্যাবাইনাসকে ভাল বাসিতেন, স্যাবাইনাসও তাঁহার গুণগ্রামের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতেন।

স্যাবাইনাসের মুখে নিজের সুখ্যাতি শুনিলে এরিয়ানা আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেন। সম্পর্কের নৈকট্য ও ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যবশতঃ তিনি স্যাবাইনাসের নিকট হইতে যে প্রকার সদ্ব্যবহার পাইতেন, তাহা হইতে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি স্যাবাইনাসের হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছেন। তিনি স্যাবাইনাসের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। বস্তুতঃ স্যাবাইনাসের উপর তাঁহার দানবর্ষণের কাল বা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু অলিন্দার সহিত স্যাবাইনাসের বিবাহের পর তাঁহার এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। জিঘাংসা আসিয়া অলক্ষিত ভাবে তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। প্রথমে এরিয়ানার মনে হইল যে, বিবাহের পর হইতে স্যাবাইনাস্ তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার কল্পনা-দৃষ্টিতে এরূপও প্রতিভাত হইল যে, তিনি তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহারও করিয়াছেন ও করিতেছেন! তখন হিংসাবৃত্তি তাঁহার মনে এরূপ প্রাধান্য লাভ করিল যে, হিংসাজনিত ক্লেশবশেই তাঁহার শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিল। তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। তিনি সম্পূর্ণ রিপুর বশীভূত হইলেন। তিনি আত্মদমনের শক্তি হারাইলেন. রিপু তাঁহাকে যে পথে পরিচালিত করিতে লাগিল, তিনি সেই পথে চলিতে লাগিলেন। এতকাল ধরিয়া যে সমস্ত গুণের জন্য তিনি প্রশংসার পাত্রী হইয়াছিলেন, এক্ষণ হইতে সে সমস্ত গুণ তিনি ভুলিতে লাগিলেন। অকারণ সন্দেহ ও ভ্রমজনিত ক্রোধ তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া অশান্তির অন্ধকারে লইয়া গেল। তিনি বিনাকারণে অবিরাম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। স্যাবাইনাসের দাম্পত্যসুখ তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। স্যাবাইনাসের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। হায়! স্যাবাইনাসের বিবাহের পূর্ব্বে যে এরিয়ানা সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন, যিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও করুণার আধার ছিলেন, তিনি কেমন দয়ালু ছিলেন; তিনিই এক্ষণে ধীরে ধীরে ঘৃণিত স্বভাব হইতে চলিলেন

যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা বিরাজমান, সেখানে অপরের অসদভিপ্রায়ে বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে না। স্যাবাইনাস ও অলিন্দার মধ্যে যে দাম্পত্যপ্রণয় বিরাজিত ছিল, তাহার ভিত্তি কোন পার্থিব উপাদানে গঠিত নাই, সুতরাং কোন পার্থিব আক্রমণ তাহার নিকটেও আসিতে পারিত না, তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করা ত দূরের কথা। এই আদর্শ দম্পতির মধ্যে এরিয়ানা বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য অনবরত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রিপুর বশবর্ত্তী হইলে লোকের এমনই ভ্রম হয় যে, তাহারা এমনই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যে রিপুর দাস, তাহার দূরদর্শিতার অভাব ঘটে এবং হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। যে এরিয়ানা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার জন্য সকলের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন, তিনিই এখন বুদ্ধিহীনের ন্যায়, যে কার্য্য কখন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, সম্পন্ন হয় নাই ও হইবেনা, তাহাই করিতে উদ্যত হইলেন। এই প্রেমিক দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য তিনি যে সমুদয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সহজেই কৃতকার্য্য হইবেন বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু একথা এরিয়ানার মনে স্থান পাইল না যে, তিনি যাঁহাকে ভাল বাসিয়া বিবাহ করিতেন, কোন মতেই তাঁহার সহিত নিজের বিচ্ছেদ ঘটাইতে দিতেন না।

এরিয়ানা এই প্রকার অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া একটি সুযোগ লাভ করিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই স্যাবাইনাস একটি মোকর্দ্দমায় জড়ীভূত হইয়াছিলেন। বহুদিবস ধরিয়া এই মোকদ্দমার ব্যয় চালাইতে গিয়া আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। পরিশেষে মোকদ্দমায় বিপক্ষের জয় হইল। আদালত বিপক্ষকে আশাতীত পরিমাণে ডিক্রী দিলেন। স্যাবাইনাসের ভাগ্য একবারে উচ্চতম সোপান হইতে নিম্নতম সোপানে নামিয়া আসিল। এরিয়ানার সহিত নিকট সম্বন্ধ থাকায় স্যাবাইনাস মনে করিয়াছিলেন যে, সেই অবস্থায় সমুদয় প্রয়োজনীয় সাহায্যই এরিয়ানা তাঁহাকে প্রদান

করিবেন। এরিয়ানা যে ঈর্ষা দ্বারা পরিচালিত হইতেছিলেন এবং তাঁহার মন যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, স্যাবাইনাস তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।

অলিন্দার সহিত স্যাবাইনাসের বিচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্যাবাইনাসের কোন বিপদেই দৃষ্টিপাত বা কোন প্রার্থনাতেই কর্ণপাত করিবেন না, এরিয়ানা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এরিয়ানা অলিন্দাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এরিয়ানার ভালবাসার পাত্র অলিন্দা কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই এরিয়ানার এত বিদ্বেষ। পূর্ব্বে এরিয়ানা এই অলিন্দাকে কত স্নেহ করিতেন, কত প্রকারে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেন, কত কথায় তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। পূর্ব্বে স্যাবাইনাসকে অলিন্দার প্রশংসা করিতে শুনিলে, তিনি নিজে অলিন্দার প্রশংসা করিয়া স্যাবাইনাসকে হারাইয়া দিতেন। পূর্ব্বে অলিন্দার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে দেখিলে নিজে অলিন্দার উপর দয়া বর্ষণ করিয়া স্যাবাইনাসকে লজ্জা দিতেন। কিন্তু আজ সেই এরিয়ানা, অলিন্দার বিনা দোষে, তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জীবননাশক শত্রু অপেক্ষাও অধিকতর বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন!

হে অর্থ তোমার বিচিত্র লীলা! তুমি একদিকে যেমন সুখবর্দ্ধক, অন্য দিকে সেইরূপ সুখনাশক। তুমিই আমাদের এরিয়ানার জীবনের প্রধান কণ্টক। তোমারই প্রভাবে এরিয়ানা মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিতেন, আর আজ তোমারই জন্য এরিয়ানা সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তোমারই বলে এরিয়ানা মনে করিতেন, স্যাবাইনাস তাঁহাকে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না; আবার তোমারই জন্য স্যাবাইনাস্ একদিনও মনে করেন নাই যে, এরিয়ানা তাঁহাকে বিবাহ করিবে। তোমারই প্রভাবে এরিয়ানা মনে করিতেন, তিনি স্যাবাইনাসকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে কত সুখী করিবেন; আবার তোমারই জন্য স্যাবাইনাস মনে করিত, এরিয়ানার স্বামীকে এরিয়ানার নিকট ক্রীতদাস ভাবে কাল কাটাইয়া কত কষ্টই না উপভোগ করিতে হইবে। হে অর্থ, তোমার লীলা বুঝা ভার। তুমি একদিন আমাদের স্নেহের পুত্তলী অলিন্দার জন্য এরিয়ানার বাক্সে উন্মুক্ত অবস্থায় হাসিতেছিলে, আর আজ তুমি সেই খানে থাকিয়াই এরিয়ানাকে দিয়া গর্ব্বগম্ভীর স্বরে বলাইতেছ,—'স্যাবাইনাস্ অলিন্দাকে বিবাহ করিয়া হীন বংশে বিবাহ করিয়াছেন! ইহাতে স্যাবাইনাসের বংশমর্য্যাদার হানি ঘটিয়াছে এবং নিকট-সম্পর্ক বলিয়া আমার পিতার বংশেরও মর্য্যাদার হানি হইয়াছে। এতদবস্থায় অগ্রে স্যাবাইনাস অলিন্দাকে পরিত্যাগ করুন, পরে আমার সমুদয় সম্পত্তির সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া স্যাবাইনাস অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে অনির্ব্বচনীয় স্নেহের সহিত ভালবাসিতেন। সুতরাং এই প্রস্তাব যখন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি তাহা ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন। প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য না হওয়ায় এরিয়ানাও অত্যন্ত কুপিত হইলেন। এতদিন তিনি মনের ভাব মনে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ব্যক্ত করিলেন। সুতরাং প্রকাশ্য বিবাদ আরম্ভ হইল। প্রথমে গালাগালি চলিতে লাগিল; পরে সে গালাগালি ঝগড়ায় পরিণত হইল। ক্রমে ক্রমে ঝগড়া এত উচ্চ মাত্রায় উঠিল যে, স্যাবাইনাসকে আদালতে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে হইল। এরিয়ানার কোনও আত্মীয়ের নিকট স্যাবাইনাসের পূর্ব্ব পুরুষের ধার ছিল। এরিয়ানা এক্ষণে সেই ঋণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। যে দিন উভয়ের মধ্যে খুব ঝগড়া হইয়া গেল, ঠিক তাহার পরদিন স্যাবাইনাসের নামে সেই ঋণসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থাপিত হইল। এরিয়ানা ক্ষিপ্রগতিতে মোকদ্দমা চালাইয়া তাঁহাকে অল্পদিনের ভিতর জেলে পাঠাইলেন।

তাঁহার এই দুঃখের সময় একমাত্র অলিন্দা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার দুঃখভাগী হয় নাই। অলিন্দা নিজের শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া স্বামীর সহিত কারাগারে প্রবেশ করিলেন। কারাগারের ভিতর ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন। অলিন্দা আহারাদির ব্যবস্থা ও অন্যান্য সাংসারিক

কার্য্য সমাধা করিতেন; সময় সময় স্যাবাইনাসের নিকট বসিয়া শিল্প কার্য্য করিতেন, আর স্যাবাইনাস তাঁহাকে ছোট ছোট গল্প শুনাইতেন। এই শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যে তাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতা প্রদান করিত। তাঁহাদের দুইজনের এই প্রকার সদ্ভাব দেখিয়া অপরাপর বন্দীরা তাঁহাদের দাম্পত্য সুখের প্রশংসা করিত। বন্দীর জীবনে, যতটুকু সুখ উপভোগ করা সম্ভব ছিল, তাঁহারা তাহা যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করিতেন। ঘটনা চক্রে অবস্থান্তর ঘটিলে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীতে কলহ ঘটিয়া থাকে। অসচ্ছল অবস্থা তাহাদের দাম্পত্য সুখ শান্তির পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যে হতভাগ্যের গৃহে এই প্রকার অশান্তি বিরাজমান, তাহার পক্ষে স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন অত্যন্ত কষ্টকর। বলাবাহুল্য স্যাবাইনাস ও অলিন্দা সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। অবস্থা বিপর্য্যয় বা দারিদ্রের জন্য তাঁহাদের একজন অন্যজনকে কটূক্তি করিতেন না, একজন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেও চেষ্টা করিতেন না। পরন্তু ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া পরস্পরের দুঃখভার লাঘব করিতেন। যখন স্যাবাইনাস তাঁহার প্রিয় অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনীর জন্য সামান্য যত্ন প্রকাশ করিতেন, তখন অলিন্দা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন এবং স্যাবাইনাসকে বলিতেন, তিনি যেন ভালবাসা দেখাইতে গিয়া স্বয়ং কষ্ট ভোগ না করেন। তিনি আরও বলিতেন যে, তাঁহারা যে বন্ধনে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হইয়াছেন, সেই বন্ধন চিরস্থায়ী থাকিলেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী থাকিবেন। এইরূপে দুর্দ্দশার একশেষ, দুর্ভিক্ষের পীড়ন এবং বন্ধু বিচ্ছেদ কিছুতেই অলিন্দাকে দুঃখিত করিতে পারে নাই। কেবল স্যাবাইনাসের অভাব-চিন্তাতেই অলিন্দা ব্যাকুল ও বিচলিত হইয়া পড়িতেন। স্যাবাইনাসের সহানুভূতি চিত্ত দেখিয়া তিনি যেরূপ হইতেন সে রূপ সুখ আর কিছুতেই তাঁহাকে দিতে পারিত না। সে যাহা হউক, এতদিন জেলে থাকায় বাড়ীতে যে সমুদয় ছোট ছোট জিনিস ছিল, তাহা চোরে লইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই প্রকার দুর্দ্দশায় পড়িয়াও তাঁহারা পরস্পরের প্রতি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। স্যাবাইনাসের পুত্রটি এই দুঃখের সময় তাঁহাদিগকে শান্তি প্রদান করিত। উভয়েই ছোট বালকটির পানে তাকাইয়া কালাতিপাত করিতেন। অবশ্য বালকটী নিজের ও পিতামাতার অবস্থার বিষয়ে অজ্ঞ ছিল; সুতরাং সে আর কি সহানুভূতি দেখাইবে? সে ঘরের চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইত এবং অস্ফুটস্বরে কথা কহিয়া পিতামাতার আনন্দ বৃদ্ধি করিত।

এইরূপে যখন এই হতভাগ্য দম্পতি কালহরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একজন দূত আসিয়া তাঁহাদিগকে এরিয়ানার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সে বলিল, তিনি দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়কে সমুদয় সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে ব্যক্তি এখন দূরদেশে রহিয়াছে; এই সময় উইলখানি পোড়াইয়া ফেলিলে আপনি সহজেই আইনানুসারে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন।

এইরূপ নীচ প্রস্তাবে এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কারারুদ্ধ দম্পতিকে অধিকতর সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দূতকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে অনুমতি করিলেন। এরিয়ানার মৃত্যুর সহিত কারামুক্ত হওয়ার সমুদয় সম্ভাবনা একবারে দূরীভূত হইল, মনে করিয়া স্যাবাইনাস ও অলিন্দা উভয়েই একবারে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য, এই দূত এরিয়ানার প্রেরিত একজন চর ছিল। এরিয়ানা স্যাবাইনাসের চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই রমণী যদিও অন্যায় রোষবশে বিপথগামিনী হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক দয়ালুতা, ন্যায়পরতা এবং পরদুঃখকাতরতা তখনও তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নাই। তিনি যখন দেখিলেন, স্যাবাইনাসকে ধীরতা এবং সাধুতা হইতে বিচ্যুত করিবার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। তখন শেষবার স্যাবাইনাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই দূত পাঠাইয়াছিলেন।

স্যাবাইনাস এরিয়ানার প্রেরিত দূতকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, পার্শ্বের ঘর হইতে এরিয়ানা তৎসমস্তই

শুনিয়াছিলেন। তিনি সত্ত্ব গুণের শক্তি আর দমন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ সাধুভাবে পুনরায় উদ্দীপ্ত হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্তাবাইনাসের নিকট উপনীত হইলেন এবং পূর্ব্বকৃত অন্যায় ব্যবহারের জন্য দোষ স্বীকার করিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহাই তাঁহাদিগকে দিতে লাগিলেন। তৎপরে স্তাবাইনাসকে সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া উইল করিয়া দিলেন। আপাততঃ স্তাবাইনাস ও অলিন্দা স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এরিয়ানার সাহায্যে ও বন্ধুতায় উভয়ই সুখী হইলেন। ইহার অল্পদিনের মধ্যেই এরিয়ানার মৃত্যু হইল এবং স্তাবাইনাস তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি উইল সূত্রে প্রাপ্ত হইলেন। এরিয়ানা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে বলিয়া গিয়াছেন, "প্রশংসা পাইবার একমাত্র উপায় সদ্‌গুণ। নির্দ্দোষতায় কোন কোন সময় অবনতি ঘটিতে পারে, কিন্তু অটল অধ্যবসায় সকল সময়ই জয়লাভ করে।"

শ্রীমতী দময়ন্তী-রচয়িত্রী।

সৎকার্য্যের পুরস্কার।

(গল্প)

এক নগরে একটী বণিক দম্পতী বাস করিতেন, তাঁহাদের কেবল একমাত্র পুত্রসন্তান ছিল। বণিক পুত্রকে শৈশবাবস্থায় ভবিষ্যতে সৎ হইবার জন্য অনেক সদুপদেশ ও নীতি বাক্য শিখাইতেন; তন্মধ্যে "সৎকার্য্যের ধ্বংস নাই" এই নীতি বাক্যটী তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল। বালকও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ নীতিবাক্যানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল।

যথা সময়ে পুত্রের অধ্যয়ন কাল শেষ হইলে পিতা তাঁহাকে নিজের ন্যায় পণ্য ব্যবসায়ী হইতে ইচ্ছা করিয়া, একখানি জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্যাদি দিয়া, বিদেশে পাঠাইয়া দিলেন। জাহাজ ক্রমশঃ যাইতে যাইতে একদিন একখানি তুরস্ক-দেশীয় জাহাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ঐ জাহাজ হইতে ভয়ানক ক্রন্দনরোল উঠিতেছিল, তিনি নাবিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জাহাজে এত ক্রন্দনধ্বনি কেন?' তাহারা বলিল যে, "আমরা বহুদেশ হইতে লোক ধরিয়া আনিয়াছি ও ঐ সকল ব্যক্তিদের দাসরূপে বিক্রয় করিব বলিয়া তাহারা ক্রন্দন করিতেছে।" তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি উচিত মূল্য পাইলে ঐ সকল লোকদের ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা?" অধ্যক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময়ে ঐ সকল হতভাগ্য ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিলেন। তাহারা তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। অবশেষে তিনি একটী বৃদ্ধা ও তাহার পার্শ্বে একটী পরমাসুন্দরী বালিকাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাসস্থান কোথায়?" বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে, তাহারা বহু দূর দেশ হইতে আসিয়াছে, এই বালিকাটী একজন রাজকন্যা ও সে ইহার ধাত্রী। এক দিন বালিকাটী বাড়ী হইতে বহু দূরে একটী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল এবং তথা হইতে এই সকল দস্যুরা ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। সে নিকটেই ছিল, উহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া উহার সাহায্যের জন্য আসিবামাত্র দস্যুরা তাহাকেও বন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া লইল। বণিকপুত্র তাহাদের এতাদৃশ দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং ঐ বালিকাটীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি ধাত্রীর নিকট এই প্রস্তাব করিলে, ধাত্রী ও বালিকা উভয়েই ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, সেই স্থলেই তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বণিকপুত্র নববধূ ও ধাত্রীকে লইয়া নিজ ভবনে আসিলেন।

তিনি গৃহে পৌঁছিলে তাঁহার পিতা তাঁহার সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোককে দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাণিজ্য বিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পিতার নিকট আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করিলে পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রে নির্ব্বোধ! তুই কি করিয়াছিস্,

কাণ্ডজ্ঞান রহিত হইয়া তুই আমার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিস্” এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তিনি পুত্রকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। পুত্র স্ত্রী ও বৃদ্ধা ধাত্রীকে লইয়া অতি কষ্টে সেই নগরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার পিতার বন্ধুবর্গের দ্বারা পিতার ক্ষমা ও অনুগ্রহ পাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই জ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করিবেন।

কিছুকাল পরে পিতা পুনরায় পুত্র, পুত্রবধূ ও বৃদ্ধাকে গ্রহণ করিলেন। কিয়দ্দিবশ পরে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান দ্রব্যে একখানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া পুত্রকে পুনরায় বাণিজ্যার্থে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র স্ত্রী ও বৃদ্ধাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। দুই সপ্তাহ কাল সমুদ্র যাত্রা করিতে করিতে তিনি এক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন যে, কয়েকজন সৈনিক পুরুষ কয়েকজন হতভাগ্য গ্রামবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সৈনিকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কি জন্য এই সকল লোকদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছ?” তাহারা বলিল, “এই সকল লোক রাজকর দেয় নাই, সেই জন্য ইহাদিগকে বন্দী করিয়াছি।” গ্রামবাসীদিগের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দুঃখ-সাগর উদ্বেলিত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারপতির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এই সকল লোকদিগের নিকট কত কর পাওনা আছে? বিচারপতি অর্থের পরিমাণ বলিলে, তিনি তাঁহার জাহাজের সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ঐ সকল লোকদের মুক্ত করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং পিতার পদতলে পড়িয়া যাহা করিয়াছেন তৎসমুদয় যথাযথ ব্যক্ত করিলেন ও পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পিতা পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া পুত্রকে সম্মুখ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কিয়দ্দিবশ পরে পুনরায় পুত্রের বন্ধুবর্গ তাঁহার পিতার নিকট পুত্রের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিলে, পিতা পুনরায় পুত্রকে গ্রহণ করিলেন ও পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সুন্দর মূল্যবান দ্রব্যে সজ্জিত আর এক খানি জাহাজ দিলেন। পুত্র সর্ব্বদা স্ত্রী ও বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট থাকিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে তিনি তাহাদের লইয়া বাণিজ্যে যাইতে পারিলেন না, সেই জন্য তিনি হালের উপর তাঁহার স্ত্রীর ও জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে বৃদ্ধাধাত্রীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। পরে তিনি পিতা মাতা, স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তৃতীয় বার বাণিজ্যযাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস যাইতে না যাইতে তিনি একটী প্রকাণ্ড নগরের কাছে আসিয়া সম্মানসূচক তোপধ্বনি করিয়া নঙ্গর করিলেন। তথাকার রাজা ও নগরবাসী সকলেই তোপধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বৈকালে রাজা তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে জাহাজের অধ্যক্ষ কে, এবং কি জন্য আসিয়াছে তাহার সংবাদ জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মন্ত্রী জাহাজে গিয়া তথাকার রাজ কন্যার ও তাহার বৃদ্ধা ধাত্রীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া এতদূর বিস্ময়াপন্ন ও আনন্দিত হইলেন যে, তিনি তাঁহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কারণ রাজকন্যা ও তদীয় ধাত্রী বহু দিন হইল তুরস্ক দেশীয় দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী তৎকালে স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া তাঁহার জিজ্ঞাস্য বিষয় সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রাতে রাজা তাঁহার মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের সহিত উক্ত জাহাজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ কে, কি জন্য সেখানে আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। অধ্যক্ষ বলিলেন যে, তিনি এক জন বণিক, সেখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন। রাজা যখন জাহাজের ইতঃস্তত পদচারণ করিতেছিলেন —তখন দেখিলেন যে, জাহাজের হালের উপর তাঁহার কন্যা ও তাঁহার ধাত্রীর মূর্ত্তির ন্যায় দুইটী প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও জাহাজের অধ্যক্ষকে তাঁহার আত্মকাহিনী বর্ণনের জন্য বৈকালে রাজপ্রাসাদে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

অপরাহ্নে রাজাজ্ঞা পালনের জন্য বণিক-পুত্র

রাজ ভবনে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার জাহাজের হালের উপর একটী বালিকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অধ্যক্ষ রাজাকে উক্ত প্রতিমূর্ত্তির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলে, রাজা আনন্দে বলিয়া উঠিলেন যে, সেই প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার একমাত্র কন্যার। পরে তিনি বণিক পুত্রকে নিজ জামাতা জানিয়া যথোচিত আদর যত্ন করিয়া তাঁহার কন্যা, ধাত্রী ও বৃদ্ধ বণিক দম্পতীকে আনিবার জন্য একখানি সুন্দর জাহাজের সহিত তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে বণিক পুত্রের সহিত দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

অল্পদিন মধ্যেই বণিকপুত্র স্বদেশে ফিরিলেন। বৃদ্ধ বণিক পুত্রকে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট জাহাজ সমভিব্যাহারে এত শীঘ্র দেশে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে পুত্রমুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিছু দিন পরে তাঁহারা সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পুত্রের সহিত রাজ ভবনে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

দুষ্ট রাজমন্ত্রী ঈর্ষান্বিত হইয়া সর্ব্বদাই রাজার এই নূতন উত্তরাধিকারীকে মারিয়া ফেলিয়া রাজকন্যা ও রাজ্য লাভের আশায় নানা মন্দ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। একদিন রাজ-জামাতাকে খেলার ভাণ করিয়া জাহাজের উপর তলায় আহ্বান করিল। বণিকপুত্র কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আসিলেন, কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রী সহসা তাঁহাকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং সাধু বণিকপুত্র সন্তরণ দিয়া জাহাজ ধরিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে জাহাজের লোক রাজ-জামাতাকে না দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইল। রাজ-জামাতার সংবাদ কেহই দিতে পারিল না। বৃদ্ধ বণিক-দম্পতী, রাজকন্যা ও বৃদ্ধা ধাত্রীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল। যাহা হউক জাহাজ যথা সময়ে রাজধানীতে পৌঁছিলে রাজা এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। পরে পুরুষোচিত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া জামাতার পিতা মাতাকে নিজ পুরীতে রাখিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

এদিকে তরঙ্গাঘাতে রাজজামাতা ভাগ্যক্রমে এক জনমানবহীন মরুময় দ্বীপে আসিয়া নীত হইলেন। তথায় বহুদিন অনাহারে অনিদ্রায় যাপন করিয়া একদিন প্রাতে দেখিলেন এক বৃদ্ধ ধীবর একখানি নৌকা করিয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতেছে। তিনি আশ্বস্ত হইয়া সাহায্যের জন্য বৃদ্ধকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলে ও বৃদ্ধ নিকটে আসিলে, তিনি তাঁহাকে পর পারে রাখিয়া আসিতে অনুনয় করিলেন। বৃদ্ধ বলিল যে "আমি যদি তোমায় পারে রাখিয়া আসি, তবে তুমি আমাকে কি দিবে?" যুবা কাতর স্বরে বলিলেন যে, "দেখ আমার পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ছিন্ন, অতএব তোমাকে আমি কি দিব?"

বৃদ্ধ বলিল—"তাহাতে কিছু আসে যায় না, আমার কাছে কালি কলম ও কাগজ আছে, যদি তুমি লিখিতে পার, তবে তোমার ঠিকানা সমেত একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দেও যে, ভবিষ্যতে তুমি যাহার উত্তরাধিকারী হইবে, তাহার অর্দ্ধভাগ আমাকে দিবে।" যুবা স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলেন। বৃদ্ধও তাঁহাকে পর পারে রাখিয়া আসিল।

যুবা পারে আসিয়া অনাহারে কত নগর, কত গ্রাম, কত বন উপবন অতিক্রম করিলেন; অবশেষে প্রায় একমাস ভ্রমণের পর সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার শ্বশুরের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া তিনি তাঁহার নিজের ও তাঁহার স্ত্রীর নামাঙ্কিত অঙ্গুরী ধারণ করিয়া রাজ উদ্যানের এক দ্বারের নিকট বসিলেন; কিন্তু মালী তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া বলিল যে, রাজ-পরিবারবর্গ শীঘ্রই উদ্যান ভ্রমণে আসিবেন, অতএব তিনি সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। বণিক-পুত্র তথা হইতে উঠিয়া বাগানের এক কোণে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা, রাজা, রাজমহিষী তাঁহার স্ত্রী ও সেই দুষ্ট মন্ত্রী উদ্যান-ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তিনি কৌশল ক্রমে তাঁহার সেই

অঙ্গুরীয়টি রাজ কন্যাকে দেখাইলেন। রাজ কন্যা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার হাতের অঙ্গুরীটি দেখিতে চাহিলেন, দুষ্ট মন্ত্রী ভিক্ষুক বেশধারী রাজ জামাতাকে চিনিতে পারিয়া রাজ কন্যাকে বাধা দিয়া বলিল, "আপনি কি একজন হীন লোক দেখিয়া ঘৃণা বোধ করেন না, চলে আসুন।" কিন্তু রাজ কন্যা তাহা না শুনিয়া আঙটী লইয়া তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন; এবং সে কিরূপে ঐ আঙটী পাইল জিজ্ঞাসা করায় বণিকপুত্র তখন আত্ম পরিচয় দিলেন। তখন সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না; ভৃত্যগণ রাজপরিচ্ছদ আনিয়া জামাতাকে পরিধান করাইয়া দিল। রাজাজ্ঞায় বহুদিবস পর্য্যন্ত নগরে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। রাজা সেই ক্রূরমতি মন্ত্রীকে বন্দী করিয়া তাহার যথোচিত শাস্তির জন্য স্বীয় জামাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু জামাতা তাহার সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া সেই নগর হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পরে বৃদ্ধ রাজা জামাতার হস্তে রাজ্যভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন।

কয়েক দিবস পরে যে বৃদ্ধ ধীবর রাজ জামাতাকে সমুদ্রপার করিয়া দিয়াছিল, সে আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা পত্র দেখাইল। ধার্ম্মিক রাজজামাতা যিনি এক্ষণে রাজা হইয়াছেন, আপন প্রতিজ্ঞামত নিজ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে দিলেন। বৃদ্ধ গ্রহণ করিয়া পরমুহূর্ত্তেই রাজাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল "গ্রহণ কর, আমি পরমেশ্বরের দূত, ঈশ্বর তোমার সৎকার্য্যে তুষ্ট হইয়া, তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণে সুখ স্বচ্ছন্দে স্ত্রী পুত্র লইয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজ্য কর।" বলিয়া দেবদূত অদৃশ্য হইল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গৃহিণীর সাজি।

আম-তৈল—প্রথমে আমগুলি ধুইয়া শুক্‌না কাপড়ে মুছিবে। তাহার পর সেগুলিকে চারি ফলা করিয়া চিরিবে। আধপোয়া চূণ ও এক পয়সার ফটকিরি গুঁড়াইয়া তাহার জল করিয়া তাহাতে আমগুলিকে দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে পুনরায় সেগুলিকে শুক্‌না কাপড়ে মুছিয়া ফেলিয়া হলুদ গুঁড়া, লঙ্কাগুঁড়া, লবণ ও কিছু তৈল লইয়া আমগুলির সহিত মাখাইবে। হাড়ি কিংবা বৈয়ামের মধ্যে কিছু লবণ, ছোলা, আস্ত লঙ্কা রাখিয়া আমগুলি সাজাইয়া দিবে ও তাহাতে তেল ঢালিয়া দিবে। যদি এক শত আম হয়, তাহা হইলে ৬ সের তৈল, ১ সের লঙ্কা, ১ সের লবণ, ১ সের ছোলা। ইহার পর এক সপ্তাহ বৈয়ামটীকে রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। তাহার পর মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে।

গুড়-আম—পূর্ব্বের মত আম কাটিয়া তাহার খোসা ছাড়াইয়া পাথরের পাত্রে রাখিবে। আধ পোয়া আদা, আধপোয়া হলুদ, একপোয়া লঙ্কা একসঙ্গে বাটিয়া তাহার সহিত আধসের নুন আমগুলির সঙ্গে মাখাইবে ও উপর্য্যুপরি দুই দিন রৌদ্রে দিবে। তৎপর দুই সের গুড় আমগুলির সহিত মাখাইবে। তাহার পর যতদিন জল না শুকায় ততদিন রৌদ্রে দিবে। জল শুকাইলে আধপোয়া কালজিরা, আধপোয়া সাদাজিরা ও আধপোয়া পাঁচ ফোড়ন ভাজিয়া আধ গুঁড়া করিয়া আমগুলির সহিত মাখাইয়া হাড়িতে তুলিবে।

ভিনিগার দিয়া আমের আচার—

আম কাটিয়া আধপোয়া চূণ ও ফটকিরির জলে তিন ঘণ্টা ভিজাইবে। তৎপর সেগুলি মুছিয়া রাখিবে। চারি সের চিনির রস তৈয়ার করিয়া তাহার উপর পাঁচ আনা মূল্যের দুই বোতল ভিনিগার ঢালিয়া দিবে। তাহার উপর আমগুলি ছাড়িয়া দিবে। তাহার উপর এক পোয়া কিস্‌মিস্, আধ পোয়া লবঙ্গ, আধ পোয়া ছোট এলাইচ, এক কাঁচ্চা লবণ, এক কাঁচ্চা বাটা হলুদ সেই রসের উপর দিবে। সেগুলিকে

পূর্ব্বের ন্যায় উনানে চড়াইবে, যখন রস পূর্ব্বের ন্যায় আঠা আঠা হইবে, তখন বোতলে পুরিবে।

আম, কুল ও তেঁতুলের আচার— ফাল্গুন মাসে যখন কুল উঠে, তখন কুল শুকাইয়া ও তেঁতুল কাটিয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ মাসে যখন আম হয় তখন আম কুচি কুচি করিয়া কাটিতে হয়। কাটিয়া পাথরে চার সের কুল, চার সের তেঁতুল ও আমগুলি, আধ সের লবণে একত্রে মাখিতে হইবে। তাহার সহিত ৪ সের চিনি, আধ পোয়া হলুদ গুঁড়া ও এক পোয়া লঙ্কা গুঁড়া মিশাইয়া দুই তিন দিন উপর্য্যুপরি রৌদ্রে দিবে, তাহার পর বোতলে তুলিবার সময় ইচ্ছা করিলে দুই সের তৈল ঢালিয়া দিতে পার। আধ পোয়া কাল জিরা, আধ পোয়া আদা, ও আধ পোয়া পাঁচ ফোড়ন ভাজিয়া আধ গুঁড়া করিয়া ইহার সহিত মিশাইবে।

আনারসের আচার— দশ বারটা আনারসের আচার করিতে হইলে, প্রথমে সেইগুলিকে কাটিয়া লবণ দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর চিনির রস করিয়া যখন আঠা আঠা হইয়া আসে, তখন তাহাতে সেই আনারসগুলি দিতে হইবে। পাঁচ আনা মূল্যের ভিনিগার এক বোতল কিনিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিতে হইবে। তাহার পর পুনরায় সেইগুলি জাল হইয়া যাইবে, পুনরায় সেইগুলি চিনির সিরা হইবে; তাহার পর ঐ আনারস যুক্ত চিনির সিরাও ভিনিগার শুদ্ধ উনানে চড়াইয়া দিতে হয়। ২৫টা আনারসের আচার করিতে হইলে এক বোতল ভিনিগার ২ সের চিনি এক ছটাক লবঙ্গ, এক ছটাক পরিমাণ ছোট এলাইচ, আধ পোয়া কিস্‌মিস দিতে হয়। একটা সুপারি পরিমাণ হলুদ দিতে হয়। বেশ সুন্দর রং হইবার জন্যই হলুদটুকু দেওয়া আবশ্যক। ।৶০ মূল্যের বড় বোতল হইলে এক বোতল আর ছোট বোতল হইলে দেড় বোতল ভিনিগার দিতে হইবে।

আমের জেলি— চৈত্র মাসের শেষে যখন প্রথম আম হয়, তখন কচি কচি আম কাটিয়া কষি ফেলিয়া দিয়া, আমগুলি ধুইয়া কলাই করা কড়াতে সিদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর চিনির সিরা করিতে হয়। তাহার পর সেই আমগুলি চটকাইয়া সেই সিরাতে দিতে হয়। এক বোতল ভিনিগার তাহাতে দেওয়া আবশ্যক, তাহার পর যখন সেইগুলি থকথকে হইয়া আসে তখন উনান হইতে নামাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকেই বলে আমের জেলি।

পেয়ারার জেলি— ৫০ টী পেয়ারার জেলি করিতে হইলে পেয়ারাগুলি সিদ্ধকরে চালনি করিয়া ছাঁকিয়া বিচিগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। তাহার পর তাহাতে পাঁচ আনা মূল্যের এক বোতল ভিনিগার দিতে হয়, তাহার পর যখন সেইগুলি বেশ থকথকে হইবে, তখন সেইগুলি নামাইয়া রাখিবে। তাহার পর যখন সেইগুলি ঠাণ্ডা হইবে তখন সেইগুলি বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে। ইহাকে পেয়ারার জেলী বলে।

জামের জেলী— ৪০০ জামের জেলী করিতে হইলে প্রথমে জাম গুলি সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, ও খোসাগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। তাহার পর ১ সের চিনির রস করিয়া তখন জামগুলি চটকাইয়া সেই রসে দিতে হয়। তাহার পর তাহাতে আধ বোতল ভিনিগার দিতে হয়। তাহার পর যখন সেইগুলি বেশ থকথকে হইবে, তখন নামাইয়া রাখিবে। তাহার পর যখন বেশ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে তখন ঢালিয়া বোতলে পুরিবে। ইহাকে জামের জেলী বলে।

বেলের জেলী— ২৫টা বেলের জেলী করিতে হইলে, প্রথমে সেই গুলি ছাড়াইয়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং সিদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর দুই সের চিনির রস করিয়া সেই বেল গুলি তাহাতে দিতে হয়। তাহাতে পাঁচ আনা মূল্যের এক বোতল ভিনিগার দিতে হয়। যখন সেইগুলি বেশ থকথকে হইয়া আসে তখন নামাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকে বেলের জেলী বলে।

পাতিলেবুর আচার— ১০০টি পাতি লেবুর

আচার করিতে হইলে প্রথমে লেবুগুলি ধুইয়া কাপড় দিয়া মুছিতে হয়। তাহার ৫০টা লেবুর রস করিয়া চিনিগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। তাহার পর ৫০টা লেবু চটে ঘষিয়া তাহার ছালগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর ঐ লেবুর রসে সেই ছাল ছাড়ান লেবুগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। আর তহাতে কিছুলবণ দিতে হয়। তাহার পর সেইগুলি ১৫ দিন ধরে রৌদ্রে দিতে সয়। ইহাকে.লেবুর আচার বলে।

শ্রীমতী দীনতারিণী দেবী।

মনে পড়েছে ?

সুশীলা। কি ভাই এত দিনে আমায় মনে পড়েছে? তোমার যেন কি রকম ভাই, এই এবাড়ী আর ওবাড়ী, তা মাসে একবারও দেখ্‌তে এস না। তাওবটে, এত বড় সাগরটা পেরুয়ে কি আসা যায়?

বিমলা। হয়েছে হয়েছে ভাই আর বল্‌তে হবে না। আমার কি আস্‌তে অনিচ্ছে? সেই ছেলে বেলা থেকে তোমার সঙ্গে ভালবাসা, তা কি আর মুছে যায়? তোমার কাছে বস্‌লে কত সুখ হয়, যেন প্রাণের কাছে একজন লোক পেয়েছি, দুটো সুখ দুঃখের কথা বল্‌ব। কিন্তু কি করি ভাই, পোড়া সংসার থেকে কি বেরুবার যো আছে। একটা না একটা কিছু লেগেই আছে।

সুশীলা। সে কি ভাই,অমন কথা বল না, 'পোড়া সংসার' কি বল্‌তে আছে? যেখানে স্বামী আছেন, ছেলে মেয়ে আছে, সেটাত স্বর্গ; তবে কি জান, মনটাকে একটু স্থির করা চাই। বাঁচতে গেলেই সুখ, দুঃখ, আপদ বিপদ আছে, একটু সয়ে চলতে হয়।

বিমলা। তুমি ভাই অনেক বিদ্যে শিখেছ, তুমি ও সব পার, আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমি তোমার ও সব কথা বুঝি না। সারা দিন কেবল কাজ আর কাজ, একটু সময় হয়না যে পাড়ায় গিয়ে, দুজনের সঙ্গে দুটো কথা কই। এতেও কি মানুষ বাঁচে?

সুশীলা। না, তোমার এ ভাব ভাল নয় ভাই, অত খুঁৎ খুঁৎ কর কেন? স্বামী, ছেলে মেয়ে এদের জন্য খাটতে পার্‌লেত হয়—এটা বড় ভাগ্যের কথা; সকলের ভাগ্যে এটা ঘটে উঠে না। সেবার তুল্য সুখ আর কিছুতেই নাই। এতে মন ভাল থাকে, ধর্ম্মও হয়। বিধাতা শরীর দিয়েছেন, ধন দিয়েছেন, এসব তাঁর কাজে লাগেত ভালই হল। এই ভাবে সংসারকে দেখ্‌তে শেখ, তা'হলেই মন শান্ত হবে, কিছুতেই আর বিরক্ত হবে না।

বিমলা। তুমি ত বেশ কথা বল্লে দেখ্‌ছি, এক দণ্ড ঠাকুরের নাম নিতে পারি না, আর সুধু ভূতের ব্যাগার খেটেই আমার ধর্ম্ম হয়ে যাবে!

সুশীলা। কেবল ইষ্টদেবতার নাম করাই ধর্ম্ম নয়, তাঁর সংসারে খাটাও ধর্ম্ম, বরং যে না খাটে তার ধর্ম্ম নাই। কোন মা যদি দিন রাত বসে মালা জপেন, আর ছেলে মেয়েদের মুখের দিকে না চান্, তা'হলে ইষ্টদেবতা কখনই খুসী হন না। তিনি চান্ যে আমরা প্রাণে তাঁকে ভালবাসি ও হাতে তাঁর কাজ করি।

বিমলা। বেশ কথা আর কি! মানুষের কি একটা সুখের ও আরামের ইচ্ছে নেই? সমস্ত দিন খেটেই মলেম, তবে আর তা হয় কই?

সুশীলা। সুখের ইচ্ছে আছে বই কি; কিন্তু চাইলেই সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখ সয়ে সুখ পেতে হয়। যদি কেবলই সুখ চাও, তবে কেবলই দুঃখ পাবে। যদি ধর্ম্মকে চাও, ঈশ্বরকে প্রাণে পেতে চাও, তা'হলে দুঃখেতেই সুখ পাবে।

বিমলা। সে কি রকম, ভাই? দুঃখ আবার সুখ হয় কেমন করে?

সুশীলা। তুমি বোধ হয় মহাভারতের কুন্তীদেবীর গল্প শুনিয়াছ?

বিমলা। কোন্ গল্পটা বলত?

সুশীলা। সেই যে, কুন্তী দেবী অনেক দিন তপস্যার পর শ্রীকৃষ্ণের নিকট একটা বর চেয়েছিলেন!

বিমলা। না আমি জানি না।

সুশীলা। কেন তোমাদের বাড়ীতে কি সন্ধ্যার সময় রামায়ণ, মহাভারত পড়া হয় না?

বিমলা। না, এখন আর হয় না, পূর্ব্বে হইত। বাবা পড়তেন আর মা আমাদের সকলকে নিয়ে বসে শুন্‌তেন। তাঁরা যাবার পর সে বন্ধ হয়ে গেছে।

সুশীলা। এখন কি হয়?

বিমলা। এখন বাবু সন্ধ্যাবেলায় আফিস থেকে বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পাশা খেলেন, আমরা ত পাশা খেলতে শিখি নাই, আমরা দুজায়ে পাড়ার আর দুটী মেয়ের সঙ্গে মিলে তাস খেলি, না হয় গল্প করি, না হয় খুকী ডিটেকটিভের গল্প পড়ে, আর আমরা শুনি।

সুশীলা। এটা কি ভাল? সীতা, সাবিত্রীর পুণ্য চরিত ছাড়িয়া তাস খেলা! তুমি এসব হতে দেও কেন?

বিমলা। কি কর্‌ব? কর্ত্তা যা করেন, সকলেই তাই করে। ছেলেরা পর্য্যন্ত আরম্ভ করেছে, পড়াশুনাও তাদের ভাল হচ্ছে না।

সুশীলা। তাত হবেই, ভাল জিনিষ যদি না দেও, তারা মন্দটা নেবেই। পূর্ব্বে রামায়ণ মহাভারত পড়া হ'ত, ভাল ভাল চরিত শুনিয়া সকলে ভাল হইতে চেষ্টা করত, আর পরিবারের মধ্যে একটা ধর্ম্মভাব সর্ব্বদা থাকৃত। এসব গেলে যা হয়, এখন তাই হচ্ছে। মা বাপ যেমনি লঘুচিত্ত ও বিলাসপ্রিয় হচ্ছেন, ছেলেরাও তেমনি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাহা হউক কুন্তীদেবীর কথা হচ্ছিল না? কুন্তীদেবী প্রার্থনা কর্‌লেন যে চির দিন যেন তাঁর দুঃখ থাকে, তাহলে তিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে কাতর হয়ে ডাক্‌বেন, এবং তাঁর দেখা পাবেন। তা'হলেই দেখ দুঃখ, নিত্যসুখের কারণ যে পরমেশ্বর তাঁকে পাবার পক্ষে সহায় হয়। এমন দুঃখ কি সুখ নয়, সুখের চেয়ে ভাল নয় কি? যিনি মনে করেন যে ইষ্টদেবতার ইচ্ছায় তাঁরই জন্য খাটবো বলে সংসারে এসেছি, তিনি কখনই বলেন না "বাপ্‌রে, খেটে খেটে মলাম্, এক দণ্ড বিশ্রাম নাই।" বরং তিনি বলেন, "আমি কি অভাগী, খাট্‌তে এলেম্ ভাল করে খাট্‌তে পাল্লাম না; কি করে তাঁর কাজ ভাল করে কর্‌ব?"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরসী।

(১)

বর্ষাকাল। কয়দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। হাট বাজার ভাল হইয়া বসিতেছে না। সমস্ত জিনিসই মহার্ঘ। আবার সকলের অবস্থাত তেমন নয়—শুধু ঘরে বসিয়াই বা চলে কি করিয়া। লোকের বাড়ী খাটিয়া খুটিয়া যেমন করিয়া হউক দুপয়সা আনা চাই—নহিলে দিনের খোরাক জুটে কোথা হইতে? হরমাধব চট্টোপাধ্যায় বড় গরীব। গ্রামের অপর প্রান্তে এক ক্ষুদ্র জমিদারের বাড়ীতে পূজা করিয়া যাহা সিধা পায় তাহাতেই কোনরূপে দিনাতিপাত করে। এই কয়দিন যেরূপ বৃষ্টি—রাস্তা ঘাট সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। ঘর হইতে দুই পা বাহির হইলেই সাঁতার দিতে হয়। কত গরীবের ঘর পড়িয়া গিয়াছে—গৃহহীন হইয়া তাহারা জলে ভিজিতেছে, আর কাঁদিতেছে। হরমাধবের ঘরখানি পড়ে নাই বটে, কিন্তু যেরূপ অবস্থা—তাহাতে আর দুই দিন এইরূপ বৃষ্টি হইলে কি হয় বলা যায় না। ঘরে চাউল দাউল যাহা ছিল সমস্তই ফুরাইয়াছে—আজ কি খাইবে তাহার উপায় নাই। কন্যাটীর জন্যই তাহার অধিক ভাবনা। নিজে না হয় উপবাসে কাটাইতে পারে। কিন্তু ছোট মেয়ে, না খাইয়া থাকে কি করিয়া, ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সম্বল একমাত্র দুগ্ধবতী গাভী। সে দিন কেবল ঐ গরুর দুধ পান করিয়া কাটিল। পরদিন জল থামিল। রৌদ্র দেখা দিল। সকলেই যেন একটু প্রাণ পাইল। আজ সাত আট দিন ক্রমাগত বৃষ্টির পর আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছে। ভাবিল, আজ মণিববাড়ী হইতে সিধা আনিতে পারিবে—মেয়েকে দুটী ভাত দিবে। বড় আশা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। কতকদূর গিয়া দেখিল আর যাইবার উপায় নাই। রাস্তার উপর বড় বড় দুইটী হানা পড়িয়াছে—ও সমস্ত জল সেই হানা ভাঙ্গিয়া এরূপ বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে যে, তাহা পার হওয়া একরূপ দুঃসাধ্য। হরমাধব

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একবার উপর দিকে চাহিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দুই দিন পরে হানার জল কমিল—হরমাধব দ্রুতগতিতে জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া শুনিল, আজ আট দশ দিন তাহার কামাই হওয়ায় ৺ ঠাকুরের পূজা, ভোগ, শীতল প্রভৃতি বন্ধ থাকায়, বাবু তাঁহার বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী ব্রাহ্মণকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; হরমাধবের আর সেখানে কোন আবশ্যক নাই। শুনিয়া হরমাধব মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বাবুর অনেক সাধ্য সাধনা করিল—নিজের অবস্থার কথা বলিল—প্রাণাধিকা কন্যার উপবাসের কথা বলিল। বাবুর মন কিছুতেই নরম হইল না। দশ দিন তাঁহার গৃহ দেবতার পূজা করিতে আসে নাই; যদি বাড়ীর কাছে এই ব্রাহ্মণটী না থাকিত, তবে কি হইত বল দেখি? ঠাকুরের মাথায় একটু জলওত পড়িত না! কাজেই ঘরের কাছে ব্রাহ্মণ থাকিতে দূরের ব্রাহ্মণকে ঠাকুর পূজার ভার আর দিবেন না, ইহাই বাবুর প্রতিজ্ঞা।

হরমাধব কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিল। নয় বৎসরের কন্যা সরসী আজ চারি দিন কেবল দুধ খাইয়া আছে—ভাতের মুখ দেখিতে পায় নাই। কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। নিজের কথা ছাড়িয়া দেও—ব্রাহ্মণ, জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়াছে দুধ খাইয়া সে সমস্ত জীবন কাটাইতে পারে। হরমাধবের স্ত্রী কেবলমাত্র এই কন্যাটী রাখিয়া আজ চার বৎসর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় কত মিনতি করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, 'দেখ, মেয়েটী যেন কখন কষ্ট না পায়। তোমার হাতে ইহাকে দিয়া গেলাম—ভাল দেখিয়া বিবাহ দিও।' স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ের এই কথা যত মনে পড়ে, হরমাধব ততই পাগলের মত কাঁদে।

শেষে দেখিল কাঁদিয়া আর কোন ফল নাই। ভাবিল, যে দুধ হয়, তাহারই কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট বাজারে গিয়া বিক্রয় করিবে, তাহা হইতে চাল প্রভৃতি আহারীয় খরিদ করিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দোহনকার্য্য সমাপন করিয়া দুধ লইয়া হরমাধব বাজারে গেল। দুধ বেচিয়া যে পয়সা পাইল তাহাতে কোনরূপে সেদিনকার মত চলিয়া গেল। ক্রমে গরুটীই তাঁহাদের অবলম্বন হইল। গরুর সেবা ও যত্নের সঙ্গে সঙ্গে দুধ বাড়িল। তখন হরমাধব দুপয়সা সংস্থান করিয়া রাখিতেও লাগিল—কি জানি কখনও যদি দুধ বেশী না হয় তখনত আবার চলা চাই।

(২)

এইরূপ অতিকষ্টে আর তিন বৎসর কাটিয়া গেল। সরসীর বিবাহের জন্য হরমাধবের এক মস্ত ভাবনা আসিয়া জুটিল। ব্রাহ্মণের ঘরে একেত দশ বৎসরের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে ভাল। হরমাধব তথাপি স্নেহাধিক্যবশতঃ তাহার উপর আর দুই বৎসর কাটাইয়া দিয়াছেন—বিবাহের কথা বড় একটা বেশী ভাবেন নাই। তাহার বাটীর পার্শ্বে দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায়ের বাটী। দুর্গাপদ নিজে অতি ভাল লোক। একটী পুত্র যোগেশচন্দ্র ও একটী কন্যা সুরমা মাত্র তাহার জীবনের সুখ দুঃখের সম্বল। যোগেশচন্দ্র দেখিতে শুনিতে যেরূপ সুশ্রী, চরিত্র ও লেখা পড়ায় ততোধিক। সরসী বাল্যকাল হইতে সুরমার সহিত একত্রে খেলা, একত্রে গল্প ও তাহাদের বাল্যকালের সুখ দুঃখের যত কথা সমস্ত এক সঙ্গে আলোচনা করিত। তাহাদের উভয় বাটীর এইরূপ ঘনিষ্ঠতা-হেতু সরসী সুরমাদের বাড়ীকে নিজের বাড়ীর মতনই ভাবিত।

হরমাধবের বরাবর ইচ্ছা মেয়েটী কাছ ছাড়া না হয়। অথচ ঘরজামাই রাখেন এরূপ সঙ্গতিও নাই। তিনি মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছেন, যোগেশের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন—তাহা হইলে মেয়ে তাঁহার কাছেই থাকিবে। এ বিষয়ে যোগেশের পিতামাতার নিকট হরমাধব একদিন কথা পাড়িয়াছিলেন। তাঁহারাও সরসীর মত সুন্দরী পুত্রবধূ পাইতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই অবধি হরমাধব সরসীর বিবাহের বিষয় আর বড় ভাবেন নাই। সুরমা মধ্যে মধ্যে সরসীকে এ বিষয়ে

তামাসা করিত—তাহার একটী কারণ, সরসী যোগেশকে বাল্যকাল হইতে 'দাদা' বলিত। সরসী ভাবিত, 'যোগেশ দাদা আমাকে কত পড়া বলিয়া দিয়াছেন—আমি যোগেশ দাদার গলা ধরিয়া, পিঠে চড়িয়া কত আব্দার করিয়াছি—এখন তাহাকে আবার বিবাহ করিব কি করিয়া!' সুরমা যখন তামাসা করিত, সরসী "দূর্" বলিয়া চিম্‌টি কাটিয়া পলাইয়া যাইত।

ক্রমে হরমাধব দুর্গাপদর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করিলেন। সমস্তই ঠিক হইল। দুই পক্ষে কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হইল না। কেবল হিন্দুসমাজের কলঙ্কনীয় প্রথা—দানের টাকা সম্বন্ধে একটু গোলযোগ বাধিল। দুর্গাপদর নিজের অবস্থাও তত ভাল নহে। তিনি যে নিজ হইতে কিছু খরচ করিয়া পুত্রের বিবাহ দেন, এমন ইচ্ছা থাকিলেও অপারগ। কারণ, তিনি এখনও কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি পান নাই। হরমাধবও ভাবি[illegible] যোগেশের সঙ্গে সরসীর বিবাহ দিতে পা[illegible]ন, তাহা হইলে কন্যা তাঁহার নিকটেই থাকিবে, এবং যোগেশ যেরূপ লেখাপড়া শিখিতেছে, পরে উহাদের কে ভাল হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া দুর্গাপদর পায়ে হাতে ধরিয়া ১০০৲ টাকায় রফা করিলেন। এখন টাকা সম্বন্ধে গোল মিটিল বটে, কিন্তু ১০০৲ টাকা কোথায় পাইবেন, এই ভাবনায় হরমাধব অস্থির হইয়াছেন। অনেক ভাবিয়া ঠিক হইল যে তাঁহার একমাত্র সম্বল গাভীটাকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইবেন, তাহা দ্বারা যদি সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে বসতবাটী বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিবেন। এই সমস্ত ঠিক করিয়া শনিবারের হাটে গরু বিক্রয় করা স্থির হইল। সরসী গরু বেচার কথা শুনিয়া কাঁদিল।

(৩৭)

গ্রাম হইতে হাট অনেক দূরে। কাল হাট বসিবে। হরমাধব সরসীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। প্রথম কারণ, মেয়েকে সমস্ত দিন কাহার কাছে রাখিয়া যাইবেন। দ্বিতীয়, সঙ্গে একজন থাকিলে কেনা বেচার অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু অতবড় মেয়ে হাটে লইয়া যাইবেন, তাহাও হইতে পারে না। বিশেষ, দুর্গাপদর স্ত্রী হয়ত তাহা পছন্দ না করিতে পারেন। একটু সুবিধা, হাটের নিকটেই সরসীর মাসীর বাড়ী। সরসী মাসীকে দেখিতে যাইতেছে বলিয়া সঙ্গে গেলে আর তত দোষ হইতে পারিবে না, এই ভাবিয়া হরমাধব সরসীকে সঙ্গে লওয়াই স্থির করিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া সরসীকে সঙ্গে লইয়া সরসীর মাসীর বাড়ী যাইতেছেন বলিয়া হরমাধব গাভী বিক্রয়ের জন্য গাভীটাকে হাটে লইয়া চলিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে হাটে পৌছিলেন। গাভীটা একটু বেশীদামে বেচিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। শেষে সন্ধ্যা হইয়া যায়, সমস্ত দিনের ক্লেশ, ইত্যাদি কারণে ৫০৲ টাকাতেই গাভীটা বিক্রয় করিল? বাটী ফিরিবার সময় গাভীর জন্য সরসী বড় কাঁদিতে লাগিল। হরমাধবও কাঁদিলেন বটে, কিন্তু এখন আরও ৫০৲ টাকা যোগাড় করিতে হইবে ইহা ভাবিয়া আরও অস্থির হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, বিবাহের দিন নাই—শীঘ্র বাটী ফিরিয়া বাকী টাকার যোগাড় করিতে হইবে। সুতরাং সেই দিনই বাড়ী ফেরা আবশ্যক। সমস্তদিনের পর মাসীর বাড়ী গিয়া কিছু আহারাদি করিয়া তখনই বাটী ফিরিলেন।

রাত্রি হইয়াছে। সরসীকে সঙ্গে লইয়া হরমাধব দ্রুত চলিতেছেন। টাকা কয়টী সরসীকে তাহার কাপড়ে ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে দিলেন। কতকদূর আসিয়া হরমাধবের শৌচপীড়া হইল। কন্যাকে বলিলেন, "সরসি, তুমি একটু আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও, আমি পিছু পিছু যাইতেছি।" বলিয়া, হরমাধব পথিপার্শ্বে শৌচে বসিলেন। সরসী একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে—হরমাধব বসিয়াছেন, এমন সময়ে দুই জন ভীমকায় পুরুষ চকিতের মত আসিয়া হরমাধবকে বিকটস্বরে বলিল—"দে, টাকা দে"। হরমাধব বলিলেন,—"কিসের টাকা? আমার কাছে ত টাকা নাই।" প্রধান দস্যু চীৎকার করিয়া কেবল বলিল, "কিসের টাকা জান না? গরু বেচিয়া যে ৫০টা টাকা পাইয়াছ, সেই টাকা।" এই বলিয়া আর

দ্বিরুক্তি না করিয়া হরমাধবের গলায় গামছার পাক কসিয়া দিল। হরমাধব একবার চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলেন—একটুমাত্র অবরুদ্ধ শব্দ বাহির হইল, তৎপরেই নীরব। দস্যুরা হরমাধবের কাপড় প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া টাকা পাইলনা। তখন ভাবিল, 'তবে সেই মেয়েটা টাকা লইয়া পলাইয়াছে।' ইহা মনে করিয়া সরসীর অন্বেষণে ধাবিত হইল। পথে তাহাকে কোথাও পাইল না।

(৪)

সরসী দূর হইতে তাহার পিতার যাতনাব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ ও দস্যুদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, ভয়ে ভয়ে একটু পিছাইয়া আসিয়া আড়াল হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া একটী আলোক দেখিতে পাইল, এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে ছুটিতে এক কুটীরদ্বারে আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সহসা দ্বার মোচন করিয়া সরসীকে তদবস্থায় পতিতা দেখিয়া যত্নে তাহার মূর্চ্ছাপনোদন করিল, এবং আদর পূর্ব্বক ঘরে লইল। সরসী সংক্ষেপে পিতার বিপদের কথা বলিয়া সাহায্যের জন্য হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রৌঢ়া অনেক সান্ত্বনা করিল। বলিল তাহার স্বামী কাজে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন—ফিরিয়া আসিলে পরদিন প্রাতে তাহার পিতার সন্ধান করিয়া দিবে। রাস্তা ভাল নয়। দস্যুভীতি যথেষ্ট আছে। সেই জন্য সে রাত্রে সরসীকে সেইখানে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল। হয়ত সরসীর পিতার প্রাণহানি হয় নাই, সামান্যমাত্র আঘাত পাইয়াই পরিত্রাণ পাইয়াছেন, এই সমস্ত কথা বলিয়া সরসীকে প্রৌঢ়া প্রবোধ দিতে লাগিল। সরসী অগত্যা সে রাত্রে সেইখানেই থাকিতে সম্মতা হইল।

প্রায় একঘণ্টা পরে গৃহস্বামী বাটী ফিরিল। বাটী আসিয়া গৃহিণীর নিকট সরসীর বৃত্তান্ত শুনিল। গৃহস্বামী তখন তাহাকে দেখিতে চাহিল। গৃহিণী সরসীকে ডাকিলেন। সরসী আসিলে গৃহিণী স্বামীকে দেখাইয়া কহিল, "ইহারই পিতার বিপদের কথা বলিতেছিলাম।" সরসীকে দেখিয়াই গৃহস্বামী সমধিক উল্লসিত হইল—বলিল, কল্যই তাহার পিতার সন্ধান করিয়া দিবে।

প্রৌঢ়ার একটী কন্যা ছিল। কন্যাটী পূর্ব্বে কখন সমবয়স্কার সঙ্গসুখ লাভ করিবার সুবিধা পায় নাই। একেত তাহাদের বাটী গ্রাম হইতে দূরে; ইহা ব্যতীত অপর কোন বালিকা বা সঙ্গিনীর সহিত অধিক মিশে ইহা তাহার জননী ও পিতার নিতান্ত অনিচ্ছা। আজ হঠাৎ একটী সমবয়স্কার দর্শনলাভে দাসু যার পর নাই আনন্দিতা। সে সরসীকে লইয়া যে কি করিবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মা, এই মেয়েটি আমাদের বাড়ীতে বরাবর থাকিবে ত?"

সরসী পার্শ্বগৃহে দা[illegible] নিকট [illegible]র গল্প করিতে লাগিল[illegible]সীর [illegible]সু সমস্ত এক মনে [illegible]। গৃহস্বামী এই অবস[illegible]ীর বাপের মৃত্যু—সরসী[illegible]কট ৫০টী টাকা আছে [illegible]বলি[illegible]কে সেই রাত্রেই হত্যা করা তাহাদের স্থির হইল। গৃহস্বামী আর কেহ নহে—সরসীর পিতৃহন্তা সেই দস্যু—সে যে হরমাধবকে হাটে গরু বিক্রয় করিয়া টাকা ৫০টী লইতে দেখিয়াছিল।

সরসী ও দাসু দুইজনে সেই ঘরে বসিয়া আরও কত গল্প করিতে লাগিল। সরসী তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। ভাবিতেছে, 'যাহাদের মেয়ে এত দয়ালু, নাজানি তাহারা নিজে কত যত্ন করিয়া আমার বাপকে কাল খুঁজিয়া দিবে।'

সরসী মাসীর বাড়ী হইতে আহার করিয়া বাহির হইয়াছিল। সে আর রাত্রে কিছু খাইল না। দাসু আহার করিতে গেল। আহারের পর দাসু সরসীর কাছে ফিরিয়া আসিল। সরসীকে ভাল করিয়া বিছানা করিয়া দিল। ঘরের প্রদীপ নিবাইল। দীপ নিবাইয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিবে মনে করিল। কিন্তু জননী বলিয়া গিয়াছেন, "এখন ঘরে গিয়া সরসীর বিছানা করিয়া দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দুই জনে নিদ্রা যাও;

রান্নাঘরের পাট্ সারিতে আমার অনেক বিলম্ব হইবে। পাট সারিয়া জলের কলসীটী এই ঘরে আনিয়া রাখিতে হইবে; সেই সময় কলসী বাহির করিয়া আনিব—আর তোমাকে ডাকিয়া দিয়া আসিব. তুমি উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইও।" কাজেই ঘরের দরজা বন্ধ করা হইল না। দুইজনে শুইয়া শুইয়া অনেকক্ষণ নানারূপ গল্প করিল। দাসু একবার ভাবিল, 'দরজা খোলা রহিল। সরসীকে কেহ মারিয়া ফেলিবে নাত? ইহাদের ত এই কাজ!' পরক্ষণেই ভাবিল, 'এমন সুন্দর মুখ—ইহাকে কি কেহ হিংসা করিতে পারে? আর, আমি ঘরে থাকিতে কে ইহার অনিষ্ট করিবে? বাবাইত আসিবেন!' ভাবিতে ভাবিতে দাসু ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি অধিক হইলে গৃহপ্রাঙ্গনে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া প্রধানদস্যু, তাহার কন্যা ও সরসী যে ঘরে শুইয়াছিল সেই ঘরে নিঃশব্দে সহকারী দস্যুর সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিল। অন্ধকার গৃহমধ্যে [illegible]

[illegible] তুলিয়া অতি সাবধানে গৃহের বাহিরে আনিয়া তাহার আঁচলে টাকা কয়টী পাইয়া খুলিয়া লইল। অবশেষে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে মেয়েটাকে ফেলিয়া দিল। প্রথমে গলা টিপিয়া ধরায় প্রাণ প্রায় বাহির হইয়াছিল—তারপর মুখ চোখ গামছা দিয়া বাঁধিয়া ফেলায় আর শব্দ করিবারও উপায় ছিল না। বিনা ওজরে দগ্ধ করিয়া একটী হতভাগিনী পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

(৫)

তখনও ভাল হইয়া ভোর হয় নাই। সূর্য্যদেব সবেমাত্র পূর্ব্বদিকে ঈষৎ লালের আভা ছড়াইতেছেন। না অন্ধকার, না ভোর। চুল্লীর আগুনও প্রায় নিবিয়া আসিতেছে। হতভাগিনী মেয়েটীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। এইবার চুল্লীটী নিবাইয়া মড়ার কয়লাগুলি সরাইয়া দস্যু সমস্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে মনে করিতেছে, এবং অত্যন্ত মনের আনন্দে তাম্রকূট সেবন করিতেছে; আর সম্মুখে গৃহিনী দাওয়ায় বসিয়া সেই অনায়াসলব্ধ ৫০টী টাকার কথা মনে করিয়া অতিশয় উল্লসিতা হইতেছে। কিন্তু একি! দস্যুপত্নী হঠাৎ একটী অস্ফুটশব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! দস্যু প্রথমে কারণ বুঝিতে পারিল না। পরক্ষণেই পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিল—সর্ব্বনাশ! মুখে কথা নাই—সর্ব্ব শরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। সম্মুখে সরসীর মূর্ত্তি! তাহার হাড়ের কয়লাগুলি এখনও যে চুল্লীর উপর লাল হইয়া আছে! দস্যু অব্যক্ত চীৎকার করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সঙ্গীকে জড়াইয়া ধরিল; সঙ্গীও ভয়ে তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

এমন সময় চকিতের মত জনকয়েক সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী আসিয়া দস্যুদ্বয় ও সেই রাক্ষসী দস্যুপত্নীকে [illegible] যে ঘরে সরসী ও দাসু শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরে একখানি ছোট রকম 'তক্তপোষ' থাকিত। তাহাতেই দাসু প্রত্যহ শয়ন করিত। সে রাত্রেও দাসুর সেইখানে শুইবার কথা। আহারের সময় তাহার জননী বারম্বার বলিয়া দিয়াছিল, "নীচে সরসীর বিছানা করিয়া, তুমি যেমন 'তক্তপোষে'র উপর শোও সেইরূপ শুইবে।" সরসীকে দাসু নিজের ভগ্নীর মত ভালবাসিয়াছে। তাহার উপর অতিথি। নিজে 'তক্তপোষে' শুইয়া কি করিয়া তাহাকে মাটীতে বিছানা করিয়া দিবে? সে তাহা পারে নাই। সরসীর শয্যা 'তক্তপোষে'র উপর করিয়া দিয়াছিল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও দাসুর কথা ঠেলিতে না পারিয়া সরসী অগত্যা 'তক্তপোষে'ই শুইয়াছিল।